প্রমোদ সেনগুপ্ত

নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা - ১২

নীল-বিদ্রোহের শতবার্ষিকী উপলক্ষে
নীল-বিদ্রোহের জানা অজানা
শহীদদের উদ্দেশে

এই লেখকের

ভারতীয় মহাবিদ্রোহ : ১৮৫৭

সূচীপত্র

ভূমিকা

কিছুকাল আগে শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্ত "ভারতীয় মহাবিদ্রোহ : ১৮৫৭" নামে এক তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ লিখেছিলেন। ১৮৫৭ সালের বিরাট অভ্যুত্থানকে যাঁরা আমাদের দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে পরাঙ্মুখ, তাঁদের বহু প্রমাদ তখন তিনি খণ্ডন করেছিলেন। এবার তিনি নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাঙালী কৃষকদের বিদ্রোহ সম্বন্ধে এই গ্রন্থটি লিখেছেন। আমার সন্দেহ নেই যে এই রচনা নীল-বিদ্রোহ বিষয়ে প্রামাণিক বলে আদৃত হবে। এর মুখবন্ধ লিখতে অনুরুদ্ধ হয়ে আমি খুবই আনন্দিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার ইতিহাস পড়তে গিয়ে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি বহু প্রকৃত মহারথীর সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁদের প্রতিভা ও কৃতিত্বের দ্যুতি আমাদের কাছে কখনও ম্লান হবে না। কিন্তু ইংরেজ-রাজত্বের সূত্রপাত থেকেই বাংলাদেশের সাধারণ মেহনতী মানুষেরা বারবার অভ্যুত্থান ঘটিয়ে যে সাহস ও সংঘশক্তির পরিচয় দিয়ে এসেছে, তার সংবাদ আমাদের কাছে এখনও পর্যন্ত অল্পই জানা আছে। মুষ্টিমেয় শিক্ষিতেরা যখন বিজেতা ইংরেজদের গুণাবলী দেখে মুগ্ধ এবং সেই গুণ আয়ত্ত করতে লেগে থেকে পরাধীনতার জ্বালা প্রায় ভুলে থাকতে পারছিলেন, তখনও এদেশের সাধারণ লোক বিদেশী শাসনকে কিছুতেই প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারে নি, সুযোগ পেলেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠে কর্তৃপক্ষকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে নির্মমভাবে দমন করেও তাই ইংরেজ সরকারের দুশ্চিন্তা ঘোচে নি। ১৮৬০ সালে নীল-বিদ্রোহ যখন সবেগে চলছিল, তখন বড়লাট ক্যানিং বিলাতে সেক্রেটারি অফ স্টেট্‌কে লিখেছিলেন : "আমি জোর করে বলছি যে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে আমার খুব বেশী দুর্ভাবনা হয়েছিল, সেই দিল্লীর সময় (১৮৫৭) থেকে এমন কখনও ঘটে নি।...আমি বুঝেছিলাম যে

ভয়ে বা ক্রোধে কোনো নীলকর যদি একবার বন্দুক চালায় তো নিম্নবঙ্গের প্রত্যেকটি নীলকুঠি ভস্মসাৎ হয়ে যাবে।”

বহুকাল আগে থেকে ভারতবর্ষে নীল প্রস্তুত হত। নানা দেশে রপ্তানি যেত। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে এখানে বিদেশী নীলকরের আবির্ভাব হল; এরা প্রায়ই ছিল “ভাগ্যান্বেষী, দুঃসাহসী, দুর্বৃত্ত”। এমন এক ব্যবস্থার প্রবর্তন হল যখন এই দুর্ধর্ষ নীলকরদের দৌরাত্ম্যে বাংলার অনেক চাষীকে বাধ্য হয়ে নীল বুনতে হত। অত্যাচারের অবধি ছিল না। একবার দাদন নিলে সারা জীবন নীলচাষের দায় থেকে চাষীর নিস্তার ছিল না; পুরুষানুক্রমে পরিশ্রম করেও নীলকরের দেনা যাতে কখনও পরিশোধ না হয় তার বন্দোবস্ত ঠিক থাকত। তখনকার দিনে শ্বেতাঙ্গদের আদালতের ভয় বিশেষ ছিল না; তাছাড়া ম্যাজিস্ট্রেটরাও সাধারণত নীলকরদের ঘাঁটাতে চাইত না বা সাহস করত না। রামমোহন রায় কিংবা দ্বারকানাথ ঠাকুরের ন্যায় ব্যক্তির মনে কিছুকাল নীলচাষ সম্বন্ধে একটা মোহ জন্মেছিল; নীলকরদের আসল চেহারা দেখলে সে মোহ কাটতে দেরি হত না। বহু যত্নে তথ্য সংগ্রহ করে প্রমোদবাবু এই সমস্ত ব্যাপার আলোচনা করেছেন।

নীলচাষের অর্থনীতি বিশ্লেষণ করে প্রমোদবাবু দেখিয়েছেন যে বিদেশী নীলকরেরা দেশ থেকে মূলধন না এনে, এদেশেরই টাকায়, মুনাফার পাহাড় বানাত; মাছের তেলেই মাছ ভেজে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ছিল তাদের কায়দা। তাদের লোভ-লোলুপ জীবনে দেখা যেত বিলাসব্যসনের প্রাচুর্য, আর অত্যাচারের তাণ্ডব। একাধারে জমিদার, মহাজন আর কুঠির মালিক বলে এই নীলকরদের দৌরাত্ম্যের সীমা-পরিসীমা ছিল না। সুখের বিষয় যে ইউরোপীয়দের মুখ থেকেই এই দৌরাত্ম্যের প্রখর নিন্দা শোনা গেছে। ১৮৪৮ সালে ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ডেলাতুর সাহেব; নীল-কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে তিনি বলেন: “এমন একটা বাক্স

নীলও ইংলণ্ডে পৌঁছয় না, যা মানুষের রক্তে রঞ্জিত নয়—এই উক্তির জন্য মিশনারিদের দোষ দেওয়া হয়েছে। এই উক্তি আমারও উক্তি।"

নীল-বিদ্রোহ ঘটে ১৮৫৯-৬১ সালে; এর পূর্বে অবশ্য বহু খণ্ড-অভ্যুত্থান ঘটেছিল, যার বিবরণ প্রমোদবাবু দিয়েছেন। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের প্রভাব যে তখনও কত শক্তিশালী, তা জানা যায় যখন দেখি যে নানাসাহেব আর তাঁতিয়া তোপীর নাম দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল আর নীলবিদ্রোহী কৃষকরা তাদের নেতাদের ঐসব নামে অভিহিত করত। প্রমোদবাবু এই উদ্ধৃতি দিয়ে ঠিকই বলেছেন: "যেসব বাঙালীরা দাবি করেন যে সিপাহী-বিদ্রোহ বাঙালীর মনে রেখাপাত করে নি, বাঙালীর মন জয় করতে পারে নি, উপরের এই উদ্ধৃতিটিই প্রমাণ করে তাঁদের উক্তি কতখানি ফাঁকা।" নীল-বিদ্রোহের এক বৈশিষ্ট্য এই যে দেশের সাধারণ লোকের মনকে মাতিয়ে তোলা ছাড়াও বাঙালী সমাজের উপরতলার কাউকেও উদাসীন থাকতে দেয় নি। সাংবাদিকচূড়ামণি হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এ-বিষয়ে যে অবদান রেখে গেছেন, তা অবিস্মরণীয়; শিশিরকুমার ঘোষের কথা সঙ্গে সঙ্গে বলা দরকার। ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে নীলকরদের উৎপাত বন্ধ করতে বঙ্কিমচন্দ্রের আগ্রহ দেখে নীলকরেরা তাঁর মাথার জন্য লক্ষটাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল! দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে বাংলা সাহিত্যে নীল-বিদ্রোহ এই 'অমৃত ফল' ফলিয়েছিল। মীর মশারফ হোসেন সাহিত্যে এই বিদ্রোহের যে স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তা ভুলে যাওয়া অনুচিত।

যদি কেউ মনে করেন যে নীল-বিদ্রোহ কয়েকটা কুঠি জ্বালিয়ে দেওয়ার মধ্যে প্রধানত প্রকাশ পেয়েছিল, তাহলে মস্ত ভুল করা হবে। তখনকার বাংলার ছোটলাট গ্রাণ্ট্ সাহেব বলেছিলেন যে নীলচাষীদের "সংগঠন আর একই সময়ে একত্রিত হয়ে কাজ করার

ক্ষমতা" ছিল খুব বেশী। একবার ত্রিশ-চল্লিশ মাইল ধরে স্টিমারে *যাওয়ার সময় তিনি দেখেন যে নদীর দুইধারে হাজার হাজার লোক তাদের দাবি নিয়ে আওয়াজ তুলছে। তিনি আরও লেখেন যে, তাদের হাবভাব দেখে মনে হয়েছিল যে সুবিচার না পেলে তা ছিনিয়ে নেওয়ার মতো সংগঠনশক্তি তারা সংগ্রহ করেছে।* বাস্তবিকই সেদিনের নীলচাষী বাংলাদেশে যে সংগঠনশক্তির পরিচয় দিয়েছিল, তার জোরেই বিদেশী কুঠিয়ালরা বাংলা থেকে বিতাড়িত হয়। বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে কুঠিয়ালরা আরো বহুকাল তাদের শোষণকার্য চালিয়ে যেতে পেরেছিল। অত্যাচার আর মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে তখনকার বাঙালী চাষী যে সংগ্রামের স্বাক্ষর ইতিহাসে রেখে গেছে, তা নিয়ে আমাদের গর্ব খুবই সঙ্গত।

প্রমোদবাবুর এই বই থেকে আমাদের দেশের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের বিবরণ পাওয়া যাবে। বহু গবেষণা করে তিনি তথ্যসংগ্রহ করে একত্র সন্নিবদ্ধ করেছেন। নীল-বিদ্রোহের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান আমরা যথাযোগ্যভাবে করতে পারব কিনা জানি না। অন্তত এই বইখানি যে প্রকাশিত হচ্ছে এতেই আমি আনন্দিত। প্রমোদবাবুকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

কলিকাতা,
২৯শে জুলাই, ১৯৬০

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

লেখকের নিবেদন

বাংলার বৈপ্লবিক ঐতিহ্য ও বাংলার নবজাগরণের (Renaissance) ক্ষেত্রে ১৮৫৯-৬০ সালের নীল-বিদ্রোহ খুব বড় একটা স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই একশত বৎসরের মধ্যে তার কোনো ইতিহাস লেখা হয় নি, যদিও দেখা যায় যে এই বিদ্রোহ কেবলমাত্র বাংলার ইংরেজ সরকারকেই নয়, তৎকালীন বাঙালী সমাজের সকল শ্রেণীর লোককেই বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল।

বাংলাদেশে নীলচাষ প্রবর্তন করে ইংরেজ বণিকরা এবং এই নীলচাষেই ভারতে সর্বপ্রথম ব্রিটিশ মূলধন নিয়োজিত হয়। ভারতবাসীকে লুণ্ঠন করে যে ধনসম্পদ ইংরেজরা আয়ত্ত করত, তার বেশির ভাগই ইংল্যাণ্ডে চালান করে দেওয়া হত ও সেখানে গিয়ে তা মূলধনে পরিণত হত। ইংরেজের লুণ্ঠিত অর্থের যে অংশটুকু ভারতে থেকে যেত তাই ক্রমশ নীল, কফি, চা ইত্যাদি শিল্পে নিয়োজিত হতে থাকে। এইসব মূলধন ইউরোপ থেকে আসে নি, এসব ছিল ভারতেরই মূলধন। ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতে মূলধন রপ্তানির যুগ শুরু হয়েছিল অনেক পরে—যখন থেকে রেল, টেলিগ্রাফ ইত্যাদির নির্মাণ আরম্ভ হল।

নীলচাষের প্রথম থেকেই দেখা যায় কৃষকদের উপর নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচার ও শোষণ। বাংলায় নীলচাষের ইতিহাস অন্বেষণ করলে আবার এও দেখা যায় যে কৃষকরা যত অসহায় ও অসংগঠিতই হোক না কেন, তারা বিদেশী নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচার ও শোষণ সব সময় বিনা প্রতিবাদে সহ্য করে নি। নীলচাষের প্রথম থেকেই দেখা যায় যে অত্যাচারের প্রতিরোধ করতে অনেক সময়ই বাংলার কৃষক সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। ১৮৫৯ সালের পূর্বেও অসংখ্য খণ্ডযুদ্ধ বাংলার বুকের উপর ঘটে গিয়েছে। এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে বাংলার পল্লীসমাজে অনেক বীর সন্তানের অভ্যুদয় ঘটেছিল, যাঁরা অসাধারণ সাহস, কর্মকুশলতা, সাংগঠনিক ক্ষমতা ও বৈপ্লবিক উদ্যোগের পরিচয় দিয়েছিলেন। বাংলার কৃষকসমাজ যে কি অপূর্ব বৈপ্লবিক শক্তির ধারক তা নীল-বিদ্রোহের ইতিহাস ভালোভাবেই প্রমাণ করে।

নীল-কৃষকদের সংগ্রাম ভারতে ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রথম জাতীয় সংগ্রাম। এই দিক থেকেও বাংলার নীল আন্দোলনের একটা বিশিষ্ট তাৎপর্য রয়েছে। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যদিও নীল-আন্দোলন শুরু হয়েছিল বিদেশী নীলকরদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সংগ্রাম হিসাবে, কালক্রমে তা রূপান্তরিত হয়েছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামে।

নীল-বিদ্রোহের শতবার্ষিকী উপলক্ষে "নীল-বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ" বাংলার পুরাতন ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দেবে এবং বর্তমানের ও অনাগত দিনের সংগ্রামে বাঙালী জনসাধারণের মধ্যে অনুপ্রেরণা জাগাবে—লেখকের এই আশা।

পরিশেষে লেখকের একটি আবেদন। বহুকাল পূর্বে যশোহর খুলনার ইতিহাস-প্রণেতা সতীশচন্দ্র মিত্র নীল-বিদ্রোহ আলোচনা প্রসঙ্গে দুঃখ করে বলেছিলেন যে, এই সময়ে যেসব কৃষক-নেতা এত বীরত্ব, স্বার্থত্যাগ ও মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই আজ অশ্রুত ও বিস্মৃত; গল্পগুজবে, লোকগাথায় এখনও যা আছে তা লিপিবদ্ধ না হলে তাও শীঘ্রই লুপ্ত হয়ে যাবে। আমরা জানি যে এখনও এমন অনেক প্রবীণ ব্যক্তি আছেন যাঁরা শ্রুতি ও স্মৃতির মাধ্যমে নীল-বিদ্রোহের অনেক কথা ও কাহিনীকে বয়ে নিয়ে চলেছেন। তাঁদের আমি অনুরোধ করছি বিভিন্ন পত্রিকায় এ সম্বন্ধে তাঁরা লিখুন, অথবা অনুগ্রহ করে আমাদের নিকট তাঁদের তথ্যগুলি পাঠিয়ে দিন।

১৫ই আগস্ট, ১৯৬০
২১৪।১।৫ লোয়ার সারকুলার রোড
কলিকাতা-১৭

প্রমোদ সেনগুপ্ত

নীলের ইতিকথা

অনেকের মতে প্রাচীনকালে একমাত্র ভারতবর্ষেই নীল প্রস্তুত হত এবং ভারত থেকেই নানা দেশে রপ্তানি হত। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে নীল রঙের অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত আছে যে প্রাচীন ঋষিগণ আকাশের রঙ হতে পালনকর্তা বিষ্ণুর বর্ণ নির্ণয় করেছিলেন এবং সেই নীল বর্ণই তাঁরা পটে ও প্রতীকে প্রতিফলিত করতেন। মনু তাঁর শাস্ত্রে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, কোনো ব্রাহ্মণ নীলের ব্যবসা করতে পারবেন না। ভারতবর্ষে ছাড়াও নীল রঙ যে সেই প্রাচীন কালেও অনেক দেশে ব্যবহৃত হত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মিশরের অনেক মমির পোশাকের পাড়ের কোনো কোনো অংশ নীল রঙে রঞ্জিত।

হিন্দুস্থান বা ইণ্ডিয়া থেকে রপ্তানি হত বলেই বোধ হয় নীলকে গ্রীসে ও রোমে বলা হত 'ইণ্ডিগো', পারসী ভাষায় বলা হত 'তুথ্‌মে নীল', আর আরবীতে 'নাস্তুন্‌-নীল'। সংস্কৃতে নীলকে অনেক স্থানে 'বিষ-শোধনী, বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম খ্রীষ্ট শতাব্দীতে গ্রীক লেখক ডিওস্‌কোরিডেস্‌ 'ইণ্ডিগো'র উল্লেখ করেন। রোমান লেখক প্লিনীর লেখা থেকে জানা যায় যে সিন্ধু নদীর তীরে অবস্থিত বারবারিকন্‌ বন্দর থেকে 'ইণ্ডিগো' বিদেশে চালান যেত।

সমস্ত পৃথিবীতে প্রায় ৩০০ রকমের নীল গাছ জন্মায়; তার মধ্যে ভারতের নানা স্থানে জন্মায় ৪০ রকমের। এই গাছগুলির জাতিগত ল্যাটিন নাম 'ইণ্ডিগো ফেরা'। এই গাছগুলির মধ্যে যেটা থেকে সব চেয়ে ভাল নীল রঙ পাওয়া যেত, তার লাটিন নাম ছিল 'ইণ্ডিগো টিঙ্কটোরিয়া'—যা কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই পাওয়া যেত এবং সেই গাছের দৈর্ঘ্য হত ৪ থেকে ৬ ফুট। নীলগাছের বীজ থেকে একরকম তেলও প্রস্তুত হত; সেই তেল আজও পর্যন্ত মানুষ ও পশুর নানাপ্রকার চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হয়।

ফুল ফুটবার সময় নীলগাছ কেটে আনা হয় এবং তার ডগা সমেত পাতাগুলিকে একটা বড় গামলায় করে কয়েক ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখা হয়। তারপর গাঁজান শুরু হয়ে গেলে জলটা যখন হলুদ রঙ ধারণ করে তখন সেটাকে আর একটা পাত্রে ঢেলে খুব সিদ্ধ করা হয় এবং সেই সঙ্গে নাড়ানো হয়। কিছুক্ষণ পরে জলটা সবুজ রঙ ধারণ করে এবং ধীরে ধীরে টুকরো টুকরো ভাবে দানা বাঁধতে আরম্ভ করে। আরও কিছুক্ষণ সিদ্ধ করার পর নীল রঙ প্রস্তুত হয়।

মধ্য যুগেও ভারত যে নীলের জন্য বিখ্যাত ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। বিখ্যাত ভেনিসিয়ান পরিব্রাজক মার্কো পোলো ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতে এসে দেখতে পেয়েছিলেন যে ত্রিবাঙ্কুর রাষ্ট্রে কোলিয়াম নামক বন্দরে প্রচুর পরিমাণে নীল প্রস্তুত হচ্ছে এবং সেখান থেকে বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কন্তে, ষোড়শ শতাব্দীতে জন্ হুইঘেন ভান্ লিন্সোটেন ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ত্রাভারনিয়ের তাঁদের বইতে বিশদভাবে ভারতের নীল তৈরির প্রণালী বর্ণনা করেছেন। আইন-ই আকবরী থেকে জানা যায় যে আগ্রার নিকটে বায়নাতে ও গুজরাটের অন্তর্গত আহমদাবাদে উৎকৃষ্ট নীল রঙ প্রস্তুত হত এবং তার দাম ছিল মন প্রতি ১০ থেকে ১২ টাকা। [১] সে সময়ে বাঙলায় ও বিহারে কোনো নীল প্রস্তুত হত কিনা ঐ গ্রন্থে তার কোনো উল্লেখ নেই। বার্নিয়ের-এর বইতে দেখা যায় যে বায়না প্রভৃতি স্থানে নীল সংগ্রহ করবার জন্য ওলন্দাজ বণিকরা সেখানে বসবাস করত। [২]

পঞ্চদশ শতাব্দীতে সমুদ্রপথে ইউরোপের সঙ্গে ভারতের সংযোগ স্থাপিত হবার পূর্বে ভারতের অন্যান্য দ্রব্যের মত নীলও পারস্য উপসাগর দিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর হয়ে ইউরোপে পৌছত। দক্ষিণ ফ্রান্সের মার্সাই বন্দরের বাণিজ্য-ইতিহাসে দেখা যায় যে ১২২৪ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে যে নীল পৌছেছিল তাকে 'বাগদাদের নীল' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে এই 'বাগদাদের নীল' ভারতবর্ষ থেকেই যেত, এবং বাগদাদ হয়ে ইউরোপে পৌছত। ভারতে অনেক পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ ব্যবসায়ী নীলের ব্যবসা করে খুব লাভবান হয়েছিল। নীল এতই মূল্যবান দ্রব্য বলে গণ্য হত যে আমেরিকা আবিষ্কৃত হবার পর স্পেনীয়রা মেক্সিকোতে ও পর্তুগীজরা ব্রাজিলে নীল চাষ ও রঙ প্রস্তুত করতে শুরু করে দেয়।

ইউরোপে নীলের একটি প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল তার নাম ছিল ভোড (Woad)। কিন্তু ভোডের রঙ ভারতের নীল রঙের মতো এত গাঢ় ও সুন্দর হত না। মধ্য যুগে ইউরোপের অনেক দেশে, যেমন জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালী, ইংল্যাণ্ড ইত্যাদিতে ভোডের চাষ হত। প্রথম দিকে ইউরোপের তন্তুবায়রা ভোডের সঙ্গে নীল রঙ মিশিয়ে ব্যবহার করত। ষোড়শ শতাব্দী থেকে ইউরোপের নানা দেশে বস্ত্রশিল্প বিস্তার লাভ করতে থাকে এবং সেই সঙ্গে নীল রঙের চাহিদাও দ্রুত বেড়ে যেতে থাকে। কেননা ভোড-এর তুলনায় নীল ঢের বেশি উৎকৃষ্ট।

সেকালে হল্যাণ্ডই ছিল ইউরোপের বস্ত্রশিল্পের প্রধান কেন্দ্র ও সেখানকার রঞ্জকরা ছিল সব চেয়ে বিখ্যাত। এই কারণে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড ও অন্যান্য দেশ থেকে কাপড় রঙ করবার জন্য হল্যাণ্ডে পাঠান হত। হল্যাণ্ডের অনেক লোক এই ব্যবসা করে অল্প সময়ের মধ্যে ধনী হয়ে উঠেছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ভারত ও এশিয়ার নীল এবং আরও অনেক পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্য পর্তুগীজদেরই প্রায় একচেটিয়া ছিল। প্রায় একশত বৎসর ধরে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন শহর ছিল ইউরোপে এশীয় পণ্যদ্রব্যের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র; এক্ষেত্রে লিসবন সুপ্রাচীন ও সুবিখ্যাত বাণিজ্য-কেন্দ্র ভেনিস শহরকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একটি বিষয়ে পর্তুগীজরা ছিল খুবই দুর্বল। তারা বিদেশী পণ্যদ্রব্যের ব্যবসাতে মুনাফা করেই সন্তুষ্ট থাকত —নিজেদের শিল্প প্রসারণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করত না।

এশিয়ার পণ্যদ্রব্যের ব্যবসাতে ভাগ বসাবার জন্য ইংরেজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও পর্তুগীজদের মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত শুরু হয়ে গেল। ১৬০০ সালে ইংরেজরা, ১৬৩১ সালে ওলন্দাজরা নিজের নিজের ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠন করল। ফরাসীরাও বেশি দিন পিছনে পড়ে রইল না।

শীঘ্রই ওলন্দাজরা ভারতবর্ষ থেকে সরাসরি প্রচুর নীল আমদানি শুরু করল। তার ফলে তাদের সঙ্গে ইউরোপের অনেকগুলি দেশের সংঘর্ষ বেধে গেল, কারণ ঐসব দেশের ভোড চাষী, ভোড রঙ প্রস্তুতকারী ও তার ব্যবসায়ীরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হল। ফ্রান্সের অনেক সামন্ত-প্রধানের স্বার্থেও আঘাত পড়ল। এদের ঐশ্বর্য ভোড চাষের আয়ের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করত; এই ভোড চাষের আয় থেকেই তাঁরা ফ্রান্সের রাজাকে কর দিতেন। ভারতীয় নীলের কাছে ভোড-এর পরাভব হওয়ায় বিভিন্ন দেশের রাজা ও সামন্ত-প্রধানদের স্বার্থ স্বভাবতই আহত হল।

১৫৯৮ সালে ফরাসীদেশের রাজা ফরাসী দেশে নীলের ব্যবহার বে-আইনী বলে ঘোষণা করলেন। ১৬০৯ সালে রাজা চতুর্থ হেনরী আরও এগিয়ে গিয়ে নীল ব্যবহারকারীদের জন্য মৃত্যুদণ্ডের আইন জারী করলেন। জার্মানিতেও অনুরূপ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হল। জার্মানিতে ভোড প্রস্তুতকারীরা সমাজে বিশেষ স্থান অধিকার করতেন—তাঁরা "ভাইড হেরেন" (ভোডের জমিদার) উপাধিতে ভূষিত হতেন। ১৬০৭ সালে জার্মান সম্রাট রুডল্ফ জার্মানিতেও নীলের ব্যবহার বে-আইনী বলে ঘোষণা করলেন।

ইংল্যাণ্ডেও একদিকে ভোড আর একদিকে নীল ব্যবহারকারীদের মধ্যে সংগ্রাম অনেকদিন পর্যন্ত চলেছিল। ইংল্যাণ্ডের তন্তুবায়রা কাপড় রঙ করবার জন্য শুধু ভোড ব্যবহার করতেই জানত—নীল ব্যবহার করবার কায়দা জানত না। তাই অনেক ইংরেজ বস্ত্র-ব্যবসায়ী হল্যাণ্ড থেকে কাপড় রঙ করিয়ে আনত এবং এইসব বস্ত্র উৎকৃষ্ট ও জনপ্রিয় বলে বেশি মূল্যে বিক্রি করত। একজন প্রতিষ্ঠাবান ইংরেজ ব্যবসায়ী হল্যাণ্ড থেকে নীল ব্যবহার করার কায়দা শিখে এলেন এবং ১৬০৮ সালে ইংল্যাণ্ডের রাজার নিকট থেকে নীল দিয়ে কাপড় রঙ করবার একচেটিয়া অধিকার লাভ করলেন। তার সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে প্রস্তুত বস্ত্র হল্যাণ্ডে রঙ করা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল। তার ফলে ইংল্যাণ্ডের সাধারণ তন্তুবায় ও বস্ত্র ব্যবসায়ীরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হতে লাগল এবং এই আইনের বিরুদ্ধে ও নীল ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু করে দিল। আন্দোলন এমন পর্যায়ে উঠল যে আদালতের এক বিচারে বিচারপতিকে এই বলে রায় দিতে হল যে নীল বিষাক্ত দ্রব্য, সুতরাং সাধারণের স্বার্থে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। এই রায় অনুসারে একটা আইন প্রণীত হতেও বিলম্ব হল না, এবং সেই আইন পরবর্তী ৫০ বৎসর ধরে বলবৎ রইল।

কিন্তু এতসব কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বস্ত্রশিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নীলের ব্যবহার বেড়ে যেতে লাগল ও সেই অনুপাতে ভোডের চাষও কমতে লাগল, আর ভোড রঙ প্রস্তুত করবার কারখানাগুলিও উঠে যেতে লাগল। অন্যদিকে নীল ব্যবহারের ফলে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়মের বস্ত্রশিল্প দ্রুত প্রসার লাভ করতে লাগল।

ইংল্যাণ্ডের বস্ত্রশিল্প এত ক্ষতিগ্রস্ত হতে লাগল যে তার প্রতিবিধানের জন্য রাজা দ্বিতীয় চার্লস ১৬৬০ সালে নিজের দেশের বস্ত্রশিল্পকে বাঁচাবার জন্য

বেলজিয়ম থেকে কয়েকজন রঞ্জক আনিয়ে ইংরেজ তন্তুবায়দের নীল রঙ ব্যবহার করবার পদ্ধতি শেখাবার ব্যবস্থা করলেন। এই সময় থেকে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারত থেকে ইংল্যাণ্ডে নীল চালানের পরিমাণ অনেক বেড়ে যেতে লাগল। ১৬৬৪ সাল থেকে ১৬৯৪ সাল পর্যন্ত তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ১২, ৪২,০০০ পাউণ্ডে। এই নীল সংগৃহীত হয়েছিল প্রধানত আগ্রা, লাহোর, ও আহ্‌মেদাবাদ থেকে। এই সময়ে বাংলার নীলের কথা কোথায়ও উল্লেখ নেই।

এইভাবে ক্রমে ক্রমে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নীল ব্যবহারের উপরে নিষেধাজ্ঞা ইউরোপের প্রায় সব দেশ থেকেই উঠে গেল, যদিও ঐ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত জার্মানির ন্যুরেমবুর্গ শহরের রঞ্জকরা তাদের নীল বর্জনের প্রতিজ্ঞায় অটল রইল। ইতিমধ্যে ইউরোপে নীলের বিকল্প দ্রব্য আবিষ্কার করার যে সব প্রচেষ্টা হয়েছিল তার সব কটাই ব্যর্থ হল। অন্যদিকে নীল ব্যবসা খুব লাভজনক বলে তার চাহিদা ক্রমশ বেড়ে যেতে লাগল এবং তার ফলে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় ইংরেজ, ফরাসী, স্প্যানীশ ও পর্তুগীজ ঔপনিবেশিকরা নীলের চাষ শুরু করে দিল। কিছুদিনের মধ্যেই তারা ভারতীয় নীলের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল।

বাংলা দেশে ১৭৭৭ সালে লুই বন্নো (Louis Bonnaud) নামক একজন ফরাসী বর্তমান প্রণালীতে প্রথম নীল প্রস্তুত করা আরম্ভ করেন। এই ফরাসী বণিকটি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে এসে চন্দননগরের নিকট তালডাঙ্গা ও গোন্দলপাড়ায় দুটি নীলকুঠি স্থাপন করেন। নীলের ব্যবসায়ে বন্নো প্রচুর ঐশ্বর্যের মালিক হন। আরও অনেক স্থানে তিনি নীলকুঠি স্থাপন করেন। কালনা কুঠি থেকে মাত্র এক বছরেই তিনি ১৪০০ মণ নীল রপ্তানি করেছিলেন। [৩] ইংরেজদের মধ্যে ক্যারেল ব্লুম নামক এক ব্যক্তি ১৭৭৮ সালে বাংলাদেশে প্রথম নীলকুঠি স্থাপন করেন।

১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানির সরকার সাধারণভাবে সকল ইউরোপীয়কেই বাংলা ও বিহারে নীলচাষের অধিকার দেয়। পাদ্রী উইলিয়ম কেরী ভারতে এসে প্রথম দিকে মদনাবতীর নীলকুঠিতে ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছিলেন। এই সময়কার বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টরস্-এর চিঠি-গুলি থেকে জানা যায় যে বাংলার নীল ব্যবসা খুব সুবিধাজনক হচ্ছিল না। ১১ই এপ্রিল, ১৭৮৫সালের চিঠিতে তাঁরা গভর্নর জেনারেলের নিকট অনুযোগ

করেন যে বাংলার নীলের দাম অত্যন্ত বেশি; কাজে-কাজেই তা ফরাসীর স্যাঁ ডমিংগো, আমেরিকার কেরোলিনা, অথবা স্প্যানীশদের নীলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না। পরের বৎসর তাঁরা আবার জানান যে "যখন আমরা বাংলার সস্তা মজুরি ও তার অনুকূল জলবায়ুর কথা ভাবি, তখন আমাদের কোন সন্দেহ থাকে না যে রপ্তানি করার জন্য ওখানকার নীল একটা মহা মূল্যবান দ্রব্য হতে পারে। এবিষয়ে আপনাদের সবিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করছি।" পরের বছর তাঁরা জানান যে নীল, কার্পাস ও চিনি তৈরি করার জন্য রবার্ট হেভেন নামক এক ব্যক্তিকে ৫ বছরের জন্য বাংলায় পাঠাচ্ছেন, "যিনি গত ১৩ বৎসর ধরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে এই সব মূল্যবান দ্রব্যের উৎপাদনে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।" তাঁকে যেন সরকার সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। [৪]

আবার তার পরের বছর, ১৭৮৮ সালে কোম্পানির ডিরেক্টররা লিখলেন যে নীলের অর্থনৈতিক দিক ছাড়াও একটা রাজনৈতিক দিক আছে যার গুরুত্ব খুবই বেশি। নীলের জন্য প্রচুর টাকা প্রতিবৎসর বিদেশীদের দিতে হচ্ছে। বাংলা দেশের জমিতে 'নেটিভ'-দের পরিশ্রমে যদি নীলের মত মূল্যবান ও ইংল্যাণ্ডের বস্ত্রশিল্পের জন্য অতি প্রয়োজনীয় একটা রপ্তানি দ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহলে কেম্পানির রাজস্বের মূল্য অনেক বেড়ে যাবে। এত অধিক পরিমাণে খরচ করার পর নীলচাষ অবহেলা করা কখনই সমীচীন হবে না। ঐ চিঠিতে ডিরেক্টররা আরও লেখেন যে কোম্পানির কর্মচারীরা যদি বাংলা দেশ থেকে টাকার পরিবর্তে নীল পাঠায় তা'হলে টাকা পাঠানোরই সমান হবে। [৫]

এই সময়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে বেশ কয়েকজন নীলকরকে নিয়ে এসে, তাদের অনেক সুযোগ সুবিধা দিয়ে অনেক অর্থ সাহায্য করে বাংলার কয়েকটি জেলায় তাদের বসিয়ে দেওয়া হয়। এই ভাবে কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলায় নীলচাষ দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হবার পূর্বেই বাংলা দেশের মাটিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৭৯০ সালে ইংল্যাণ্ড ১,৮৪০,৮১৫ পাউণ্ড নীল আমদানি করেছিল, তার মধ্যে ৬২৬,০৪২ পাউণ্ড এসেছিল আমেরিকা থেকে, ৩৫৫,৮৫৯ পাউণ্ড স্পেন থেকে, ১২৬,২২০ পাউণ্ড ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে, আর ৫৩১,৬১৯ পাউণ্ড সমগ্র এশিয়া থেকে। কিন্তু মাত্র ৫ বছর পরে ১৭৯৫ সালে দেখা গেল সে কেবল মাত্র বাংলা দেশ থেকেই

২,৯৫৫,৮৬২ পাউণ্ড নীল ইংল্যাণ্ডে রপ্তানি হয়েছে। পরের বছর ইংল্যাণ্ডে নীল রপ্তানি হয় ৪,৫৪৮,৬৭০ পাউণ্ড; তার মধ্যে ভারতবর্ষ থেকে যায় ৩,৮৯৭,১২০ পাউণ্ড। এর মধ্যে ইংল্যাণ্ডের বস্ত্রশিল্পের জন্য প্রয়োজন হয় ২ মিলিয়ন পাউণ্ড, আর বাকি অংশ ইংরেজ বণিকরা অন্যদেশে রপ্তানি করে। [৬] বস্তুত কয়েক বৎসরের মধ্যেই নীল ব্যবসা ইংরেজদেরই একচেটিয়া হয়ে পড়ল। বাংলা দেশে নীলচাষের এত দ্রুত প্রসার লাভের একটা কারণ ছিল এই যে, এই সময়ে ফরাসী, স্প্যানীশ ও পর্তুগীজরা দেখতে পায় যে কফির চাষ নীলের চাইতে বেশি লাভজনক—তাই তারা নীল চাষের পরিবর্তে কফির চাষ শুরু করে দেয়।

বাংলায় নীলচাষের দ্রুত অগ্রগতির আর একটা কারণ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডে কোনো প্রকার কার্পাস শিল্প ছিল না বললেই চলে। সেখানে বস্ত্রশিল্পের মধ্যে ছিল প্রধানত পশম-শিল্প। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ইংল্যাণ্ডে যে শিল্প-বিপ্লব আরম্ভ হয় তার ফলে ঐ দেশে কার্পাস শিল্পও দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং শীঘ্রই জগতের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে। ইংরেজ কর্তৃক ভারত বিজয় ও ভারতের সঞ্চিত ঐশ্বর্য লুণ্ঠন, ভারতের বস্ত্রশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের ধ্বংস সাধন, ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্যের বাজাররূপে ও ব্রিটিশ শিল্পের জন্য কাঁচামাল সরবরাহের উৎস রূপে ভারতের পরিণতি লাভ—এইগুলিই ছিল ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্লবের অন্যতম প্রধান কারণ। যাইহোক, ইংল্যাণ্ডে বস্ত্রশিল্পের প্রসার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে নীলের চাহিদাও বেড়ে যেতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য। নীল ব্যবসায়ের সঙ্গে ইংরেজের সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টাটাও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। বাংলায় নীলচাষ সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে ইংরেজরা বেশির ভাগ নীল অযোধ্যা, আগ্রা ও পাঞ্জাব থেকে কিনত। এ সব প্রদেশ তখনও স্বাধীন ছিল। যেসব পন্থার দ্বারা তারা এসব রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছিল, নীল ব্যবসা যে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল তা তখনকার কোম্পানির চিঠি পত্র থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

উত্তর ভারত জয় করতে নীল ব্যবসা ইংরেজকে অনেক সাহায্য করেছিল এবং অযোধ্যাতে নীলের লভ্যাংশের টাকায় ইংরেজ এমন দুর্ধর্ষ বাহিনী গড়ে তোলে যা কালক্রমে পাঞ্জাব বাহিনীকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়। [৭]

যাইহোক, ১৭৭৭ থেকে ১৮০৩ পর্যন্ত কোম্পানি-সরকারের অর্থে ও আরও নানাপ্রকার সাহায্যে বাংলায় ও বিহারে নীলচাষ ও নীলকুঠি সুপ্রতিষ্ঠিত হল। বলাবাহুল্য এই অর্থ কোম্পানি বিলাত থেকে আনেনি, তা ভারত-বাসীরই অর্থ। ১৮০৩ সাল পর্যন্ত নীল চাষের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হত তা প্রায় সবই কোম্পানি খুব অল্প সুদে নীলকরদের আগাম দিত। যে নীল প্রস্তুত হত তার সবটাই কোম্পানি কিনে নিত ও ইংল্যাণ্ডে চালান দিত। এইভাবে লবণ, আফিং ইত্যাদি অন্যান্য ব্যবসার মতো নীল ব্যবসাও কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসাতে দাঁড়িয়ে গেল। কোম্পানির পুরনো হিসাব-পত্রে দেখা যায় যে ১৭৮৬ থেকে ১৮০৩ পর্যন্ত তারা নীলকরদের প্রায় ১ কোটি টাকা আগাম দিয়েছিল। [৮] এই সময় থেকে নীলের ব্যবসা এত বেশি লাভ-জনক হতে লাগল যে কোম্পানির কর্তারা আনন্দে আটখানা হয়ে ১৮০৬ সালে গভর্নর জেনারেলকে লিখলেন যে "আমরা এই উচ্চ আশা পোষণ করি যে এই দ্রব্যটি আমাদের প্রভূত পরিমাণ লাভের উৎস স্বরূপ হবে।" [৯] আর সত্য সত্যই নীল ব্যবসা কোম্পানির পক্ষে কী প্রচুর লাভের ব্যবসা হয়ে দাঁড়াল তা নিচের হিসাব থেকেই অনুমান করা যাবে।

কলকাতা থেকে নীলের রপ্তানি। [১০]

	১৮০৫-৬		১৮০৬-৭		১৮০৭-৮	
	বাক্সসংখ্যা	মূল্য টাঃ	বাক্সসংখ্যা	মূল্য টাঃ	বাক্সসংখ্যা	মূল্য টাঃ
লণ্ডনে	১৩,৪৮৮	৪৫,২৩,১২৪	১৭,৫৪২	৫৭,৩১,৩৯০	২১,০২৭	৮১,৮৯,৬৪৮
ইউরোপে	৪৩৭	১,৫২,২২৭	৫৮৭	২,১০,৭০২	১,২৪৯	৪,৮৩,২৪০
আমেরিকায়	৪৭৭	২,১৩,৪৯০	১,৫৪৮	৪,৯৭,৪৫৮	৩,২৫৭	১১,১৫,০৬৪
এশিয়া ও আফ্রিকায়	৯৮৫	৩,০৩,৫৩৩	২,০৭২	৬,০৭,৭৪০	১,৭৩১	৫,৯০,২১২
মোট	১৫,৩৮৫	৫১,৯২,৭৭৪	২১,৭৪৯	৭২,৩৮,২৮৮	২৭,৩০৯	১,০৩,৭৮,১৬৮

এক এক বাক্সে ৩॥ মণ করে, অর্থাৎ ২৬২॥ পাউণ্ড (১ মণ = ৭৫ পাউণ্ড) করে নীল থাকত। উপরের সংখ্যাগুলি থেকে দেখা যায় যে কোম্পানি কলকাতায় যে নীল কিনত তার দাম তারা দিত পাউণ্ড প্রতি একটাকা চার আনারও কম। অথচ এই একই নীলের দাম লণ্ডনের বাজারে ছিল অনেকগুণ বেশি, যথা, ১৮১০ সালের দর ১০ শিলিং থেকে ১৩॥ শিলিং পর্যন্ত,

অর্থাৎ তখনকার টাকার মূল্যে পাউণ্ড প্রতি ৫ টাকা থেকে প্রায় ৭ টাকা। [১১]

একজন ইংরেজ লেখক দেখিয়েছিলেন যে ১৮০০ সালে যেখানে বাংলা দেশ ৩৯,০০০ মণ নীল তৈরি করেছিল, অন্যান্য দেশগুলি সব মিলে করেছিল মাত্র ১৪,০০০ মণ। "১৮১৫-১৬ সালে বাংলায় ১২৮,০০০ মণ নীল তৈরি হল, এবং সেই সময় থেকে একমাত্র বাংলাই সমস্ত দুনিয়ার নীলের চাহিদা মিটিয়ে এসেছে।" (Delta : Indigo and its Enemies P. 62) বাংলায় নীলের চাষ এতই লাভজনক হয়ে উঠল যে কোম্পানির এজেন্টরা যারা কোম্পানির একচেটিয়া আফিং, রেশম ইত্যাদির ব্যবসা পর্যবেক্ষণ করবার জন্য মফস্বলে থাকত তারা চাকুরি ছেড়ে দিয়ে নীলকুঠি খুলে বসতে লাগল। অন্যান্য দ্রব্যের কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসা হওয়াতে, একমাত্র নীলের ব্যবসাতেই তারা বিশেষ লাভ করতে পারত। কিন্তু লাভের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে তাদের সঙ্গে কোম্পানির ঝগড়াবিবাদ লেগেই থাকত। ১৮০২ সালে লণ্ডনে কোম্পানির ডিরেক্টররা স্থির করলেন যে কুঠিয়ালদের আর আগাম টাকা দেওয়া হবে না, কারণ "নীল থেকে কুঠিয়ালরা এত বেশি মুনাফা করে যে তার থেকেই তারা চাষের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সব টাকা ব্যয় করতে সক্ষম।"

কয়েক বছরের মধ্যে ইংরেজ কুঠিয়ালরা এত ধনী ও ক্ষমতাশালী হয়ে উঠল যে তাদের শক্তি খর্ব করার জন্য ১৮১১ সালে কোম্পানি স্থির করল যে 'নেটিভ'-দেরও নীলকুঠি স্থাপন করবার অধিকার দেওয়া হবে ; সেই সঙ্গে তাদের উৎসাহ দেবার জন্য তাদেরও আগাম টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু কোম্পানির এই সদিচ্ছা কাগজেকলমেই থেকে গেল, কাজে বিশেষ পরিণত হল না। এবং কোম্পানির এই সংকল্পের কথাটা তখন কোনো ভারতবাসীর কর্ণগোচরও হয়নি। একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে ইংরেজ নীলকররা কোম্পানির স্বার্থে যতই আঘাত দিক না কেন, তারা ছিল তাদেরই স্বগোত্রীয়, এবং এই ঝগড়াটা ছিল তাদের নিজেদের মধ্যে একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব। কিন্তু এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে (এবং এরূপ অন্তর্দ্বন্দ্ব তাদের আরও অনেক ছিল) ইংরেজ বণিকরা এত বড় একটা লাভজনক ব্যবসা ক্ষমতাহীন, পরাধীন ভারতবাসীর হাতে সত্য সত্যই তুলে দেবে এত বড় মূর্খ তারা ছিল না। যাইহোক, ইংরেজরা নীল ব্যবসায়ে বাংলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর বাংলার অনেক জমিদারও নীলকুঠি

স্থাপন করে এই ব্যবসায় যোগ দিয়েছিলেন, যদিও সরকারের কাছ থেকে কোনো সাহায্যই তাঁরা পাননি। তবে চিরকাল তাঁদের ইংরেজদের ছোট তরফের অংশীদার হয়েই থাকতে হয়েছিল। বাংলার নীল সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদের হটিয়ে দিয়ে মাত্র ২০ বছরের মধ্যে—আঠারো শতকের শেষভাগেও উনিশ শতকের প্রথম ভাগে—বাংলাদেশে তো প্রতিষ্ঠা লাভ করলই তার উপরে বিশ্বের বাজারেও একচেটিয়া অধিকার কায়েম করল। এই প্রতিষ্ঠা সে ভোগ করল প্রায় একশো বছর ধরে। বাংলা ও বিহারে প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও পঞ্চাশ বৎসর ধরে নীলের চাষ কিভাবে বেড়েই চলেছিল তা নিম্নলিখিত সংখ্যা-গুলি থেকে (Calcutta Review, March 1860, P. 123) ভালভাবেই বোঝা যায় :

বাংলায় প্রস্তুত নীল

	১৮১১-১২ থেকে ১৮২০-২১	১৮২১-২২ থেকে ১৮৩০-৩১	১৮৩১-৩২ থেকে ১৮৪০-৪১	১৮৪১-৪২ থেকে ১৮৫০-৫১
মণ (৮০ পাঃ হিঃ)	৮,৪৬,৮০০	১০,৯২,৪০০	১১,০০,০০০	১২,৫১,০০০
(বাক্স)	২,২২,৫০০	৩,০১,১০০	৩,১১,২০০	৩,৪৫,১১০
ইংল্যাণ্ডে রপ্তানি (বাক্স)	১,৭১,২০০	২,৩৮,০৭০	২,৫৪,৫০০	৩,০০,১১০
প্রতি পাউণ্ডের গড়পড়তা মূল্য শিলিং পেন্স হিসাবে — উৎকৃষ্ট	৮ থেকে ১০।৮	৯।৩ থেকে ১০।৯	৭।৫ থেকে ৮।১	৫।৪ থেকে ৬।৪
সাধারণ	৫।৪ থেকে ৭	৫।৯ থেকে ৭।১০	৪।১০ থেকে ৫।১১	৫ থেকে ৬।৩

কিন্তু বাংলার নীল এত বড় একটা সম্পদ হলেও, নীলের যে উৎপাদক—বাংলার চাষী—নীল থেকে সে কি পেল, কতখানি লাভবান হল, কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হল, আর বাংলাদেশেরই বা কোনো শ্রীবৃদ্ধি হল কি না—এই সব প্রশ্নই এখন বিচার করা প্রয়োজন।

বাংলার নীলচাষী

ইংরেজ শাসনে ভারতে কতকগুলি বাগিচা-শিল্প গড়ে ওঠে, যেমন চা, কফি, রবার নীল ইত্যাদি। কিন্তু অন্যান্য বাগিচা-শিল্পের সঙ্গে নীলের একটা বড় রকমের পার্থক্য ছিল। চা, কফি, রবার শিল্পগুলিতে চাষ থেকে শুরু করে সব কিছু কোম্পানিরই দায়িত্ব; জমিতে মজুর ও কর্মচারী নিয়োগ করা মূলধন বিনিয়োগ করা—কোম্পানিকে করতে হত সব কিছুই। কিন্তু নীলকররা খুব কম জমিতেই নিজেদের দায়িত্বে চাষ করত; সাধারণত চাষীদের দাদন দিয়ে চাষীদেরই জমিতে তাদের দিয়ে নীলচাষ করিয়ে নিত। দাদন নেবার সময় চুক্তিপত্রে চাষীদের সই করে দিতে হত যে তারা এতটা জমিতে নীল বুনবে ও একটা নির্দিষ্ট দামে ঐ নীলগাছ নীলকরকে বিক্রি করবে।

বাংলায় নীলচাষের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই নীলচাষীদের উপর নীলকরদের অত্যাচার, উৎপীড়ন ও শোষণ নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ৫০ বছরেরও আগে 'ডন' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাকলাদার লিখেছিলেন:

"আঠারো শতকের শেষ ভাগে ভারতে নীলচাষ বিস্তারের সময়ে ইউরোপীয়রা এ-দেশে এসেছিল দাস-মালিকদের মনোবৃত্তি নিয়ে। নিরংকুশ স্বৈরতন্ত্রের প্রচণ্ড লোভের সঙ্গে উদ্ভাবনী কল্পনাশক্তি মিলিত হয়ে যত রকম উপায় আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল, তার প্রত্যেকটিকেই নীলকর সাহেবরা এদেশে প্রয়োগ করেছিল। বাংলা দেশের ফৌজদারী আদালতের সমসাময়িক নথীপত্রই অকাট্য প্রমাণ যে নীলচাষ প্রবর্তনের দিনটি থেকে শুরু করে তা একেবারে উঠে না যাওয়া পর্যন্ত যে সমস্ত পন্থায় রায়তদের নীল চাষে বাধ্য করা হত তার মধ্যে ছিল হত্যাকাণ্ড, বিচ্ছিন্নভাবে খুন, ব্যাপকভাবে খুন, মারদাঙ্গা, লুঠতরাজ, গৃহদাহ, লোক অপহরণ। [১২]

নীলের চাষ করবার উদ্দেশ্যে ইংরেজ নীলকররা প্রথমে যখন আসে তখন তাদের এদেশে জমি কিনবার অধিকার ছিল না। তাছাড়া অবাধে এদেশে আসাও তখন নিষিদ্ধ ছিল। এখানে আসবার জন্য কিংবা ব্যবসা করবার জন্য কোম্পানি-সরকারের কাছ থেকে তাদের 'লাইসেন্স' নিতে হত। কোম্পানির

অনেক কর্মচারীও কোম্পানির কাজ ছেড়ে দিয়ে কলকাতার ধনী ইংরেজ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা ধার করে ও কিছু জমি বেনামীতে সংগ্রহ করে নীলকুঠি খুলে এক এক স্থানে বসে যায়। প্রথমে জমিদারের অধীনে অল্পসল্প জমি-জমা নিয়ে নীলকররা স্থানীয় রায়তদের সাহায্যে নীলচাষ শুরু করে। এসম্বন্ধে শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর যশোহর খুলনার ইতিহাসে লিখেছেন: "পরে ১৮১৯ অব্দের অষ্টম আইনে (Regulation VIII of 1819) জমিদারদিগকে পত্তনী তালুক বন্দোবস্ত করিবার অধিকার দেওয়ায় এক এক পরগণার মধ্যে অসংখ্য তালুকের সৃষ্টি হইল এবং জমিদারগণ নবাগত নীলকরদিগের বড় বড় পত্তনী দিতে লাগিলেন। এদেশীয় সম্পত্তিশালী ব্যক্তিরাও নিজের অথবা পরের জমিদারীর মধ্যে পৃথকভাবে পত্তনী লইয়া নীলের ব্যবসায়ে যোগ দিলেন। তাঁহাদের মধ্যে নড়াইলের জমিদারেরা অগ্রণী। সাহেবদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া কাজ চালাইবার জন্য উহারা সাহেব ম্যানেজার রাখিয়াছিলেন।" [১৩]

এসব ইংরেজ নীলকররা কি প্রকৃতির লোক ছিল তা একজন ইংরেজ লেখকই সুন্দরভাবে বর্ণনা করে গিয়েছেন ১৮৪৮ সালে Calcutta Review পত্রিকায়, ৩০ বছর আগেকার নীলকর শীর্ষক প্রবন্ধে:

"নীলকর একজন ভাগ্যান্বেষী দুঃসাহসী দুর্বৃত্ত। তার প্রথম কাজ একটা স্থান খুঁজে বের করা যেখানে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। তার পন্থা হচ্ছে ৫০ থেকে ১০০ বিঘা কিংবা আরও বেশি আয়তনের একটা জমি কেনা এবং সেই সঙ্গে কতকগুলি গামলা ও যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি সংগ্রহ করে একটা ফ্যাক্টরি স্থাপন করা।...কোম্পানির সনদ অনুযায়ী এই সেদিন পর্যন্ত সে কোনো সম্পত্তির অধিকারী হতে পারত না। বস্তুত ফ্যাক্টরির জমি, এমনকি ফ্যাক্টরিটি পর্যন্ত থাকত বেনামীতে।...অসংখ্য ভয়াবহ দাঙ্গাহাঙ্গামার কথা আমরা জানি। মাত্র দু-একটি নয় এমন শতশত মুখোমুখি লড়াইয়ের উদাহরণ আমরা দিতে পারি যেখানে ২ জন, ৩ জন, এমন কি ৬ জনও নিহত হয়েছে এবং সেই অনুপাতে আরও অনেকে আহত হয়েছে; অসংখ্য খণ্ডযুদ্ধে পশ্চিমা ব্রজভাষাভাষী ভাড়াটে সৈন্যরা এমন দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করেছে যে, তা যে কোনো যুদ্ধে কোম্পানির সৈন্যদের পক্ষে গৌরবজনক হত; বহুক্ষেত্রে নীলকর সাহেব কৃষক লাঠিয়ালদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে, তার তেজীয়ান ঘোড়ার পিঠে চেপে অতি দক্ষতার সঙ্গে পলায়ন করে প্রাণ বাঁচিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কৃষকেরা সশস্ত্র আক্রমণের দ্বারা নীলকুঠিগুলিকে

ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছে; অনেক স্থানে এক পক্ষ বাজার লুট করেছে, তার পরক্ষণেই অপর পক্ষ এসে তার প্রতিশোধ নিয়েছে।"

উপরি-উক্ত লেখক আরও বলেছেন যে বাংলার কৃষকরা তাদের অধিকার বিনা সংগ্রামে ছেড়ে দেয়নি; তাদের পরাভূত করবার জন্য ক্ষমতাশালী নীলকরদের অনেকদিন ধরে লড়তে হয়েছিল এবং কৃষকদের এই সংগ্রামকে তিনি ইংরেজের ভারতবর্ষ জয় করার অভিযানের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন যে অনেক যুদ্ধের পর ইংরেজ যেভাবে তার সাম্রাজ্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল, ঠিক সেইভাবেই শক্তিশালী নীলকররাও তাদের একাধিপত্য স্থাপন করেছিল। [১৪]

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রথম থেকেই নীলকরদের যে সব অত্যাচার-অনাচার অনুষ্ঠিত হত তা দেশের লোকের অজানা ছিল না। তখনকার দিনে যে কয়েকটি বাংলায় সংবাদপত্র বের হত তাতে যে এ-বিষয়ে অনেক সময় আলোচনা হত তা 'সমাচার দর্পণ'এর নিম্নের উদ্ধৃতি থেকেই বেশ বোঝা যায়:

"মফস্বলে কোন ২ নীলকারকেরা প্রজার উপর দৌরাত্ম্য করেন তাহার বিশেষ এই। যে প্রজা নীলের দাদন না লয় তাহাদিগের প্রতি ক্রোধ করিয়া থাকেন ও খালাসীদিগকে কহিয়া রাখেন যে ঐ সকল প্রজার গরু নীলের নিকট আইলে সে গরু ধরিয়া কুঠিতে আনিবা। তাহারা ঐ চেষ্টাতে নীলের জমির নিকট থাকে কিন্তু যখন গরু নীলের নিকট আইসে যদ্যপি নীলের কোনো ক্ষতি না করে তথাপি তখনি সে গরু ধরিয়া কুঠিতে চালান করে, সে গরু এমত কয়েদ রাখে যে তৃণ ও জল দেখিতে পায় না। ইহাতে প্রজা লোক নিতান্ত কাতর হইয়া কুঠিতে যায়। প্রথম তাহারদিগকে দেখিয়া কেহ কথা কহে না পরে গরু অনাহারে যত শুষ্ক হয় ততই প্রজার দুঃখ হয় ইহাতে সে প্রজা রোদনাদি করিয়া সরকার লোককে কিছু ঘুস দিয়া ও নীল দাদন লইয়া গরু খালাস করিয়া গৃহে আইসে। এবং নীলের দাদন যে প্রজা লয় তাহার মরণ পর্যন্ত খালাস নাই যেহেতুক হিসাব রফা হয় না, প্রতিসনেই দাদন সময়ে বাকীদার কহিয়া ধরিয়া কয়েদ রাখে। তাহাতে প্রজারা ভীত হইয়া হালবকেয়া বাকী লিখিয়া দিয়া দাদন লইয়া যায়। এইরূপ যাবৎ গোবৎসাদি থাকে তাবৎ ভিটায় থাকে তাহার অন্যথা হইলে স্থান ত্যাগ করে যেহেতুক দাদন থাকিতে অন্য শস্য আবাদ করিয়া নির্ব্বাহ করিতে পারে না।" [১৫]

ইণ্ডিগো কমিশনের রিপোর্টের উপর ১৮৬০ সালে তদানীন্তন বাংলার লেফটেনান্ট গভর্নর গ্রান্ট যে মন্তব্যলিপি পেশ করেছিলেন তার প্রথম কথাই হল যে, 'সরকারী নথীপত্রে দেখা যায় একেবারে প্রথম থেকেই বাংলা দেশে নীলচাষ প্রথা অস্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠেছে। সব ব্যবসাতেই সকল অংশীদারেরা পারস্পরিক স্বার্থের প্রচলিত বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, কিন্তু এই একটি মাত্র ব্যবসায়ে এবং এই একটি মাত্র প্রদেশে নীলকররা সবসময়েই স্বাভাবিক ও সুস্থ নিয়মের একটা অদ্ভুত ব্যতিক্রম।" [১৬]

এই উক্তির সমর্থনে গ্র্যাণ্ট বলেন যে ১৮১০ সালে যখন লর্ড মিণ্টো বড়লাট তখন চারজন নীলকরকে বাংলার অভ্যন্তরে বসবাস করবার জন্য যে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তা এই কারণে প্রত্যাহার করা হয় যে, তাদের বিরুদ্ধে কৃষকদের উপরে মাত্রাহীন অত্যাচার চালাবার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছিল। কেবল তাই নয়, এই প্রসঙ্গে ঐ বছরের ১৩ই জুলাই তারিখে তখনকার বড়লাট একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা প্রয়োজন বলে মনে করেছিলেন। সেই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, "বাংলায় বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয় নীলকররা যে সমস্ত অত্যাচার-অনাচার করছে তার প্রতি সরকারের দৃষ্টি বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। সম্প্রতি এই সব উৎপীড়ন যদিও অসংখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, তবুও মাননীয় বড়লাট বাহাদুর আশা করেন যে এই অপবাদ সমষ্টিগতভাবে সমগ্র নীলকরদের বিরুদ্ধে আরোপ করা যায় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে-সব ঘটনা ইদানীং ঘটেছে এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালতে ও সুপ্রিম কোর্টে গুরুতর অপরাধজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলি ইংরেজ চরিত্রের উপর কলঙ্ক এনে দেয় ও দেশীয় প্রজাদের শান্তি ও সুখের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। যাতে এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটতে পারে তার জন্য বড়লাট বাহাদুর বর্তমান অবস্থানুযায়ী যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা অবশ্যকর্তব্য বলে মনে করেন।

"বিশিষ্ট নীলকরদের বিরুদ্ধে যে-সব অপরাধ সংশয়াতীত ও অবি-সংবাদিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে সেগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে :

১ম—হিংসাত্মক আক্রমণ, যার ফলে এ দেশীয় লোকদের জীবন নাশ হয়েছে, যদিও আইনত তা নরহত্যা বলে গণ্য নাও হতে পারে।

২য়—নানা রকম অজুহাতে এ দেশীয় লোকদের গুদামে আটক রাখা,

বিশেষ করে তাদের গরুবাছুর আটক রাখা, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে তথাকথিত পাওনা আদায় করা।

৩য়—নিজেদের ভাড়াটে লোকজন জড়ো করে ভীষণ গণ্ডগোলের সৃষ্টি করা এবং অন্যান্য নীলকরদের সঙ্গে দাঙ্গাহাঙ্গামায় ব্যাপৃত হওয়া।

৪র্থ—চামড়া মোড়ানো বেতের দ্বারা (এই বেতকে 'শ্যামচাঁদ' বলা হত। 'নীলদর্পণ'-এ শ্যামচাঁদের উল্লেখ আছে) কৃষকদের ও অন্যান্যদের প্রহার করা ও তাদের আরও অনেক উপায়ে শাস্তি দান করা।" [১৭]

এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারের কিছুকাল পরে ২২শে জুলাই ১৮১০ সালে ম্যাজিস্ট্রেটদের উপরে নির্দেশ জারী করা হল যে, যেসব ক্ষেত্রে নীলকরদের অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে কিংবা যেসব ক্ষেত্রে নীলকররা চাষীদের জোর করে দাদন দিয়ে অথবা অন্য রকম বেআইনীভাবে নীলচাষ করতে বাধ্য করেছে তা যেন তাঁরা রিপোর্ট করেন। বড়লাট আরও বললেন যে এই সব অভ্যাসগুলিই যে নীলকরদের চরিত্রগত হয়ে গিয়েছে তা মনে করবার তাঁর যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু বলা বাহুল্য যে এই বিজ্ঞপ্তি ও নির্দেশজারীর বিশেষ ফল হয়নি —কারণ তখনকার দেশের অবস্থায় দেশের অভ্যন্তরে, গ্রামাঞ্চলে নীলকরদের অপরাধ 'প্রমাণ' করা সহজসাধ্য ছিল না; তাছাড়া সে-সময়ে ম্যাজিস্ট্রেট, আদালত, পুলিশ ইত্যাদির সংখ্যাও খুব বেশি ছিল না। আরও একটি কথা এই যে ম্যাজিস্ট্রেটরা তো নীলকরদেরই জাতভাই—'নেটিভদের' বিরুদ্ধে নীলকরদের অপরাধ 'প্রমাণ' করবার আগ্রহ তাদের থাকার কথা নয়। গ্র্যাণ্ট নিজেই তাঁর রিপোর্টে বলেছেন যে যদিও কয়েকজন নীলকরের লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হয়েছিল ও কয়েকজনের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা আনা হয়েছিল, তাতে নীলকরদের অত্যাচার সামান্যই কমেছিল। [১৮] নীলকরদের অত্যাচার যে সমানভাবে চলতে থাকে তা উপরিউদ্ধৃত ১৮২২ সালের 'সমাচার দর্পণ' থেকেই বোঝা যায়।

বরং দেখা যায় যে, ক্রমশ তাদের জন্য নানাপ্রকার আইন প্রণয়ন করে তাদের জন্য বিশেষ বিশেষ অধিকার ও সুযোগসুবিধা সৃষ্টি করে দেওয়া হল। ১৮২৩ সালের ষষ্ঠ আইনের দ্বারা (Regulation VI of 1823) নীলকর যে সব চাষীদের টাকা বা নীল বীজ দাদন দিয়েছে তাদের জমির উপর একটা বিশেষ স্বত্ব ও অধিকার (a lien and interest in the land) পেল। এই

আইনের বলে আদালতেও নীলকরদের কতকগুলি বিশেষ সুবিধার সৃষ্টি করে দেওয়া হল।

কিন্তু এত ক্ষমতা ভোগ করেও এবং এত অত্যাচার করেও নীলকরদের আশা মিটল না। তারা আরও ক্ষমতা পাবার জন্য আন্দোলন চালাতে লাগল। তাদের যুক্তি এই যে তারা বিদেশ-বিভুঁইয়ে এসে অশিক্ষিত নেটিভদের মধ্যে দিন যাপন করছে; লোকসানের আশঙ্কা নিয়েও অনেক রকম বিপদ ঘাড়ে নিয়ে ব্যবসা করার ফলে ইংল্যাণ্ডের সম্পদ বাড়ছে ও শিল্পের উন্নতি হচ্ছে; যে টাকা তারা কৃষককে আগাম দিচ্ছে তার বদলে কৃষকরা চাষ করে যে নীল তাদের হাতে তুলে দেবে তার কোনোই নিশ্চয়তা নেই ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকারকে নূতন নূতন আইন প্রণয়ন করতে হবে।

তাদের দাবির ফলে এই রকম একটি আইন শীঘ্রই পাশ হল। সেটি হচ্ছে ১৮৩০ সালের কুখ্যাত পঞ্চম আইন (Regulation V of 1830)। এই আইনে ঘোষণা করা হল যে দাদন-গ্রহণকারী কৃষকদের পক্ষে নীলচাষ না করাটা হবে আইনবিরুদ্ধ; এই অপরাধের জন্য তাদের বিরুদ্ধে নীলকরেরা ফৌজদারিতে অভিযোগ আনতে পারে; অভিযোগ প্রমাণিত হলে কৃষকদের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। ভারতে ইংরেজ যে সমস্ত 'বেআইনী' আইন প্রণয়ন করেছিল, এই আইনটি তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। উপরিউক্ত রিপোর্টে লেফটেনাণ্ট গভর্নর গ্র্যাণ্টকেও স্বীকার করতে হয়েছিল যে, যে-সব কাগজ পত্র ও রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে এই আইন রচিত হয়েছিল, সেইসব কাগজপত্রে এমন কিছু ছিল না যার দ্বারা এই রকম একটা আইন সমর্থন করা যায়। [১৯]

এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে ১৮৩০-এর আইনটি পাশ হবার পর থেকে নীলকরদের কৃষকের উপর অত্যাচার বহু গুণ বেড়ে যায়। এই সব 'অত্যাচার' বর্ণনা করে জনৈক মফস্বলবাসী তখনকার 'বঙ্গদূত' পত্রিকায় একখানি চিঠি লেখেন। এই চিঠিতে বলা হয় যে নীলকরদের অসংখ্য উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা দরিদ্র প্রজাদের নেই। যারা প্রতিবাদ করতে যায়, প্রথমত তাদের জীবন বিপন্ন হয়, দ্বিতীয়ত প্রতিবাদ করতে হলে যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, তা দরিদ্র কৃষকদের নেই। পত্রলেখক এই চিঠিতে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে,

নীলকররা যে আমাদের দেশের জমিতে শিকড় গেড়ে বসতে সক্ষম হয়েছিল তার কারণ এই যে ছোট ছোট জমিদাররা লোভের বশবর্তী হয়ে নীলকরদের সাহায্য করত ও তাদের অধীনে কাজ করত। [২০]

১৮৩০-এর পঞ্চম আইন পাশ হবার দুবছর পর নীলকরদের সম্পর্কে বিলাতের ডিরেক্টরদের সঙ্গে কোম্পানি-সরকারের অনেক চিঠিপত্রের বিনিময় হয়। এই সব চিঠিপত্র, রিপোর্ট ইত্যাদি আলোচনা করে ডিরেক্টররা গভর্নর জেনারেলকে ১০ই এপ্রিল ১৮৩২-এ তাঁদের মতামত ব্যক্ত করে একটি দীর্ঘ চিঠি লেখেন। [২১] এই চিঠিতে তাঁরা বলেন যে "রায়তদের উপর যে অত্যাচার ও লুণ্ঠন চালান হচ্ছে সে সম্বন্ধে অজস্র প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এইসব দুষ্কর্ম যদিও বা নীলকররা নাও করে থাকে, তাদের কর্মচারীরা তাদেরই নামে ও তাদেরই লাভের জন্য তা করছে। চারিদিকে প্রচুর দাঙ্গাহাঙ্গামা হচ্ছে যার ফলে অনেক লোক আহত তো হচ্ছেই, এমনকি নিহতও হচ্ছে। দেশের আইন-কানুন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কেবলমাত্র নিজেদের স্বার্থ জোর করে আদায় করে নেবার জন্য নীলকররা ভাড়াটিয়া সশস্ত্র লোক নিয়োগ করে এই সব দুষ্কর্ম করাচ্ছে।" দেশীয় গোমস্তা ও অন্যান্য কর্মচারীরা যে অত্যন্ত শঠ ও দুর্নীতিপরায়ণ তা নীলকররা নিজেরাই স্বীকার করে এবং আরও বলে যে তারা কেবলমাত্র রায়তদেরই নয়, নীলকরদেরও ঠকায় ও তাদের রক্ত চুষে খায়। নীলকররা যে দাবি জানিয়েছিল যে দাদন নিয়ে নীল না চাষ করলে চাষীদের ফৌজদারী আইন অনুসারে জেলে দিতে হবে, সে দাবি পূরণ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও নীলকরদের অত্যাচার কমছে না; "এই বৎসর (১৮৩২ সালে) মে মাসে একমাত্র যশোহর জেলাতেই ১৬২ জন চাষী নীলের ব্যাপারে জেলে রয়েছে।"

রায়তদের অভিযোগ সম্বন্ধে ডিরেক্টররা বলেন যে, যে সব রায়ত ইচ্ছায়ই হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক একবার নীলের দাদন নিয়েছে, তারা সারা জীবন ধরে নীল চাষ থেকে আর মুক্তি পায় না; যদি কোনো রায়তের নীলকরের দেনা পরিশোধ করে দেওয়ার ক্ষমতাও থাকে ও নীল চাষ হতে মুক্ত হতে চায় তাহলেও বর্তমানে এমন কোনো আইনসঙ্গত উপায় নেই যার বলে সে নীলকরের সঙ্গে হিসাবনিকাশ চুকিয়ে ফেলতে পারে ও নীলের নাগপাশ থেকে রেহাই পেতে পারে। নীলকর এই টাকা কিছুতেই গ্রহণ করে না, তার ফলে রায়তকে চিরকাল ধরে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও নীলচাষ করে যেতেই হয়।

এই চিঠিতে ডিরেক্টররা নদীয়া জিলার তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট টার্নবুলের অভিমতও লিপিবদ্ধ করেছেন। নদীয়ার জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে টার্নবুলের নীলচাষ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁর রিপোর্টে টার্নবুল নিরপেক্ষ-ভাবে ও সততার সঙ্গে নীলকরদের অত্যাচার ও নীলচাষীদের দুরবস্থার কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তিনি তাতে দেখিয়েছেন কিভাবে ছলে-বলে-কৌশলে নীলকরেরা অশিক্ষিত চাষীদের চুক্তিবদ্ধ করে থাকে, কিভাবে দেওয়ান, নায়েব, গোমস্তারা এই লুণ্ঠন-যজ্ঞে নিজেদের ভাগ বসায়, কিভাবে ভাড়াটিয়া লাঠিয়াল নিযুক্ত করে কৃষকদের উপরে দিনের পর দিন হামলা চালায় ও তাদের ক্রীতদাস করে রাখবার চেষ্টা করে ইত্যাদি। [২২]

আর একজন ম্যাজিস্ট্রেট, ওয়াল্টার্স-এর মতও ডিরেক্টররা উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। ওয়াল্টার্স বলেছেন: "ভারতের এই অংশে এমন কোনো দৃষ্টান্ত মেলে কি যেখানে কোনো দেশীয় জমিদার ইউরোপীয় নীলকরের বিনা সাহায্যে নীল কারখানা স্থাপন করতে পেরেছেন ও নীল ব্যবসা চালাতে সক্ষম হয়েছেন? কিংবা শেষ পর্যন্ত নিঃস্ব হয়ে যান নি অথবা তাঁর একটা বড অংশ তাঁর শক্তিশালী ইউরোপীয় প্রতিবেশীকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন নি? অথবা নিজের অধিকার বজায় রাখতে গিয়ে কারারুদ্ধ হন নি?" ওয়াল্টার্স আরও বলেন যে নীলকররা যেসব সশস্ত্র লোক নিয়োগ করে, তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই "দাগী দুর্বৃত্ত, ফেরার আসামী অথবা সদ্য কারামুক্ত অপরাধী। এই ধরনের লোকগুলি নীল কারখানায় নিরাপদ আশ্রয় লাভ করে, সেখান থেকে রাত্রির অন্ধকারে তারা বেরিয়ে এসে সব রকমের জঘন্য কাজ করে, যেমন চুরি, ডাকাতি, এমনকি খুন পর্যন্ত। অনেক ক্ষেত্রে পুলিশরা পর্যন্ত নীল কারখানার ভিতরে প্রবেশ করতে সাহস করে না।"

তাঁর রিপোর্টে ওয়াল্টার্স আরও বলেছেন যে একটি নীল কারখানায় এই ধরনের ২৪০ জন লোককে আমিন, খালাসী—এইসব বিভিন্ন নামে নিয়োজিত হতে দেখেছেন। এমনকি ম্যাজিস্ট্রেটরা পর্যন্ত অনেক নীলকরদের ঘাঁটাতে সাধারণত সাহস করেন না। [২৩]

১৮২৩ সালের ষষ্ঠ আইন ও ১৮৩০ সালের পঞ্চম আইনের দ্বারা নীলকররা এমন ক্ষমতালাভ করল যে তাদের অমানুষিক অত্যাচার ও শোষণের মাত্রা একেবারে চরমে উঠে গেল। তার ফলে কোম্পানির দৈনন্দিন শাসনকার্য পর্যন্ত নীল-জেলাগুলিতে ব্যাহত হতে লাগল, উপরন্তু কোম্পানির মালিকদের প্রচুর

আর্থিক ক্ষতিও হতে লাগল। এই সব কারণে ১৮৩৩ সালে, নতুন সনদ প্রণয়নের সময়, ইংল্যাণ্ডে নীল প্রশ্নের উপরে, বিশেষ করে নীল চুক্তির বিষয় নিয়ে, তুমুল তর্কবিতর্ক শুরু হল। অনেকে দাবি করেছিলেন যে সমস্যাটা এতই গুরুতর যে একটা কমিশন বসিয়ে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটিকে ইণ্ডিয়ান ল-কমিশনের হাতে তুলে দেওয়া হল।

নীল চুক্তির আইনের (Law of Contract) উপরই প্রশ্নটা কেন্দ্রীভূত হল। সর্বদেশেই চুক্তি আইনের প্রথম কথাই হল যে আইনসঙ্গত চুক্তি হতে পারে কেবলমাত্র দুইটি সমান, স্বতঃপ্রবৃত্ত ও স্বাধীন পক্ষের মধ্যে। তা না হলে কোনো চুক্তি-পত্র আইনসঙ্গত হতে পারে না। সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে নীলচাষীরা স্বাধীন (Free Agents) নয়—ভয় দেখিয়ে, জোর করে, ছলচাতুরীর দ্বারা তাদের দিয়ে চুক্তি-পত্র সই করিয়ে নেওয়া হয়। সে চুক্তি-পত্র তারা পড়তেও পারে না, তার অর্থও বোঝে না।

১৮৩৫ সালে জুলাই মাসে "কলকাতার ব্যবসাদাররা," অর্থাৎ নীলকররা, গভর্নর-জেনারেলকে একটা স্মারকলিপি পাঠালেন। তাতে যে ২০০ জনের স্বাক্ষর ছিল, তাদের মধ্যে দু-একজন ভারতীয়ও ছিলেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁদের মধ্যে অগ্রণী। তাঁরা বললেন যে তিন কোটি টাকা তাঁরা নীল ব্যবসায় খাটাচ্ছেন, এটা হল তাঁদের বাৎসরিক খরচখরচা বাদে; নীলচাষীরা ঠক, শঠ, আলসে, মিথ্যাবাদী ইত্যাদি, আদালত, পুলিশও খারাপ ইত্যাদি। সুতরাং এই ব্যবসায়ের নিরাপত্তা তাঁরা সরকারের নিকট দাবি করলেন। [২৪]

এই বিষয়ের উপর লর্ড মেকলে ১৮৩৫ সালে ১৭ই অক্টোবরে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য-লিপি পেশ করেন। তাতে তিনি বললেন যে এই নীল-চুক্তিগুলি "নীতিগতভাবে অত্যন্ত আপত্তিকর"; তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে নীলচাষীদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হচ্ছে, কৃষকদের পক্ষে নীলচাষ অত্যধিক অমঙ্গলজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং একদিকে নীল চুক্তির ফলে ও অন্য দিকে নীলকরদের বেআইনী ও হিংসাত্মক কাজের ফলে কৃষক "প্রায় ভূমিদাসে পরিণত হয়েছে।" তিনি আরও বললেন যে ছল-চাতুরির দ্বারা অথবা লাঠির ভয় দেখিয়ে কৃষকদের চুক্তিপত্রে সই করিয়ে নেওয়া হয়; এইসব ক্ষেত্রে চুক্তি-পত্রগুলি বাতিল করে দেওয়া উচিত এবং অত্যাচারী ও অসৎ নীলকরদের কঠোর শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। [২৫]

মেকলে প্রভৃতি উদারনৈতিক শাসনকর্তারা নীলকরদের অত্যাচারের নিন্দা করলেন, কৃষকদের লাঞ্ছনায় দরদ দেখালেন, অনেক ভাল ভাল কথা বললেন, অনেক সদুপদেশ দিলেন, কিন্তু নীলচাষীদের অবস্থা যা ছিল তাই রয়ে গেল। সমস্যাগুলি বিচার করে মেকলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে নীলচাষের ব্যাপারে কোনোরকম বিশেষ আইনের প্রয়োজন নেই। "ভারতীয় বিচারপদ্ধতি খারাপ। ভারতের পুলিশ খারাপ। ...আমার কোনো সন্দেহ নেই যে সরকার এইসব গলদ দূর করার জন্য অনেক কিছু করতে পারেন। যখন ভাল আইন, আর ভাল পুলিশের ব্যবস্থা করা হবে, যখন অল্প ব্যয়ে ও ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচারের ব্যবস্থা হবে,... তখন ভালর দিকে একটা বড় রকমের পরিবর্তনের আশা করা যেতে পারে।" তার পরেই আবার বললেন যে এরকম একটা ভাল অবস্থায় আসতে কয়েক পুরুষের চেষ্টার প্রয়োজন হবে—"it must be the work of several generations।" মেকলে ভাল বিচারপদ্ধতির দাবি করলেন, কিন্তু আবার সঙ্গে সঙ্গেই বললেন মফঃস্বলের আদালতগুলিকে ইউরোপীয়দের বিচার করবার ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে না, কারণ তা করলে নীলকরদের অবস্থা বিপন্ন হয়ে পড়বে। এই হল বহু-প্রশংসিত ও বহু-বিঘোষিত ব্রিটিশ উদার-নীতিবাদের একটি জাজ্বল্যমান উদাহরণ।

এত আলোচনা ও লেখালেখির ফলে ১৮৩৫ সালে ১৮৩০-এর বেআইনী-আইন বাতিল হয়ে গেল বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে ১৮৩৩ সালে আবার নীলকরদের বাংলা দেশে জমিদার হয়ে বসবাস করবার অধিকার দেওয়া হল, যার ফলে তাদের অত্যাচার ও শোষণের ক্ষমতা আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেল। পরবর্তী ২৫ বৎসর ধরে পূর্বেরই মত বলপূর্বক নীলকরেরা চাষীদের দিয়ে নীল-চুক্তি সই করিয়ে নিতে লাগল। ১৮৩৫ সালের পূর্বে নীলচাষীরা যে ক্রীতদাস ছিল ১৮৬০ সাল পর্যন্ত সেই ক্রীতদাসই রয়ে গেল।

১৮৫৮ সালে ২৪শে জুলাই, ইণ্ডিয়ান ফিল্ড পত্রিকা লিখল, "এই চুক্তিগুলি কি রকম? বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চুক্তিগুলি লিখিত নয়। চুক্তির সময় নীলকরদের পক্ষ ছাড়া আর কেউ উপস্থিত থাকে না, এই চুক্তির ফলে চাষী বংশ পরম্পরায় ক্রীতদাসই থেকে যায়। বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট এস্‌লি ইডেন ১৮৬০ সালে নীল-কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দান কালে বলেছিলেন যে তাঁর মতে কোনো নীল-চুক্তিই আইনসঙ্গত চুক্তি নয় এবং কোনো ক্ষেত্রেই

চাষীরা নিজের ইচ্ছায় নীলচাষ করে না, নীলচাষ করতে তাদের বাধ্য করা হয়।"

১৮২৯-৩৩ এই সময়টা ছিল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক—সব দিক থেকেই বাংলা দেশের পক্ষে একটা মস্তবড় সন্ধিক্ষণ। বাংলার আশু ভবিষ্যতের এই সময়েই গোড়াপত্তন হয়েছিল। বাঙালীর নিকট এই যুগটা ছিল রামমোহনের যুগ, 'ইয়ং বেঙ্গল' এর যুগ, নব্য বাংলার অরুণোদয়ের যুগ।

নীলচাষ ও রামমোহন-দ্বারকানাথ

পূর্বের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির নতুন সনদে ইংরেজদের এদেশে জমির মালিক হয়ে বসবাস করবার ও স্বাধীনভাবে ব্যবসা করবার অধিকার দেওয়া হয়। এই অধিকার লাভ করবার জন্য অবশ্য তারা বিগত ৫।৭ বৎসর ধরে তুমুল আন্দোলন চালিয়ে আসছিল। প্রচুর লেখালেখি, আলোচনা, আবেদন-নিবেদন, সভাসমিতি এর জন্য হয়েছিল। এই আন্দোলনকে ইংরেজিতে 'কলোনাইজেশন' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। তদানীন্তন নেতৃস্থানীয় বাঙালীদেরও এই আন্দোলনে অংশ-গ্রহণ করতে হয়েছিল—তা এর সপক্ষেই হোক আর বিপক্ষেই হোক।

সাধারণত বাঙালী গ্রামবাসীরা ও একশ্রেণীর জমিদাররা কলোনাইজেশনের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন এবং তখনকার দিনে যে দু-একটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হত, তার মারফত তাঁরা পাল্টা আন্দোলন চালিয়েছিলেন। অন্যদিকে রামমোহন, দ্বারকানাথ, প্রসন্নকুমার প্রমুখ জমিদার ও ব্যবসায়ীরা এই ব্যাপারে ইংরেজদের সহায়ক হয়েছিলেন। 'সংবাদ-কৌমুদী' লিখল যে, ইতিমধ্যেই নীলকররা ধানের জমি দখল করে সেখানে নীলচাষ করছে এবং তার ফলে দেশে চালের উৎপাদন কমে যাচ্ছে, জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে ও তার সঙ্গে সঙ্গে লোকের দুঃখকষ্টও বেড়ে যাচ্ছে। তার উত্তরে দ্বারকানাথ ১৮২৮এর ২৬শে ফেব্রুয়ারী 'সংবাদ-কৌমুদীতে' এক চিঠি লিখলেন, জনৈক জমিদার নাম দিয়ে। এই চিঠিতে 'কলোনাইজেশনের' পক্ষে দ্বারকানাথের সব যুক্তি-গুলিই পাওয়া যায়। তাঁর মোটামুটি বক্তব্য ছিল এই যে, পূর্বে যেখানে চাষীদের জমিদারের জন্য বেগার খাটতে হত, এখন সেখানে নীলকরদের কাছ থেকে ভাল টাকা পাওয়া যাচ্ছে, মাসে ৪ টাকা করে—যার ফলে তারা সুখে আছে ও স্বাধীনভাবে দিন কাটাচ্ছে; অনেক জমি—যা পূর্বে অনাবাদী ছিল—এখন নীলকরদের দৌলতে তা আবাদী হয়েছে; মধ্যশ্রেণীর লোকেরা—যাদের আগে দুঃখ-কষ্টের অভাব ছিল না—তারা আজ নীলকরদের কাছে ভাল মাইনেতে কাজ করছে, তাদের এখন আর জমিদার ও মহাজনদের মর্জির উপর নির্ভর করতে হয় না; নীলচাষ বেড়ে গেলে নিম্ন ও মধ্যশ্রেণীর লোকেদের অবস্থা আরও উন্নত হবে। [২৬]

বাস্তবিক পক্ষে দ্বারকানাথের ১৮২৮ ও ১৮২৯ সালের চিঠিগুলি পড়লে মনে হয় যে, ইংরেজদের এদেশে বসবাসের সপক্ষে তিনি যেন একটা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। একজন ভারতীয় জমিদার 'জন বুল' পত্রিকায় এদেশে ইংরেজদের বসবাসে বিরোধিতা করে ও তার কুফল দেখিয়ে যে চিঠি লেখেন, দ্বারকানাথ তার একটা কড়া জবাব দেন ১৮২৯ সালের ১৭ই মার্চের 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকায়। তাতে তিনি বলেছিলেন যে বিদেশীদের তিনি এদেশে ডেকে আনেন নি; বরং তারাই প্রথমে এদেশে এসেছে, ক্রমশঃ এদেশ জয় করে এক বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে ও তাদের দেশবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য সৎ কাজে নিয়োজিত হতে বলেছে। দ্বারকানাথ জিজ্ঞেস করেন—এই সব বিদেশীরা কি আমাদের এত ক্ষতি করেছে যে তাদের শত্রু বলে গণ্য করতে হবে, না, তারা আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করেছে, ভারতীয়দের উপকার করেছে ও তাদের অবস্থার উন্নতির হেতু হয়েছে? তারপর তিনি কলকাতার দিকে দেখিয়ে বলছেন, "এখানে আমরা দেখতে পাই যে বিদেশীরাই বিশেষ করে স্কুল স্থাপন করেছে দেশের বালকদের বাংলায় ও ইংরেজীতে শিক্ষা দেবার জন্য। তাঁরা শুধু এর জন্য টাকাই দেন না, তাঁদের অনেকে শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেক সময় দিয়ে বিনা বেতনে পরিশ্রমও করেন। এখানে আমরা ধনী ও প্রভাবশালী পরিবারের শতশত ছেলেদের দেখতে পাই, তারা সুশিক্ষিত ও অনেক পরিমাণে কুসংস্কার থেকে মুক্ত।…কলকাতায় আমরা আরও দেখতে পাই যে, এইসব বিদেশীদের পৃষ্ঠপোষকতায় হাজার হাজার মধ্যশ্রেণীর লোক স্বাধীনচেতা হয়েছে।…এইসব বিদেশীরা তাদের রক্ষাধীনে যারা আছে অথবা 'রায়তদের' পদদলিত করার কথা চিন্তা করতেও ঘৃণা বোধ করেন।"

এই চিঠিতে দ্বারকানাথ অবশেষে এই বলে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে "যে কোনো ব্যক্তি—যাঁর সাধারণ বুদ্ধি ও সত্তা আছে—তিনি কলকাতার অধিবাসী-দের সঙ্গে ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিশে দেখুন ও তাদের পরস্পরের মানসিক, সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থার তুলনা করে দেখুন এবং তারপর প্রকাশ্যে বলুন, আমার এই কথাটা বলা যুক্তিসঙ্গত কিনা যে, এদেশে ইউরোপীয়দের অবাধ বসবাসের যিনিই বিরোধিতা করতে প্রবৃত্ত হন না কেন—অবশ্য এই শর্তে যে বিচার ব্যবস্থায় এই একই সময়ে কতকগুলি পরিবর্তন আনতে হবে—তিনি হচ্ছেন ভারতীয়দের ও তাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়দের শত্রু।"

১৮২৯ সালে মে মাসে বাংলার ইংরেজ বণিকরা 'কলোনাইজেশনের' দাবি করে কলকাতায় যে সভা করেছিল তা আমরা জানতে পারি ৩০শে মে তারিখের 'বঙ্গদূতে' প্রকাশিত নিম্নলিখিত সংবাদটি থেকে :

"মহা মহিম শ্রীযুক্ত ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইজারা বিষয়ক :—প্রায় সকলেই অবগত আছেন যে ইং ১৮১৪ সালে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরেরা ২০ বৎসরের নিমিত্তে এই বাঙ্গালাদেশ শ্রীল শ্রীযুক্ত ইংলণ্ডপতির নিকট হইতে ইজারা লইয়াছেন সেই ইজারার মিয়াদের শেষ প্রায় নিকটবর্ত্তী হইল। ইহাতে লিবরপুল দেশস্থ প্রধান মহাজনেরা ঐ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির দিগের পুনশ্চ নূতন ইজারা লণ্ডনেতে প্রতিবন্ধক হইবার উদযোগ পাইতেছেন। ইহারা এ-নিমিত্তে গত জুন মাসের ২৬ তারিখে এক সভা করিয়াছিলেন ইহাতে এই প্রস্তাব হইল যে চীনদেশে ফ্রি-ট্রেডের (Free trade) অর্থাৎ প্রতিবন্ধক বিহীন তেজারতি ও বিলাতে বঙ্গদেশের সহিত কারবার বিষয়ে যে নিয়মিত বাধা আছে তাহা মোচন হইলে ঐ রাজধানীর এবং ইংরাজ অধিকারস্থ বঙ্গদেশ সকলের বিস্তর লভ্যজনক হয় এবং আরো প্রস্তাব হইল যে পূর্ব্ব হইতে ফ্রি-ট্রেডর হইয়া এতদ্দেশে দ্রব্যাদি সমাগমের বৃদ্ধি হইয়াছে অধিকন্তু ঐ প্রতিবন্ধক মোচন হইলে ব্যবসায় আরো বৃদ্ধি হইতে পারে তাহার প্রমাণ দর্শাইলেন। তদন্তর বঙ্গদেশে নীলকর সাহেবেরা নীলের চাষ করিয়া প্রতিবৎসর প্রায় দেড় কোটি টাকার নীল উৎপন্ন করিতেছেন ইহাতে বঙ্গদেশের ভূমি কি পর্য্যন্ত উর্ব্বরা তাহা এই প্রমাণেই সাব্যস্ত করিলেন।" [২৭]

১৮২৯ সালে ২০শে নভেম্বরে ইংরেজ ও ভারতীয় ব্যবসায়ী ও গণ্য-মান্য ব্যক্তিরা এবার একসঙ্গে মিলে টাউন হলে আবার একটা সভা করার জন্য কলকাতার শেরিফের নিকট অনুমতি চেয়ে এক দরখাস্ত করলেন। উক্ত সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁরা বললেন যে, ইংল্যাণ্ডে নতুন সনদ প্রণয়নের সময় যাতে ভারতের ও চীনের বাণিজ্যে সমস্ত বাধানিষেধগুলি তুলে দিয়ে সকলকে সমান সুযোগ দেওয়া হয় এবং ভারতের বাণিজ্যে ও কৃষিকার্যে ব্রিটিশ মূলধন ও দক্ষতা বিনা বাধায় নিয়োগ করার পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয় তার জন্য তাঁরা ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দরখাস্ত পেশ করতে চান। ইংরেজদের সঙ্গে যে সব বাঙালী এই দরখাস্তে সই দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাধামাধব ব্যানার্জী, রঘুরাম গোস্বামী, প্রমথনাথ রায়, রামরতন বোস, রামচাঁদ বোস, দ্বারকানাথ

ঠাকুর, রামমোহন রায়, আশুতোষ দে, রাধাকৃষ্ণ মিত্র, কৃষ্ণমোহন বড়াল, কালীনাথ রায়, রমানাথ ঠাকুর।

এই বিখ্যাত সভা ১৫ই ডিসেম্বর, ১৮২৯-এ টাউনহলে অনুষ্ঠিত হয় ও সেখানে রামমোহন ও দ্বারকানাথ 'ফ্রি-ট্রেড' ও 'কলোনাইজেশন'-এর প্রস্তাব সমর্থন করলেন। তাঁরা বললেন যে, ভারতে আসবার পর থেকে ইংরেজ এখানে যে সব শিল্প-বাণিজ্য প্রবর্তন করেছে তার ফলে দেশের লোকের উপকারই হয়েছে। তাঁরা আরো বললেন যে নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁদের এ বিশ্বাস হয়েছে যে বাণিজ্যের বাধানিষেধগুলি উঠে গেলে এবং ইংরেজদের এদেশে মূলধন খাটাবার ও স্থায়ী বাসিন্দা হবার সুযোগ দিলে ভারতের উন্নতি হবে, দেশবাসীর শ্রীবৃদ্ধি হবে; তারা সাহিত্যে, ধর্মে, রাজনীতিতে অগ্রসর হবে। নীলচাষ সম্বন্ধে তাঁরা বললেন যে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা জানেন যে নীলচাষহীন অঞ্চলের কৃষকদের তুলনায় নীলচাষ অঞ্চলের চাষীদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল; কোনো কোনো ক্ষেত্রে নীলচাষীরা কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হলেও মোটের উপর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নীলচাষের দ্বারা কৃষকরা ও জনসাধারণ উপকৃত হয়েছে। [২৮] (রামমোহন ও দ্বারকানাথের মূল বক্তৃতার জন্য পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

রামমোহন রায়ের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন (পৃঃ ৪২০) যে, সকল শ্রেণীর ইউরোপীয়দের সহবাসে কল্যাণ হয় না; যাঁরা সুশিক্ষিত, ভদ্র, ধর্মানুরাগী রামমোহন শুধু তাঁদের কথাই ভেবেছিলেন। "রাম-মোহন রায়ের সময়ে কলিকাতায় কয়েকজন উচ্চ প্রকৃতির ইউরোপীয় বাস করিতেন। রাজা তাঁহাদের সংসর্গে বিশেষ তৃপ্তি ও উপকার লাভ করিয়াছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় ডেভিড হেয়ার তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন।" অনেকে আবার বলেন যে রামমোহন প্রশ্নটাকে আর একভাবে বিচার করেছিলেন। রামমোহন হিসাব করে দেখেছিলেন যে ইংরেজরা ১৭৬৫ থেকে ১৮২৬ সাল পর্যন্ত মোট ১০০ কোটি টাকা কর ও রাজস্ব হিসাবে দেশ থেকে বার করে নিয়ে গিয়েছে; তাই তিনি ভেবেছিলেন যে ভারতের মধ্যেই বিভিন্ন শিল্পে ও কৃষিকার্যে মূলধন হিসাবে এই টাকাগুলি যদি খাটান হয় তাহলে ভারতবর্ষ ইংরেজের উন্নততর বিজ্ঞান ও টেকনিক থেকে অনেক কিছু শিখে লাভবান হতে পারবে।

টাউনহলে মিটিং হবার পর 'কলোনাইজেশন' ও 'ফ্রি-ট্রেডের' পক্ষে যে দরখাস্ত করা হল সেই দরখাস্ত গর্ভনর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক নিজের সমর্থন-সহ

বিলাতে কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। এর প্রতিবাদে বাংলার একদল জমিদারও একটা পাল্টা আবেদনপত্র পাঠালেন। এতে তাঁরা বললেন যে, যে সব স্থানে নীলচাষের প্রবর্তন হয়েছে, সেখানে কৃষকদের উপর অত্যাচার ও তাদের দুঃখদৈন্য অনেক বেড়ে গিয়েছে ও ধানের চাষ অনেক কমে গিয়েছে। তাঁরা আর একটা যুক্তি দিলেন যে উচ্চ বর্ণের দেশীয়দের বড় বড় চাকুরির স্থযোগ-স্থবিধা না থাকাতে তাদের একমাত্র জমির উপরই নির্ভর করতে হয়। এই জমি বিদেশীদের হাতে চলে গেলে তাদের দুঃখকষ্টের আর সীমা থাকবে না। [২৯]

১৮৩১ সালে জুন মাসে কলোনাইজেশন ও নীলকরদের সমর্থন করে বঙ্গদূত আবার লিখল :

—"কস্যশ্চিৎ প্রজারা ইত্যঙ্কিত পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়া অদ্যকার দূতপত্রে প্রকাশ করিলাম। কিন্তু পত্র প্রেরক ক্লোনিজেসিয়ন বিষয়োপলক্ষ করিয়া বর্তমানে নীলকর সাহেবের দিগের প্রতি যে যে দোষোল্লেখ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে অস্মদাদির কিঞ্চিদ্বক্তব্যের আবশ্যক হইল কেননা এরূপ মিথ্যা দোষ যাবৎ নীলকর সাহেবদিগের প্রতি দেওয়া অনুচিত বরং এ-স্থলে লেখকের অতি কর্ত্তব্য ব্যক্তি প্রভেদ করিয়া দোষগুণ লিখিতে হয় তাহা না করিয়া সাধারণের প্রতি এক বাক্য দ্বারা অন্যায় করা যুক্তি-বিরুদ্ধ কিন্তু, মফঃস্বলে সাহেবলোকের দিগের নীলের কুঠি হওনে বিস্তর উপকার হইয়াছে অর্থাৎ যে সকল ভূমি কস্মিনকালে আবাদ হইত না এইক্ষণে সেই সকল ভূমির কর অনেক উৎপন্ন হইবায় তালুকদার দিগের পক্ষে কত ভাল হইয়াছে তাহা লিপিবাহুল্য এবং বিশিষ্ট শিষ্ট ব্যক্তিরা যাঁহারা অন্যান্য বিষয় কর্ম্ম করিতে অক্ষম তাঁহারা কুঠীতে চাকরী করিয়া প্রায় অনেকেই ভাগ্যবন্ত হইয়াছেন, পরন্তু প্রজাগণের পক্ষেও মঙ্গল হইয়াছে যেহেতুক মুদ্রাউপার্জনে যাহারা অক্ষম ছিল, তাহারা নীলোপলক্ষে বিলক্ষণ যোত্র করিয়াছে এবং মজুর লোকদিগের এমত উপকার দর্শিয়াছে যে পূর্বে যাহারা সমস্ত দিন শ্রম করিয়া তিন পন কড়ি উপার্জন করিতে পারে নাই, তাহারা এইক্ষণে আড়াই আনা তিন আনা পর্য্যন্ত আহরণ করিতেছে। অতএব কহি, ইংরেজ লোক এ প্রদেশে বাহুল্যরূপে কৃষিকর্ম করিলে উত্তরোত্তর প্রজাদিগের আরো উন্নতি হইবার সম্ভাবনা।"

রামমোহন বিলাত যাবার পর কমন্স সভার সিলেক্ট কমিটির নিকট ইউরোপীয়দের ভারতে বসবাস করার প্রশ্নের উপর একটি স্মারকলিপি পেশ

করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন যে, ইউরোপীয়রা দেশে জমিজমা নিয়ে বাস করলে ৯ রকমের উপকার আর ৫ রকমের অপকার হতে পারে। উপকারগুলি হল: ১। ইউরোপীয়দের জ্ঞানবিজ্ঞান, মূলধন দেশের কৃষিকার্যে নিয়োজিত হবে, যেমন নীলচাষে হয়েছে; তাতে ভারতীয়দের উপকার হবে; ২। ইউরোপীয়দের সঙ্গে মেলামেশার ফলে ভারতীয়দের মন কুসংস্কার-মুক্ত হবে; ৩। যেহেতু ইউরোপীয় বাসিন্দারা শাসকদের সমকক্ষ ও জন-সাধারণের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন, তারা সরকারের নিকট থেকে অথবা পার্লামেন্টের কাছ থেকে ভাল জনহিতকর আইন পাশ করিয়ে নিতে পারবে, বিচার বিভাগেরও যথেষ্ট উন্নতি হবে; ৪। ইউরোপীয়দের উপস্থিতি ও সাহায্য জমিদার, মহাজন ও কর্তৃপক্ষের উৎপীড়ন থেকে প্রজাদের রক্ষা করবে; ৫। ইউরোপীয় অধিবাসীরা তাদের বদান্যতা, রাষ্ট্রীয় চেতনা ও দেশীয় প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্যবোধের দরুন স্কুল-কলেজ স্থাপন করবে ও তার ফলে দেশে জ্ঞানবিজ্ঞান বিস্তার লাভ করবে; ৬। এদেশে ইউরোপীয় অধিবাসীদের সঙ্গে ইউরোপের লোকদের আদান-প্রদানের ফলে, কর্তৃপক্ষ এদেশের অবস্থা সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানতে পারবেন ও সেই কারণে ভারতের আইন প্রণয়নে এখন থেকে আরও বেশি উপযুক্ত হবেন; ৭। পূর্বদিক থেকেই হোক আর পশ্চিমদিক থেকেই হোক, ভারতবর্ষ আক্রান্ত হলে, দেশীয় লোক ছাড়াও অধিক সংখ্যক ইউরোপীয়দের সাহায্য ভারত সরকার পাবে; ৮। পূর্বোক্ত কারণ বশতঃ ইংল্যাণ্ড ও ভারতের মধ্যে সম্বন্ধ দৃঢ় ও চিরস্থায়ী হতে পারে—যদি ভারতবর্ষ পার্লামেণ্টারী ও অন্যান্য উদারনৈতিক পন্থায় শাসিত হয়; ৯। আর যদি ঘটনাচক্রে এ দুটো দেশ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও যায়, তাহলেও এই সম্মানীয় অধিবাসীরা ভারতবর্ষকে ইউরোপের সমপর্যায়ে নিয়ে আসতে পারবে এবং কালক্রমে ইউরোপের সাহায্যে অন্যান্য এশিয়ার দেশগুলিকেও শিক্ষিত ও সুসভ্য করে তুলতে পারবে।

রামমোহনের এই কাল্পনিক উপকারগুলির কথা চিন্তা করলে মনে হয়, যে রামমোহন হয়তো ভুলে গিয়েছিলেন যে ইংরেজ মাত্রই এক একজন ডেভিড হেয়ার নন!

রামমোহনের মতে ভারতে ব্রিটিশ বসবাসের অপকারগুলি হল—১। "ইউরোপীয়রা ভিন্নজাতির লোক ও শাসকগোষ্ঠীর স্বগোত্রীয়। ভারতীয়দের উপর আধিপত্য বিস্তার করবার জন্যই তারা ব্যগ্র হয়ে উঠবে। স্বভাবতই

দেশের লোকদের—যারা শাসকশ্রেণীর নিকট সমাদৃত নয়—দাবিয়ে দিয়ে স্বতন্ত্র অধিকার ও সুবিধা ভোগ করবার চেষ্টা করবে। তারা ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী, সুতরাং তারা ভারতীয়দের ধর্মে আঘাত দিতে কোনোই কুণ্ঠাবোধ করবে না ; তাদের হাতে স্বতন্ত্র জাতি, বর্ণ, ধর্মের লোক—ভারতবাসীর লাঞ্ছনা ও অপমানের অবধি থাকে না" ; ২। ইউরোপীয়দের তাদের স্বদেশীয় শাসকশ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ থাকায় ভারতীয়দের বিরুদ্ধে তার সুযোগ নেবার সম্ভাবনা থাকবে ; ৩। সকল শ্রেণীর ও সব রকমের ইউরোপীয়দের অবাধে আসতে দিলে, পরস্পরের স্বার্থের অনবরত সংঘাতের ফলে দেশী ও বিদেশী জাতির মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যেতে পারে, যে-সংঘর্ষ একটা জাতি আর একটা জাতিকে দাবিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত থামবে না ; ৪। ইউরোপীয়রা আর ভারতীয়রা একত্রিত হযে আমেরিকার মতো বিদ্রোহ করতে পারে, কিন্তু ভাল গভর্নমেণ্ট হলে তা নাও হতে পারে, যেমন কানাডায় হয়েছে ; ৫। এদেশের বিরূপ আবহাওয়ার জন্য ইউরোপীয়ানরা তাদের ধনসম্পদ নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারে।

রামমোহন ইউরোপীয়দের এদেশে বসবাসের ভাল ফল ও খারাপ ফল—উভয় দিক বিবেচনা করে সর্বশেষে তাদের বসবাসের পক্ষেই মত দিলেন। তবে তিনি একথাও বললেন যে প্রথমদিকে এইরকম বসবাস পরীক্ষামূলক হওয়া উচিত ও কেবলমাত্র উচ্চ-শিক্ষিত, চরিত্রবান, ভদ্র ও সঙ্গতিপন্ন ইউরোপীয়দের দিয়ে এই কাজ শুরু হওয়া উচিত, আর দ্বিতীয়ত, উভয় সম্প্রদায়ের জন্য একই আইন করা হলে ও প্রত্যেকের মধ্যে থেকে সমানভাবে জুরী গৃহীত হলে উভয়ক্কার ভিতরের বৈষম্য অনেকটা বিদূরিত হবে। [৩০]

রামমোহন ও দ্বারকানাথের এইসব মতামত আরও যাঁরা পোষণ করতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর। [৩১]

নীলচাষ যে দেশের কল্যাণ সাধন করছে এবিষয়ে তাঁদের কোনো সন্দেহই ছিল না। নীলচাষের প্রথম দিকে এমন দু-একজন নীলকরের উদাহরণ পাওয়া যায়—যারা ততটা অত্যাচারী ছিল না এবং সেই সময় তাঁদের দু-একজনের মধ্যে পথিকৃৎসুলভ কিছুটা উদ্দীপনা থাকাটাও অসম্ভব ছিল না। সিন্দুরিয়ার কুঠির ম্যানেজার সেরিফের চাষীদের মধ্যে সুনামই ছিল।

গ্রামে নীলকরদের বসবাসের ফলে এক ধরনের উন্নতি যে হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নীলকরদের জন্য গ্রামে অনেক পাকা বাড়ি,

প্রাসাদ, বাগান, পুকুর ইত্যাদি তৈরি হয়েছিল। নীলকরদের জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাত্রার ফলে গ্রাম্যজীবনে কিছুটা চাকচিক্যও দেখা গিয়েছিল। এদিক-ওদিক কিছু কিছু রাস্তাঘাটও তৈরি হয়েছিল। কুঠিতে যেসব আমলা কাজ করত তারাও তাদের প্রভুদের উন্নতির যৎসামান্য হলেও কিছুটা অংশ পেত। সম্ভবত এই উন্নতিগুলিই রামমোহনের চোখে পড়েছিল। ১৮৩২ সালে (৩০শে মার্চ) যখন বিলাতে পার্লামেণ্টারী তদন্তের সময় ডেভিড হীলকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে নীল চাষের ফলে বাঙলার কোনো উন্নতি হয়েছে কিনা তিনি তাঁর উত্তরে বলেছিলেন: "গ্রামের চেহারার বেশ উন্নতি হয়েছে, কিন্তু জনসাধারণের অবস্থার কোনো উন্নতি হয় নি।" রেভারেণ্ড স্মৃড়কে যখন নীল-কমিশন প্রশ্ন করেছিলেন যে ফরলঙ্গের কুঠি বছর বছর যে ৩ লক্ষ টাকা করে নীলচাষে খাটায় তার ফলে কি জনসাধারণ উপকৃত হয় না? স্মৃড় উত্তরে বলেছিলেন যে যারা কুঠিতে কাজ পায় তারা নিশ্চয়ই উপকৃত হয়, কিন্তু কৃষকের যে ক্ষতি হয় তা এই উপকারের চাইতে অনেক বেশি। [৩২] আর একজন সাক্ষ্যে বলেছিলেন যে নীলচাষ পছন্দ করে এক মাত্র কুঠির আমলারাই, আর কেউ নয়। তিনি আরও বলেছিলেন যে কৃষকরা কেবলমাত্র নীলকরদের জন্যই নয়, জমিদারদের জন্যও নীলচাষ করতে রাজী নয়, আর রাস্তাঘাট সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন যে ওগুলো হচ্ছে একটা কুঠি থেকে আর একটা কুঠিতে যাবার জন্য এবং তার খরচ চাষীর কাছ থেকে আদায় করে নেওয়া হয়। [৩৩]

রামমোহন ও দ্বারকানাথের এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গির তাৎপর্য বুঝতে হলে তখনকার বাংলার বাস্তব অবস্থার কথা চিন্তা করা প্রয়োজন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ বাংলার ইতিহাসে একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন ও দুঃখময় যুগ। এই যুগসন্ধিক্ষণে বাঙালীর স্বাধীনতার অবসান ঘটে এবং বিদেশী শাসনের ও বণিকতন্ত্রের নাগপাশে আবদ্ধ হয়। ইংরেজ শাসনের ও তাদের অবাধ শোষণের প্রথম অভিসম্পাত ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১১৭৬ সাল, ইং ১৭৬৯-৭০) —যখন বাংলার এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ প্রায় এক কোটি বাঙালীকে অনাহারে প্রাণত্যাগ করতে হয়। তার কয়েক বছর পরে উত্তর ও পূর্ববঙ্গে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান ও তাদের দমনার্থে ইংরেজের সশস্ত্র অভিযান।

ইতিমধ্যে, বাংলায় ইংরেজ বণিকতন্ত্র স্থাপিত হবার পর থেকেই শুরু হয়ে গেল বাংলার ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থায় পাঁচ-সালা, দশ-সালা ইত্যাদি

পরীক্ষামূলক ব্যবস্থার পালা, যার ফলে পুরাতন ভঙ্গুর সমাজে এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হল। ঠিক যে সময়ে ফরাসী বিপ্লব সামন্ততন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফরাসী দেশে বুর্জোয়া গণতন্ত্র স্থাপন করে সমগ্র ইউরোপে তার পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ সালে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের' কায়েম করে বাংলার ধ্বসে-পড়া সামন্ততন্ত্রকে এক নতুন ঔপনিবেশিক রূপ দিয়ে পুনরুজ্জীবিত করে তুললেন ও সঙ্গে সঙ্গে বাংলার ভবিষ্যৎ এক শতাব্দীর জন্য প্রগতির পথ বন্ধ করে দিলেন।

এই যুগে বাংলার ভগ্নস্তূপের মধ্য দিয়ে ইংরেজ শাসন ও বাণিজ্যের সহায়করূপে এক নতুন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হল, যাকে বলা হয় কম্প্রাডর (মুৎসুদ্দী) শ্রেণী। কলকাতার দেব-পরিবার, ঠাকুর-পরিবার, রায়-পরিবার, সিংহ-পরিবার, বসাক-পরিবার, মল্লিক-পরিবার ইত্যাদি—এরা সকলেই সেই যুগের ইংরেজ আমলের সৃষ্টি। নানাভাবে ইংরেজকে সাহায্য করে এঁরা সকলেই প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দৌলতে ভূ-সম্পত্তি কিনে জমিদার হয়ে বসেছিলেন। মনে রাখা ভাল যে, এই শ্রেণীর সঙ্গে ইউরোপের বুর্জোয়া শ্রেণীর দু-একটা বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও, তাদের চরিত্রের মধ্যে মৌলিক তফাত রয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের অবস্থা বর্ণনা করে ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: "এই সময়ের প্রধান প্রধান বাঙ্গালী এবং এদেশের শ্রীবৃদ্ধিকারী বেসরকারী ইংরাজদিগের পরস্পর বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল।...বস্তুত তখনকার বাঙ্গালীরাও আপনাদিগের দেশের ভালমন্দ কিসে হইবে তাহা আপনারা বিচার করিয়া বুঝিতেন না। উঁহারা ইংরাজদিগেরই নিতান্ত অনুবর্তী হইয়া চলিতেন।...তখনকার বাঙ্গালী জমিদাররাও সাতিশয় হীনদশাগ্রস্ত হইয়া ছিলেন। তখন জমিদারির দর এত ন্যূন হইয়াছিল যে, পাঁচ সনের মাল গুজারীই তাহার সর্ব্বোচ্চ মূল্য হইত। কোন কোন ক্ষেত্রে এক বছরের খাজনা মায় পণ পাইয়াও জমিদার আপন অধিকার বিক্রীত করিয়াছিলেন। ...কিন্তু কলিকাতার অবস্থা ইহা অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল। ইউরোপীয় ও মার্কিণ বণিকবর্গের মুৎসদ্দি হইয়া ঐ সময়ে কলিকাতার অনেকে বিষয়াপন্ন হইয়াছিলেন। সেই সকল লোকের উপর ইংরাজদিগের যৎপরোনাস্তি প্রভাব ছিল। তদ্ভিন্ন এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তির সংখ্যা অধিক হয় নাই। আর যাঁহারা ছিলেন তাঁহারাও গভর্নমেণ্টের কার্য্যে সম্ভুক্ত হন

নাই—তাঁহারাও তৎকালে শ্রীবৃদ্ধিকারী ইউরোপীয়দিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।" [৩৪]

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে বে-সরকারী ইংরেজদের বাঙালী-দের সঙ্গে অনেক বিষয়ে সহযোগিতা করতে দেখা যায়। কলোনাইজেশন আন্দোলনে, কোম্পানির সনদের পুনর্বিবেচনার জন্ম আহূত সভায়, রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভায়, মুদ্রাযন্ত্রের শৃঙ্খল-মুক্তি উপলক্ষে বিভিন্ন সভায়, বিদেশে ভারতীয় কুলি-প্রেরণের প্রতিবাদ সভায়, শিক্ষাবিস্তারের জন্ম স্কুল ও কলেজ কমিটিতে, ব্যাঙ্ক, বীমা, সওদাগরি আফিস, জাহাজের কারখানা ও আরও অনেক ব্যাপারে ইংরেজ ও বাঙালী সহযোগিতা করতেন এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। ডেভিড হেয়ারের মত কয়েক জন মহাপ্রাণ ইংরেজ এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সহযোগিতায় যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিলেন। তৃতীয় দশকেই কিন্তু এ-অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে [৩৫] এবং এইসব বেসরকারী ইংরেজদের প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদী রূপ পরবর্তী দশকেই কালা কানুন আন্দোলনের সময় উগ্রভাবে প্রকাশ পায়। এই প্রসঙ্গে একটি মূল কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। এই যুগ ছিল ইংল্যাণ্ডে বণিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে শিল্পপতিদের, বাণিজ্য-ধনিকদের বিরুদ্ধে শিল্প-ধনিকদের সংঘর্ষের যুগ। শিল্পবিপ্লবের ফলে শিল্পপতিদের প্রভাব সেখানে স্বভাবতই বেড়ে গিয়েছিল। এবং তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের জন্ম ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল, যা রূপ নিল সংস্কার আন্দোলনের (Reform bill) মধ্যে। এই আন্দোলন রামমোহনের চিন্তাধারাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। [৩৬] এই শ্রেণীর আর একটা লক্ষ্য ছিল এই যে, বণিকতন্ত্রের একচেটিয়া বাণিজ্যের স্থলে অবাধ-বাণিজ্য নীতি কায়েম করা। তাদের প্রতিনিধিরা ভারতবর্ষে তাদের দাবি (কলোনাইজেশন, অবাধ-বাণিজ্য ইত্যাদি) আদায় করবার জন্ম ভারতবাসীর সাহায্য নিতে কুণ্ঠাবোধ করে নি।

ইংল্যাণ্ডের এই শিল্প-বুর্জোয়াশ্রেণী ভারতের অর্থনীতিতে কি ভূমিকার অভিনয় করতে যাচ্ছিল সে সম্বন্ধে 'ম্যাঞ্চেস্টার চেম্বার অব কমার্স'-এর প্রেসিডেন্ট টমাস ব্যাজলী পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছিলেন: "ভারতবর্ষ একটা বিরাট দেশ; তার বিশাল জনসংখ্যা আমাদের ব্রিটিশ শিল্পদ্রব্য অধিক পরিমাণে কিনবে, ভারতীয় বাণিজ্য সম্বন্ধে এখন প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা যে-সব শিল্পদ্রব্য পাঠাব, তার মূল্য ভারতীয়রা তাদের জমির ফসলের দ্বারা দিতে পারবে কিনা।" [৩৭]

ব্রিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণী কী নির্মমভাবে তাদের ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করেছিল এবং ভারতবর্ষকে কিভাবে সম্পূর্ণরূপে একটা ঔপনিবেশিক কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত করেছে, তা একটু পরেই আলোচিত হবে।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক থেকেই পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারা ও বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রভাব বাংলা দেশকেও স্পর্শ করেছিল এই চিন্তাধারার ধারক ও বাহকদের পুরোভাগে ছিলেন রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর। বর্তমান ভারতের জাতীয়তাবাদের ভিত্তি যে তাঁরাই রচনা করেছিলেন, সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। অন্ধকারাচ্ছন্ন সংস্কারের অতল গর্ভ থেকে টেনে তুলে ভারতবাসীকে অগ্রসর দেশগুলির সমকক্ষ করবার জন্য সারা জীবন ধরে যে সুমহান প্রচেষ্টা তাঁরা করেছিলেন তা প্রত্যেক ভারতবাসী চিরকাল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে। বহু বিষয়ে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে উভয়ের ঐক্যবদ্ধ কাজ লক্ষণীয়। সতীদাহ নিবারণের জন্য, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ও শিক্ষাবিস্তারে তাঁরা এক যোগে কাজ করতেন। সংবাদ-পত্রের গুরুত্ব-উপলব্ধি করে রামমোহন-দ্বারকানাথ ১৮২৯ সালে ইংরেজীতে 'বেঙ্গল হেরাল্ড' ও বাঙলাতে 'বঙ্গদূত' নামক দুখানা পত্রিকা বার করেন।

ধর্মে, রাজনীতিতে, শিক্ষায় ও সামাজিক ক্ষেত্রে রামমোহন যেমন নতুন একটা বৈপ্লবিক চিন্তাধারার স্রোত বাঙালীর জীবনে এনে দিয়েছিলেন, সেইরকম দ্বারকানাথও অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন। ১৮৩৪, ৪ঠা অক্টোবর তারিখের 'সমাচার-দর্পণে' প্রকাশিত হয় যে "কার ঠাকুর কোম্পানীর নূতন বাণিজ্য কুঠির ব্যাপার অদ্য আরম্ভ হইল। ঐ কুঠির দ্বিতীয় অংশীদার বাবু দ্বারকানাথ ইহার পূর্বে সল্টবোর্ডের দেওয়ান ছিলেন। তিনি সাধারণ বাণিজ্য কার্য ও এজেন্সি কার্যে প্রবর্ত্ত হওনার্থ ন্যূনাধিক ছয় সপ্তাহ হইল ঐ দেওয়ানী কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। এতদ্বিষয় মনোযোগ করণের যোগ্য বটে যেহেতুক কলিকাতার মধ্যে ইউরোপীয়দের ন্যায় বাণিজ্য করিতে ও এজেন্সি ও বিদেশীয় বাণিজ্যের ব্যাপারে যে হিন্দু প্রথম প্রবৃত্ত হন তিনি উক্ত বাবুই কিন্তু ইহার পূর্বে বোম্বাই নগরে পারসীয়েরা এরূপ বিদেশীয় বাণিজ্য কার্য অনেক কালাবধি করিতেছেন।" [৩৮]

কার ঠাকুর কোম্পানি প্রতিষ্ঠা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। এর আগে সাধারণত বাঙালীরা ব্রিটিশ এজেন্সি হাউসগুলিকে সুদে টাকা ধার দিয়ে

কিছু উপার্জন করত ও মুৎসুদ্দী নামে পরিচিত হত। বাঙালীর টাকায় ইংরেজ ব্যবসায়ীরা দেশটাকে লুটত ও বড়লোক হত। বাঙালীদের মধ্যে দ্বারকানাথই প্রথম, যিনি খুব বড় আকারে ইংরেজের সমতুল্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে বাঙালীকে জাতীয় উন্নতির পথ দেখালেন। কার-ঠাকুর কোম্পানির প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব থেকেই কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সঙ্গে দ্বারকানাথ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন।

ব্যবসায়ে দ্বারকানাথের প্রচুর লাভ হতে লাগল। ব্যবসায়ের পূর্বে যদিও তিনি একজন বড় জমিদার ছিলেন, এই লাভের টাকায় তিনি আরও কতক-গুলি বিস্তর আয়ের জমিদারি কিনলেন, যেমন রাজসাহীর কালিগ্রাম, পাবনার সাহাজাদপুর (শিলাইদহ), রংপুরের স্বরূপপুর, দ্বারবাসিনী, জগদীশপুর ও কটকের সরগরা। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাঙালীরা ব্যবসায়ে টাকা করে জমিদারি কিনত ও ব্যবসা ছেড়ে দিত। কিন্তু দ্বারকানাথের বেলায় অন্য রকম; তিনি জমিদারির আয় ব্যবসায়ে নিয়োগ করতেন ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতেন। শিলাইদহতে তিনি নীলকুঠি স্থাপন করলেন; কুমার-খালিতে গভর্নমেণ্টের রেশমকুঠি কিনে নিলেন; বারুইপুর, গাজিপুর এবং পাবনায় চিনির কারখানা স্থাপন করলেন। আখের চাষ ও চিনি উৎপাদনের জন্য তিনিই প্রথম ভারতে বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করেছিলেন। কয়েকটি জাহাজও তিনি কিনেছিলেন। একটি কয়লা খনি চালিয়েও তিনি অনেক লাভবান হয়েছিলেন। 'নিউ ওরিয়েণ্টাল ইনসিওরেন্স কোম্পানি' নামে নতুন বীমা কোম্পানি গঠিত হলে, দ্বারকানাথের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় তার অনেক শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল।

এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করে দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন: "আমার পিতা ১৭৬৩ শকের পৌষ মাসে (১৮৪২, জানুয়ারী) ইউরোপে প্রথম যান। তখন তাঁহার হাতে হুগলী, পাবনা, রাজসাহী, কটক, মেদিনীপুর, রংপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলার বৃহৎ বৃহৎ জমিদারী এবং নীলের কুঠি, সোরা, চিনি, চা প্রভৃতি বাণিজ্যের বিস্তৃত ব্যাপার। ইহার সঙ্গে আবার রানীগঞ্জে কয়লার খনির কাজও চলিতেছে। তখন আমাদের সম্পদের মধ্যাহ্ন সময়।" (পৃঃ ১২৭)

দ্বারকানাথ বিলাত ভ্রমণকালে শেফিল্ড, নিউক্যাসেল, ম্যাঞ্চেস্টার, লিভারপুল, বার্মিংহাম, এডিনবরা, গ্লাসগোর শিল্পকেন্দ্রগুলি বিশেষভাবে

চেষ্টা করছেন। [৪১] রামমোহন-দ্বারকানাথ অনেক বিষয়েই দূরদর্শী ও বিপ্লবী ছিলেন তা কেউই অস্বীকার করতে পারে না, কিন্তু এই নীলচাষ ও অবাধ-বাণিজ্যের ব্যাপারে তাঁরা মোটেই দূরদর্শিতা বা বৈপ্লবিকতার পরিচয় যে দেন নি তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

রামমোহন-দ্বারকানাথ সম্বন্ধে এই ধরনের বক্তব্যের পক্ষে এমন সমস্ত যুক্তি-তর্কের ও তথ্যের অবতারণা করা হয়েছে যা বাস্তবানুগ নয় ও রীতিমত বিকৃত। কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে এ-বিষয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা নিতান্ত অপ্রসাঙ্গিক হবে না নিশ্চয়ই।

'সংবাদ-কৌমুদীতে' দ্বারকানাথের চিঠি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে "আর যেটা দ্বারকানাথের সত্যনিষ্ঠ মনের দৌলতে আমরা জানতে পারলুম সেটি হচ্ছে এই যে নীলচাষের ফলে গাঁয়ের চাষী আর মধ্যবিত্ত দুইই লাভবান হয়েছিল। চাষীরা জমিদারের কাজ করে একটি পয়সাও পেত না, তাদের বেগার খাটিয়ে নিত জমিদাররা। নীলকর সাহেবদের ক্ষেতে কাজ করে সেই চাষীরাই মাসে প্রায় চার টাকা রোজগার করত।...গাঁয়ের মধ্যবিত্তদেরও কম উপকার হয়নি নীলকর কুঠির কৃপায়। কেরানীর কাজ, নায়েবের কাজ, সরকারের কাজ, কত রকমের কাজ পেত নীল কুঠিতে।" [৪২]

রামমোহন ও দ্বারকানাথ বাংলার জমিদারদের ন্যায়সঙ্গতভাবেই তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। রামমোহন সামন্ততন্ত্রধ্বংসকারী ফরাসী-বিপ্লবকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, কিন্তু বাংলায় ঔপনিবেশিক সামন্ততন্ত্রের বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উচ্ছেদ করার দাবি কখনো তোলেন নি। যাই হোক, বাংলার জমিদাররা অনেক সময় টাকার লোভে নীলকরদের জমি দিয়েছিলেন। আবার অনেক সময় নিজেদের স্বার্থের জন্যই হোক আর অন্য যে কোনো কারণেই হোক অনেক জমিদার নীলকরদের বাধাও দিয়েছিলেন এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রজাদের নীলকরদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে লিখেছেন : "নীল-চাষের আমলে নীলকর যখন ঋণের ফাঁসে ফেলে প্রজার জমি আত্মসাৎ করার চেষ্টায় ছিল, তখন জমিদার রায়তকে বাঁচিয়েছে। নিষেধ আইনের বাঁধ যদি সেদিন না থাকত তাহলে নীলের বন্যায় রায়তী জমি ডুবে একাকার হত।"[৪৩] স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ এবিষয়ে রামমোহন-দ্বারকানাথের সঙ্গে একমত নন।

প্রথমেই ধরা যাক বেগার খাটার প্রশ্ন। নীলকরদের নীলচাষ হত দু রকমের—একটা হত 'নিজ' চাষ, অর্থাৎ নিজের জমিতে, যদিও ১৮৩৩ সালের

পূর্বে সে-জমি হত বেনামিতে; সেখানে সস্তায় সাঁওতাল মজুর লাগিয়ে তারা নিজে চাষ করত (এখনও নদীয়া, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী জেলাতে সেইসব সাঁওতালদের বংশধররা দিনমজুর হিসাবে বসবাস করছে)। আর একটা চাষ হত রায়তদের জোর করে দাদন দিয়ে তাদেরই জমিতে। 'নিজ' চাষ থেকে 'রায়তী' চাষের পরিমাণ ছিল অনেক বেশি। জমিদারের জন্য চাষীদের বেগার খাটতে হত, ঠিক কথা, কিন্তু কিছুদিন বেগার খেটে দেবার পর রায়তরা নিজের কাজে মন দেবার সুযোগ পেত; কিন্তু দাদন নিয়ে নীল চাষের অর্থই ছিল নীলকরের জন্য চাষীর বারমাস বেগার খাটা, যার জন্য কৃষকরা নীলকরের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ করতে বাধ্য হল।

তারপর গ্রামের মধ্যবিত্তদের কথা। প্রশ্ন হচ্ছে, এই 'মধ্যবিত্ত' কারা ছিল ও তাদের সামাজিক ভূমিকা কি ছিল? সত্যই কি তাদের আদৌ মধ্যবিত্ত বলা যায়? ইউরোপে মধ্যবিত্তের অর্থাৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর ভূমিকা ছিল সমস্ত ক্ষেত্রেই—অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে, সামাজিক ব্যাপারে—প্রগতিশীল ও বিপ্লবী। কিন্তু আমাদের এই তথাকথিত মধ্যবিত্তরা ছিল বিদেশী উপনিবেশ-বাদীদের সেবাদাস, নীলকরদের শোষণ-যন্ত্রের সহায়ক। তারা নীলকরদের সাহায্যে অসহায় কৃষকদের শোষণ করে প্রচুর অর্থ-উপার্জন করত, তাদের কোনো প্রকারের প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল না। তাদের প্রকৃত চরিত্র উদ্ঘাটন করে ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র লিখেছেন, নীলকরদের অধীনে "কয়েকজন দেশী কর্মচারী থাকিতেন, তন্মধ্যে প্রধান ছিলেন নায়েব বা দেওয়ান। উহার বেতন ৫০৲ টাকা। সে আমলে উহাই উচ্চহার। নায়েবের অধীনে থাকিতেন গোমস্তা। রাইয়তদের হিসাবপত্রের সহিত উহাদেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এজন্য তাহারা প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবে দস্তুরী বা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া বেশ দু'পয়সা আয় করিতেন। সাহেবদিগের অবোধ্য অশ্লীল গালাগালি এবং সময় মত বুটের আঘাত উহারা বেশ হজম করিতে জানিতেন এবং কোন প্রকার মিথ্যা প্রবঞ্চনা বা চক্রান্তে পশ্চাদপদ না হইয়া ইহারাই অনেক স্থলে দেশীয় প্রজার সর্বনাশ বা মর্মান্তিক যাতনার হেতু হইয়া দাঁড়াইতেন।" (যশোহর-খুলনার ইতিহাস, পৃঃ৭৬২) নীলকরদের কৃপায় এই 'মধ্যবিত্তেরা' যে কতখানি উপকৃত হয়েছিল সে সম্বন্ধে পাদ্রী কুথবার্ট নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লিখে-ছিলেন: "আমি একটা ফ্যাক্টরির একজন গোমস্তাকে জানি, সে মাইনে পেত অতি সামান্য, কিন্তু সে ২০,০০০ টাকা গুছিয়ে নিতে পেরেছিল।

আমি আর একজনের কথা সম্প্রতি শুনেছি, যার মাসে মাইনে ছিল মাত্র ২৫ টাকা, কিন্তু সে কুঠীর কাজ করে ৫০,০০০ টাকা জমিয়ে ফেলেছিল।" [৪৪]

নীল-কমিশনে সাক্ষ্যদান কালে কুখ্যাত নীলকর আর্চিবল্ড হিল্‌স তার নায়েবের সম্বন্ধে বলেছিল যে খুব অল্প বয়সেই কেদারনাথ মুখার্জী তার কুঠিতে কাজ করতে আসে এবং শীঘ্রই নায়েব হয়। গত ১৪ বৎসর থেকে ৫০টাকা মাসে মাইনেতে নায়েবী করছে। কাছেই মাথাভাঙা নদীর ধারে সে খুব বড় একটা বাড়ি তৈরি করেছে। "তার ছেলের বিয়ের সময় (১৮৫৮ সালে) সে তুবার কৃষকদের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা আদায় করেছিল।... এর জন্য সে অবশ্য ম্যানেজার টিসেস্তির অনুমতি চেয়েছিল; টিসেস্তি বলেছিল রায়তরা যদি এর বিরুদ্ধে আপত্তি না করে তাহলে তার অমত নেই।" [৪৫]

কিন্তু তাঁদের বক্তব্য এইখানেই শেষ হয় নি। নীলকরদের বিরুদ্ধে চাষীদের গৌরবময় সংগ্রামের সমস্তটাকেই তাঁরা 'সংস্কারবদ্ধ মনের অদূরদর্শী' আস্ফালন বলে নিন্দা করেছেন এবং সর্বশেষে, নীলচাষ, কলোনাইজেশন, অবাধ-বাণিজ্য, শিল্প-বিপ্লব সবকিছুকে একাকার করে দিয়ে এঁরা এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ি পরিবেশন করেছেন। তাঁরা বলছেন, "'কলোনাইজেশন' এই শব্দটিকে ঘিরে সেদিন যে তুমুল বাগবিতণ্ডা চলছিলো তার মোদ্দা কথাটি ছিলো—শিল্প-বিপ্লব চাই কি শিল্প-বিপ্লব চাই না। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ছিলেন শিল্প-বিপ্লবের পক্ষে।...অবাধ-বাণিজ্যের নীতি গৃহীত না হলে ভারতের শিল্প-বিপ্লব কিছুতেই ঘটতে পারে না।" আরও বলা হয়েছে যে "ক্যাপিটালিজমের সম্প্রসারণ ও অগ্রগতির জন্যে অবাধ-বাণিজ্য নীতি ছিল সেদিন একমাত্র নীতি।...সাগরের এপার ওপার—দু, পারেই তখন একচেটিয়া বাণিজ্য-নীতির সঙ্গে অবাধ-বাণিজ্য নীতির জোর লড়াই চলতে লাগল।"

তখনকার দিনের বাঙালী-প্রধানরা, তথ্যের অভাবেই হোক কিংবা ব্রিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রগতিশীল ভূমিকায় মোহান্ধ হয়েই হোক, ইংল্যাণ্ডের অবাধ-বাণিজ্য-নীতির তাৎপর্য বুঝতে পারেন নি। কিন্তু আজকের দিনে কেউ যে ইংরেজ শিল্পপতিদের ভারতে অবাধ-বাণিজ্য নীতির সুফল বর্ণনায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবেন তা সত্যই একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা!

পূর্বেই আমরা লক্ষ্য করেছি যে তখন ছিল ইংল্যাণ্ডে শিল্প-বিপ্লব ও তারই রাজনৈতিক আন্দোলনের যুগ। শিল্পক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ড ছিল অন্যান্য দেশগুলি থেকে অনেক বেশি অগ্রসর; শিল্পজগতে তার তখন একচেটিয়া অধিকার বললেই চলে। সুতরাং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সে যে অবাধ-বাণিজ্য নীতির গুণগান করবে সেইটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু কোনো স্বাধীন দেশই—আমেরিকা, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান, কেউই অবাধ-বাণিজ্য-নীতি মেনে নেয় নি। উপরন্তু তারা সকলেই কড়া শিল্প-সংরক্ষণ নীতির মাধ্যমে তাদের জাতীয় শিল্প গড়ে তুলেছিল ও ইংল্যাণ্ডের শিল্পে একচেটিয়া অধিকার ভেঙে দিয়েছিল। ক্যাপিটালিজমের সম্প্রসারণ ও অগ্রগতির জন্যে অবাধ-বাণিজ্য নীতিই একমাত্র নীতি ছিল না।

১৮৩৩ সালের সনদে ভারতের জন্য অবাধ-বাণিজ্য নীতি স্বীকার করে নেওয়া হল। কিন্তু তার ফলে ভারতবর্ষে, বাংলা দেশে শিল্প-বিপ্লব ঘটেছিল কি? এ প্রশ্নের সঠিক জবাব স্কুল-কলেজের ছাত্ররাও দিতে পারে। ১৮৩৩ সালের পর, শিল্প-বিপ্লব তো দূরের কথা, ভারতবর্ষের যে সমস্ত নিজস্ব শিল্প ছিল সেগুলিকে ধ্বংস করে তাকে পুরোমাত্রায় ঔপনিবেশিক দেশে পরিণত করা হল ও তাকে সম্পূর্ণরূপে কৃষির উপর নির্ভর করতে হল। ভারতের এই অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য কি ফলাফল হয়েছিল তা দুর্ভিক্ষের ক্রমবর্ধমান সংখ্যাগুলির দিকে তাকালেই স্পষ্ট বোঝা যায়: উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে হয় ৭টি দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুর সংখ্যা ১৫ লক্ষ; দ্বিতীয়ার্ধে হয় ২৪টি দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুর সংখ্যা ২ কোটি। ভারতে শাসনভার হস্তগত করার পর ইংরেজ কিভাবে এই দেশের শিল্পগুলিকে ধ্বংস করেছিল তা সর্বজনবিদিত। তখনকার ভারতের প্রধান শিল্প,—বস্ত্র-শিল্পের উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। ১৮১৪ সালে ১,২৫০,০০০টি বস্ত্র ভারত থেকে বিদেশে রপ্তানি হয়েছিল; ১৮৩৫ সালে এই সংখ্যা কমে দাঁড়াল ৩০৬,০০০ এবং ১৮৪৪ সালে ৬৩,০০০। যেখানে ভারত ১৮১৫ সালে ১ কোটি ৩০লক্ষ টাকার কাপড় রপ্তানি করেছিল, সেখানে ১৮৩২ সালে রপ্তানি হল মাত্র ১০ লক্ষ টাকার। আবার অন্যদিকে ঠিক এই একই সময়ের মধ্যে ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতে যে কাপড় আমদানি হয়েছিল তা ১৮১৫ সালের ২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা থেকে বেড়ে ১৮৩২ সালে হল ৪০ লক্ষ টাকায়। ইংল্যাণ্ড ১৮১৪ সালে ভারতে মাত্র ১০ লক্ষ গজ কাপড় রপ্তানি করেছিল; ১৮২৪ সালে সেটা বেড়ে দাঁড়াল ৬০ লক্ষ গজে আর ১৮৩৭ সালে

৬ কোটি ৪০ লক্ষ গজে। এই সময়ের মধ্যে ভারতের একটি প্রধান বস্ত্র-শিল্পের কেন্দ্র ঢাকা শহরের জনসংখ্যা ১,৫০,০০০ থেকে কমে ২০,০০০-তে দাঁড়াল।

ভারতের এইরূপ বাণিজ্যিক দুর্গতির ফলে ইংরেজ শাসকদের নিকট একটা বড় সমস্যা দেখা দিল। একটা দেশ কেবল কিনে যাবে, আমদানি করবে, তার বদলে কিছু বিক্রি করবে না, রপ্তানি করবে না, এ রকম একটা অস্বাভাবিক অবস্থা বেশি দিন চলতে পারে না। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটিই উত্থাপন করেন লর্ড বেণ্টিংক তাঁর এক রিপোর্টে—যাতে তিনি 'কলোনাইজেশন' ও অবাধ-বাণিজ্য সমর্থন করেন। [৪৬] ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ভারতে অবাধ-বাণিজ্য নীতির প্রচলনের অর্থ হল ভারতবর্ষকে একদিকে ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্যের বাজার রূপে, অন্যদিকে কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের ক্ষেত্রে পরিণত করা। ইংরেজ শিল্পপতিরা অবাধ-বাণিজ্যের আন্দোলন করেছিল ভারতবর্ষকে শিল্পে সমৃদ্ধিশালী করবার জন্য নয়; তারা চেয়েছিল ভারতবর্ষ আরও বেশি করে নীল, কফি, চা, পাট ইত্যাদি অর্থকরী ফসলের চাষ করুক। এবিষয়ে তৎকালীন ভারতীয় নেতাদের যত বিভ্রান্তিই থাকুক না কেন, তাঁরা যাই স্বপ্ন দেখুন না কেন, ব্রিটিশ শাসকদের এবিষয়ে কিন্তু বিভ্রান্তি ছিল না।

আর একটি কথা। রামমোহন, দ্বারকানাথ, প্রসন্নকুমার, বেণ্টিংক প্রমুখ ব্যক্তিরা 'কলোনাইজেশন' ও নীলকরদের সমর্থন করেছেন এই যুক্তিতে যে, নীলকরদের ও ইংরেজদের এদেশে বসবাস করবার অধিকার দিলে তারা বিলেত থেকে মূলধন ও কারিগরী জ্ঞান নিয়ে এসে এদেশে নিয়োগ করবে, যার ফলে দেশে শিল্প-বিপ্লব ঘটে যাবে।

পূর্বেই বলা হয়েছে ১৮৩৩ সালের নতুন সনদ তৈরি হবার সময়ে 'কলোনাইজেশন' 'অবাধ-বাণিজ্য' এইসব প্রশ্নগুলির উপর প্রচুর আলোচনা হয়েছিল। তখন বিলাতে ১৮৩২ সালে ৩০শে মার্চ তারিখে পার্লামেণ্টারী কমিটির নিকট সাক্ষ্যদান কালে ডেভিড হিল (যিনি ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন) নিজের ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে যা বলেছিলেন তার সত্যতা ও গুরুত্ব আজও এতটুকু ম্লান হয় নি। তিনি বলেছিলেন যে: "ভারতে ইংরেজদের বসবাসের উপকারিতা সম্বন্ধে অদ্ভুতভাবে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে; ব্রিটিশ মূলধন ও কারিগরী জ্ঞান কোনোকালে ভারতবর্ষে গিয়ে পৌঁছবে কিনা সে বিষয়ে আমার

যথেষ্ট সন্দেহ আছে—যখন সব থেকে মস্ত বড় সুযোগ ছিল তখনও যায় নি ; কারণ আমাদের সাম্রাজ্য এত সুদূরে অবস্থিত, তার অবস্থা এতই অনিশ্চিত এবং তার অস্থায়িত্ব সম্পর্কে জনরব এত প্রবল যে তার ফলে ব্রিটিশ মূলধনের মালিকরা তাদের মূলধন ভারতে পাঠাতে সাহস করে না। কর্মকুশলতা সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে এমন কোনো বিশেষ ক্ষেত্র নেই যেখানে ভারতীয়রা আমাদের চাইতে কম কর্মকুশলী। আমাদের দেশের কারিগরদের পক্ষে ভারতের মত একটা গরম দেশে গিয়ে ভালভাবে কাজ করতে অনেক মুস্কিল হবে। ভারতীয় চাষীরা ইউরোপীয় উপনিবেশকারীদের চাইতে অনেক ভাল চাষী হবে এবং এই কথাটা কারিগরদের সম্বন্ধেও খাটে। যে পথটা এখন খোলা থাকল সেটা হচ্ছে ভারতীয়দের প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেওয়া ও তাকে চালনা করা।…যদি শুধুমাত্র ভাল চরিত্রের লোকরাই বসবাস করতে যায় তাহলে ভারতীয়দের তারা কোনো ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না, তাতে তাদের নিজেদেরই ক্ষতি হবে ; সুতরাং উপনিবেশকারীরা যারা যাবার সময় ভাল চরিত্র সঙ্গে নিয়ে যাবে, ধীরে ধীরে তারা তা বিসর্জন দেবে। তাছাড়া এমন সব খারাপ লোকও যাবে যারা ভারতের কোনো উপকারই করতে পাবে না, উপরন্তু তাদের শাসন-কার্য চালনা করাও মুস্কিল হয়ে পডবে।" [৪৭] আরও কয়েকজন সাক্ষী হিলের উক্তিরই সমর্থন করেছিল। ইতিহাস-পাঠক মাত্রই জানেন যে ডেভিড হিলই 'কলোনাইজেশন' সম্বন্ধে ঠিক কথা বলেছিলেন, রামমোহনও নন, দ্বারকানাথও নন। এবং ১৮৫৯-৬০-এর নীল-বিদ্রোহ তা ভাল করেই প্রমাণ করে দিয়েছে।

আর ডেভিড হিলকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়—ভারতের নীলচাষের মূলধন কোথা থেকে আসে, তার জবাবে তিনি বলেছিলেন যে তা সম্পূর্ণরূপে ভারতেই জমে। আর একজন সাক্ষী, ম্যাকান বলেছিলেন যে "মূলধন কখনই ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতে যায় না, তা ভারতেই জমে এবং তা বিলেতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।" ইংল্যাণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের অনেকগুলি কারণের মধ্যে একটা বড় কারণ হচ্ছে ভারতের মূলধন ইংল্যাণ্ডে লুটে নিয়ে যাওয়া।

১৮৩০ সালে রিকার্ডস্ নামে আর একজন ইংরেজ কর্মচারী তাঁর পার্লামেণ্টারী সাক্ষ্যে বলেছিলেন যে মূলধন প্রয়োগ করবার জন্য ভারতীয়দের উৎসাহ দিলে যেরূপ উন্নতির আশা করা যায়, ব্রিটিশ মূলধন ভারতে নিয়োগ করলে উন্নতি তার তুলনায় খুব কমই হবে। ভারতের ধনসম্পদ বাড়াবার জন্য

তার প্রয়োজন মূলধন ; কিন্তু এই কাজের জন্য সব থেকে উৎকৃষ্ট, সব থেকে উপযুক্ত মূলধন হবে ভারতীয় মূলধন এবং এই ধরনের ভারতীয় মূলধন নিশ্চয়ই তৈরি হবে যদি না আমরা তাকে বাধা দিই। [৪৮] ভারতীয় মূলধন সম্বন্ধে এই সময়ে ফোর্বস্ বলেছিলেন, "ভারতীয় মূলধনের পরিমাণ কম নয়, যদিও অত্যধিক কর বসানোর জন্য সম্প্রতি তা বিশেষ বাড়ছে না। ভারতীয়দের এই মূলধন নিয়োগ করায় উৎসাহ দিতে হবে।" [৪৯]

ভারতীয় ব্যবসায় ইংরেজদের যে মূলধন নিয়োজিত হত তার বেশির ভাগই ছিল ভারতেরই টাকা, তা বিলেত থেকে আসত না। একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন, "উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কলকাতার এজেন্সি হাউসগুলিতে অনেক টাকা জমেছিল। এই টাকার বেশির ভাগই ছিল কোম্পানির সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের জমান টাকা।...সরকারও প্রতি বৎসর প্রচুর টাকার নীল কিনত এবং এই নীল ইংল্যাণ্ডে বিক্রীত হয়ে সেখানে যে টাকার প্রয়োজন হত তা যোগাত।" [৫০] ভারত থেকে ইংল্যাণ্ডে মূলধন চালান দেবার এটা ছিল তখনকার দিনে শ্রেষ্ঠ পন্থা।

সবদিক বিচার করে দেখলে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে 'কলোনাইজেশন' ও 'অবাধ-বাণিজ্য' ভারতের পক্ষে অনুকূল নীতি ছিল না। বস্তুত, ভারতবর্ষের দিক থেকে এই সব ক্ষতিকর নীতিগুলির কোনো প্রয়োজনই ছিল না। এই নীতিগুলি ছিল ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থগুলিকে সুদৃঢ় করার নীতি। তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থগুলির কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। তাদের রাজনৈতিক কারণগুলি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে তারা এ বিষয়েও যথেষ্ট সচেতন ছিল। স্যার চার্লস্ মেটকাফ, লর্ড বেণ্টিংক, হোল্ট ম্যাকেঞ্জি প্রমুখ সকলেই তা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে গিয়েছেন।

১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৮২৯ সালের রিপোর্টে মেটকাফ বিলাতের কর্তৃপক্ষের নিকট লিখেছিলেন : আমাদের ভারত-সাম্রাজ্য সর্বদাই বিপজ্জনক অবস্থায় থাকবে যদি না আমাদের প্রতি অনুগত একটা প্রভাবশালী শ্রেণী ভারতে শিকড় বিস্তার করে বসতে পারে। সুতরাং আমি মনে করি আমাদের দেশবাসীদের ভারতে বসবাসে সাহায্য করবে, এই রকম প্রত্যেকটি পন্থা আমাদের সাম্রাজ্যকে দৃঢ় করবে। [৫১] এর তিন মাস পরে বেণ্টিংকও এই কথায় সায় দিয়ে বললেন যে, "ভারতে এমন কোনো সম্প্রদায় নেই যারা আমাদের বিপদের সময় সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। ভারতের প্রভাবশালী, ক্ষমতাবান সাহসী

লোকদের মধ্যে বেশির ভাগ লোকই আমাদের অপছন্দ করে। আমাদের সাম্রাজ্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অসুবিধাগুলিও দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। বিনা বাধায় প্রচুর ইউরোপীয়ানের ভারতে বসবাসের দ্বারা আমরা এই বাধাবিঘ্নগুলি কাটিয়ে উঠতে পারব।" [৫২] হোল্ট ম্যাকেঞ্জি বলেছিলেন যে "ভারতের ইউরোপীয় উপনিবেশকারীরা পুলিশের প্রয়োজনীয় এজেন্ট হতে পারবে, আর তারা হবে সংবাদ আদানপ্রদানের কেন্দ্রস্থল—যেসব সংবাদ আমাদের খুবই দরকার। গ্রামের অধিবাসীদের উপর তাদের প্রভাবও খুব থাকবে, একই মনোভাবের জন্য এরা একই বন্ধনসূত্রে আমাদের সঙ্গে জড়িত থাকবে।" [৫৩]

মেটকাফ, বেন্টিংক, ম্যাকেঞ্জির মত ঝানু সাম্রাজ্যবাদীরা বুঝতে পেরেছিলেন তাঁদের দুর্বলতা কোথায় ও সময়মত তার প্রতিকারের ব্যবস্থাও করতে পেরেছিলেন বলে ১৮৫৭ সালের চরম বিপদের সময় তার 'সুফল" কুড়োতে পেরেছিলেন। ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের সময় যখন ইংরেজের ভারত সাম্রাজ্য টলটলায়মান, তখন বিদ্রোহী ভারতের অবস্থা একটা সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছে, কে হারবে, কে জিতবে সবই অনিশ্চিত; সেই সংকটমুহূর্তে এই জমিদার নীলকররাই বাংলার বিদ্রোহীভাবাপন্ন কৃষকদের সরকারের ও জমিদারদের সহযোগিতায় ও নিজেদের লাঠিয়ালদের দ্বারা দাবিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

নীলচাষের অর্থনীতি

নীলকররা নীলের ব্যবসা করে রাতারাতি বড়লোক হয়ে যেত। রাজার জাতের লোক হিসাবে একেই তো তারা রাজার ঠাটে চলত, তার উপর যখন তারা জমি কিনে জমিদার হয়ে বসল, তখন সত্যসত্যই তারা রাজা ব'নে গেল। মোল্লাহাটিতে ফরলং ও লারমুর যে প্রাসাদে বাস করত তার ছবি Colesworthy Grant-এর 'Rural life in Bengal' [৫৪] ও 'যশোহর খুলনার ইতিহাস'-এ পাওয়া যায়। নীলকরদের এই রকম প্রাসাদ আরও ছিল যশোহরের নহাটাতে, খাবুখালিতে ও হাজরাপুরে। নিশ্চিন্দপুরের কুঠিতে ৭০টি ঘোড়ার আস্তাবল ছিল। মোল্লাহাটিতে প্রাচীর ঘেরা প্রকাণ্ড বাগানে হরিণ চরত, এই হরিণগুলিকে পোষা হত নীলকর সাহেবাদের চিত্তবিনোদনের জন্য। ফরলং ও লারমুরের বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানির ৫৯৫টি গ্রামের জমিদারি ছিল এবং তার জন্য এই কোম্পানি ৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা খাজনা দিত। এবং এই কোম্পানির ঘরবাড়ি ইত্যাদি সম্পত্তির মূল্য ছিল ৫০ লক্ষ টাকা এবং কেবলমাত্র নদীয়া জেলাতেই তাদের প্রতি বৎসর ১৮ লক্ষ টাকা মূলধন খাটত। [৫৫]

নীলকরদের ধনদৌলত ও তাদের রাজকীয় জীবনযাত্রা সম্বন্ধে দু-একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। উইলিয়াম নামক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন ছোট কর্মচারী কুমারখালিতে 'কমার্শিয়াল রেসিডেণ্ট' থাকাকালে নীলকুঠি স্থাপন করতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে আশেপাশে অনেকগুলি কুঠি নির্মাণ করে। দেখতে দেখতে সে বিরাট ঐশ্বর্যের মালিক হয়ে উঠল। তারপর যখন তার 'হোমে' ফিরে যাবার বাসনা হল, সাধারণ জাহাজে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে একসঙ্গে যাওয়াটা তার আত্মসম্মানে বাধল। তখন সে নিজেই একটা জাহাজ তৈরি করিয়ে নিল ও তার নাম দিল 'জানোবীয়া'। এটা তখনকার দিনের একটা খুব উৎকৃষ্ট জাহাজ। 'জেনোবীয়াতে' উইলিয়াম তার পরিবারের সঙ্গে যত পারল নীলের বাক্স ও আরও অনেক মূল্যবান জিনিসপত্র বোঝাই করল। তারপর যে মুহূর্তে সে যাত্রা শুরু করবে, সেই সময় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল যে, সে কোম্পানির টাকা চুরি করে নীলকুঠি স্থাপন করেছিল। শেষ পর্যন্ত উলিয়াম

সর্বস্বান্ত হয়ে যায় ও অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে ঢাকা শহরে মারা যায়। কিন্তু দুই-একটা ক্ষেত্রে এই ধরনের ভুঁইফোঁড়গুলির এই রকম বিয়োগান্ত পরিণতি হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা তাদের নবাবী বজায় রাখতে পেরেছিল। [৫৬]

পূর্বেই বলা হয়েছে যে নীলচাষ দু রকমের ছিল—নিজ-আবাদী ও রায়তী-আবাদী অর্থাৎ দাদনী-আবাদী। নিজ-আবাদীতে বা কুঠির নিজ চাষের জন্য বহু ক্ষেতমজুরের দরকার হত। বড় বড় কুঠিগুলি বহুদূর থেকে মজুর আনাত। সাধারণত বাঁকুড়া, বীরভূম, মানভূম, সিংভূম থেকে সাঁওতালদের আনা হত। খুব কম পয়সায় আর কাউকে বড় একটা পাওয়া যেত না। মোল্লাহাটি কুঠিতে ৬০০ মজুর কাজ করত। পুরুষ মজুরদের দর ছিল মাসে তিন টাকা, আর মেয়ে ও বালক মজুরদের দর ছিল দু টাকা। সাঁওতালরা সাধারণত সপরিবারে আসত ও কুঠির নিকটে কোনো জমির উপর কুঁড়েঘর বেঁধে বাস করত। নিজ-আবাদের সমস্ত খরচ ও ঝুঁকি বইতে হত নীলকরকে, সুতরাং নিজ-আবাদ সে বিশেষ পছন্দ করত না। নিজ-আবাদের জন্য তার প্রচুর মূলধন প্রয়োজন হত। ইণ্ডিগো কমিশনের মতে ১০,০০০ বিঘা চাষের জন্য লাগত ২,৫০,০০০ টাকা। কিন্তু রায়তী-আবাদে নীলকর এই ১০,০০০ বিঘাতেই নীলচাষ সম্ভবপর করত মাত্র ২০,০০০ টাকা খরচ করে, অর্থাৎ বিঘা প্রতি দুই টাকা দাদন দিয়ে। স্বভাবতই নীলকর চাইত যত কম খরচে ও কম ঝুঁকি বয়ে যত বেশি লাভ করা যায়। তাই তার নিজ-আবাদের চাইতে রায়তী-আবাদের পরিমাণ ছিল অনেক বেশি।

লেঃ গভর্নরের রিপোর্টে এই বিষয়ে স্পষ্ট স্বীকৃতি আছে। তাঁর রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, "সকলের মতে নীলকরের পক্ষে রায়তী-চাষের চাইতে নিজ-আবাদ অনেক লোকসানজনক, সুতরাং নিজ-চাষ অনেক কমে গিয়েছে। তাই বিখ্যাত বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানির লক্ষ্য হচ্ছে তাদের নিজ-চাষ কমিয়ে দেওয়া এবং রায়তী-চাষ বাড়িয়ে দেওয়া।" (Buckland : 'Bengal under the Lt. Governors,' Vol. I, p. 246)

প্রতি বিঘায় ১০ থেকে ১২ বাণ্ডিল করে নীল হত, এবং ১০০০ বাণ্ডিলে ৫ মণ নীল রং প্রস্তুত হত। (Indigo Commission's Report, p. 10) মোটামুটি বলা যেতে পারে যে এক বিঘা জমিতে ১০ বাণ্ডিল নীল গাছ হত, ১০ বাণ্ডিল গাছ থেকে ২ সের নীল রং প্রস্তুত হত, আর ঐ ২ সের নীলের দাম

ছিল ১০টাকা, অর্থাৎ প্রতি সের ৫ টাকা, প্রতি মণ ২০০ টাকা। "কিন্তু এই ১০ বাণ্ডিল নীল গাছের জন্য, টাকায় ৪ বাণ্ডিল দরে, চাষী ২ টাকা ৮ আনার বেশি পেত না।" (ঐ, পৃঃ ১৫) ১০ বাণ্ডিল গাছ থেকে রং প্রস্তুত করতে নীলকরের ১ টাকার অনেক কম লাগত। যদি ১ টাকাই ধরা যায়, (ঐ, পৃঃ ২১) তাহলে তার ২ সের নীলের জন্য মোট খরচ হত ৩ টাকা ৮ আনা আর এই ২ সের নীলের দাম পেত সে ১০ টাকা। সুতরাং তার লাভ থাকত ২ সেরে ৬ টাকা ৮ আনা। এবং ১ মণ নীল রংয়ে (যার দাম ২০০টাকা) সে লাভ করত ১৩০ টাকা।

ওয়াট্‌স্ অনেক রকমের হিসাবপত্র পরীক্ষা করে বলেছেন যে, "সব লেখকই এই একই মত দিয়েছেন যে নীল রং প্রস্তুত করা একটা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা।" [৫৭] তারপর ওয়াট্‌স্ আর একটা হিসাব দেখিয়েছেন: "১,৫০০ একর নীল চাষ হয়, বিহারের এই রকম একটা কুঠি যে হিসাব দিয়েছে তাতে দেখা যায় যে জমিদারকে খাজনা দিতে হয়েছে ৬৯,০০০ টাকা, কিন্তু কোম্পানি যে খাজনা আদায় করেছে চাষীদের কাছ থেকে তা হচ্ছে ৭০,০০০ টাকা, সুতরাং খাজনা বাবদ যে টাকা খরচ হয় গ্রামের লোকরাই তার চাইতে অনেক বেশি দিয়েছে। ৩ জন ইউরোপীয়ান ম্যানেজারের বেতন, আর সকলের বেতন ও অন্যান্য সব রকমের খরচ ধরে এই কোম্পানির মোট ব্যয় হয়েছে ১,২০,০০০ টাকা। যে পরিমাণ নীল প্রস্তুত হয়েছিল তা হল ১,১৫০ মণ, যা মণপ্রতি ২০০ টাকা দরে বিক্রি হল ২,৩০,০০০ টাকায়; এর থেকে যদি শতকরা ১০ টাকা মূলধনের উপর সুদ ও শতকরা আরও ১০ টাকা রিজার্ভ ফাণ্ডের জন্য রাখা হয়, তাহলেও দেখা যায় যে এই কুঠি শতকরা প্রায় ১০০ টাকা লাভ দিয়েছে। এই তথ্যগুলি থেকে প্রমাণিত হয় নীল ব্যবসা কি অসম্ভব রকমের লাভজনক।" [৫৮]

ওয়াট্‌স সব রকমের ভদ্রতা বাঁচিয়ে হিসেব করে নীল-ব্যবসায়ে লাভ দেখিয়েছেন ১০০টাকায় ১০০টাকা—নীল-কমিশন যে পরিমাণ লাভ দেখিয়েছেন তার থেকে কিছু বেশি। আসলে কিন্তু নীলকরদের লাভ এর চাইতে অনেক বেশিই হত। প্রথমত নীল রংয়ের বাজার দাম ধরা হয়েছে ২০০ টাকা, কিন্তু উৎকৃষ্ট নীলের দাম ছিল ২৩০ টাকা কিংবা তারও বেশি, এবং বাংলা দেশের নীল উৎকৃষ্টই হত। সমসাময়িক 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' [৫৯] নামক একটি ভারতীয় পত্রিকায় যে হিসাব বার হয়েছিল তাতে দেখা যায় যে নীলকর যে

পরিমাণ নীল গাছের জন্য চাষীদের ২০০ টাকা দিচ্ছে, সেই গাছ থেকে সে ১,৯৫০ টাকার নীল রং পাচ্ছে। যদি রং প্রস্তুত করতে ২০০ টাকা খরচ ধরা হয়, তাহলেও দেখা যায় যে নীলকর মাত্র ৪০০টাকা খরচ করে লাভ করছে ১,৭৫০ টাকা। বাস্তবিক পক্ষে নীলকরদের লাভটা এই রকম অত্যধিক উচ্চ হারেই হত।

আমেরিকায় প্ল্যানটেশনের প্রভুরা ক্রীতদাস কিনে তাদের চাষের কাজে লাগাত। তাছাড়া আমেরিকায় আমেরিকানরাই ছিল প্রভু, তারা আফ্রিকা থেকে নিগ্রো ক্রীতদাস কিনে আনত। বাংলা দেশে বিদেশীরা প্রভু হয়ে এল। আমেরিকান প্রভুদের ক্রীতদাস কিনবার জন্য টাকা খরচ করতে হত; বাংলা দেশে ইংরেজ প্রভুদের কোনো টাকাই খরচ করতে হত না। মাত্র দু টাকা দাদন দিয়ে তারা কৃষককে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে ফেলত। কৃষকের নিকট নীলচাষ যত বেশি ক্ষতিকর হত নীলকরের পক্ষে তা ততটা লাভজনক হত।

এসলী ইডেন দাদনের প্রসঙ্গে নীল কমিশনকে বলেছিলেন, "প্রথমত এটা কখনই হতে পারে না যে রায়ত নীলচাষে গুরুতর লোকসান জেনেও নিজের ইচ্ছায় নীলচাষ করতে সম্মত হয়, (২) নীলচাষে নীলকরের এমন সাংঘাতিক হস্তক্ষেপ হয় যে, কোনো স্বাধীন ব্যক্তি তাতে সম্মত হতে পারে না; (৩) চাষীদের যে বলপূর্বক নীলচাষ করতে বাধ্য করা হয় তা ফৌজদারী আদালতের নথী-পত্রগুলি থেকে প্রমাণ হয়; (৪) নীলকররা নিজেরাই স্বীকার করেছে যে রায়তদের যদি স্বাধীনতা থাকত তাহলে তারা নীলচাষ করত না; (৫) রায়তদের সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীনে আনার জন্যই নীলকররা জমিদারী কিনবার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করে, কারণ জমিদারী না পেলে চাষীকে বাধ্য করার ক্ষমতা লাভ হয় না একথা নীলকররা নিজেরাই বলেছে; (৬) যে মুহূর্তে রায়তরা বুঝতে পারল যে তারা আইনত ও প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ব্যক্তি, তারা সেই মুহূর্তে নীলচাষ করা বন্ধ করে দিল।" [৬০]

এইভাবে জোরজবরদস্তি করে যে নীল ব্যবসা শুরু হয় তা যে নীলকরদের পক্ষে কত বেশি লাভজনক ছিল নীল-কমিশন তা ভাল করেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। "নীল আমাদের একটা অত্যন্ত মূল্যবান রপ্তানি দ্রব্য। ইংল্যাণ্ডে ও বিদেশে এটা একটা মূল্যবান বস্তু। ভারতের এই অংশে যে নীল তৈরি হয় তা খুবই উঁচু দরের, বিশেষ করে

নদীয়া ও যশোহরে যে নীল হয় তা বোধ হয় পৃথিবীতে সব থেকে ভাল।...ভারতের এই অংশে প্রতি বছর গড়পড়তা ১,০৫,০০০ মণ নীল রং প্রস্তুত হয় আর তার দাম হয় ২ কোটি টাকা অথবা ২ মিলিয়ন পাউণ্ড।" [৬১]

নীল ভারতের ঔপনিবেশিক বাণিজ্যে কতবড় স্থান অধিকার করত তা নিচের তথ্যগুলি থেকেই বোঝা যায়—

কলকাতা দিয়ে ১৮৫৮-৫৯ সালে যেসব প্রধান দ্রব্যের আমদানি হয়েছিল টাকায় তার হিসাব এই: বস্ত্র—৪,৬০,৫৩,৯২৫; সুতা—৯১,৯৬,৭২৩; ধাতু দ্রব্য—৫৯,৯২,৭৫৪; ধাতু—৫৭,৭৫,৪১১; কলকব্জা—৪৯,৯৪,৫০৯; মদ—৪৪,২২,৮৭৭; লবণ—২৫,৯৩,০৭৫ ইত্যাদি। মোট আমদানি ১৭,৫০,৭০,৮৬৯ টাকা।

কলকাতা দিয়ে ঐ সালে যে সব প্রধান দ্রব্যের রপ্তানি হয়েছিল টাকায় তার হিসাব এই: আফিং—৫,১৭,৪৬,৩০২; নীল—১,৭৪,৫৮,৭৭১; খাদ্যশস্য—১,৫৬,৭৮,৭০১; চিনি—১,৪৫,৯৭,০৩৭; রেশম—(কাঁচা ও কাপড়) ১,০৫,০২,১৬০; গানিব্যাগ—৫৯,৯৭,৯৬৪; পাট—৫২,৫১,৪৯০ ইত্যাদি। মোট রপ্তানি—১৮,০৮,৭৭,০৯৩ টাকা। ('Hindu Patriot', 16 June, 1860) এই তথ্যগুলি থেকে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষণীয় এই যে, এই সময় পর্যন্ত (১৮৬০) ভারতবর্ষে অর্থনৈতিকভাবে বুর্জোয়াদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বড় একটা পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। বরং দেখা যায় যে ইংরেজরা ভারতবর্ষকে একটা বুর্জোয়াবিহীন পুরোমাত্রায় ঔপনিবেশিক দেশে পরিণত করে ফেলেছে এবং ভারতবর্ষের কাজ হচ্ছে শিল্পোন্নতি নয়, ইংল্যাণ্ডকে কাঁচা মাল ও খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা আর ইংল্যাণ্ড থেকে শিল্পদ্রব্য ক্রয় করা ও বছর বছর কোটি কোটি টাকা সাম্রাজ্যবাদীদের 'ট্রিবিউট' দেওয়া।

এখন দেখা যাক, যে নীল-ব্যবসা করে ইংরেজ বণিকরা এত মুনাফা করতে লাগল, তার চাষ করে ভারতীয় কৃষকদের কি লাভ-লোকসান হল। নীল-কমিশনের নিকট বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাসলী ইডেন যে দুই বিঘা নীল-চাষের একটি তুলনামূলক লাভ-লোকসানের হিসাব দিয়েছেন তার থেকেই ব্যাপারটা খুব পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। [৬২]

তামাকের জমিতে নীল উৎপাদনের খরচ

	টা-আ-পা
খাজনা	৩-০-০
৮ মাসের লাঙ্গলের খরচ (টাকাপ্রতি ২ লাঙ্গল)...	৮-০-০
সার	১-০-০
বীজ	০-১০-০
নিড়ান	০-৪-০
গাছকাটা ...	০-৮-০
মোট	১৩-৬-০
মূল্য (২০ বাণ্ডিল— টাকায় ৫ বাণ্ডিল দরে) ...	৪-০-০
নীল চাষীর লোকসান ...	৯-৬-০

ঐ একই জমিতে তামাক উৎপাদনের খরচ

	টা-আ-পা
খাজনা	৩-০-০
লাঙ্গল	৮-০-০
নিড়ান	৬-০-০
সার	১-০-০
অন্যান্য খরচ ...	৫-০-০
মোট ...	২৩-০-০
সেচ ...	১-০-০
	২৪-০-০
মূল্য (৫ টাকা দরে ৭ মণ) ...	৩৫-০-০
তামাক চাষীর লাভ ...	১১-০-০

এই তথ্যগুলির উপর ইডেন মন্তব্য করছেন: "রায়ত নিজের জমিতে স্বাধীনভাবে তামাক চাষ করতে পারলে সে যা লাভ করতে পারত তার সঙ্গে তার নীলচাষের জন্য যা ক্ষতি হয়েছে—এ দুটো যদি যোগ দেওয়া যায় তাহলে তার সর্বসমেত ক্ষতি হচ্ছে ২০ টাকা ৬ আনা। আর একটা কথা হচ্ছে যে, তামাকের যে দর ধরা হয়েছে (৫ টাকা) তা হচ্ছে পুরনো দর। ১৮৫৮ সালে তামাকের দর হচ্ছে ১৮ টাকা মণ; এই দর ধরলে তামাক চাষের জন্য রায়তের লাভ হত ১০১ টাকা ১৪ আনা।"

এর পর ইডেন এক বিঘা ধানের জমিতে নীলচাষের তুলনামূলক খরচের তথ্য দিয়েছেন :

নীল	টা-আ-পা
খাজনা	১-০-০
বীজ	-১০-০
লাঙ্গল	১-০-০
স্ট্যাম্প	-২-০
মই	-২-০
নিড়ান	-৮-০
দস্তুরী	-৪-০
মোট	৩-১৪-০
মূল্য (টাকায় ৫ বাণ্ডিল দরে ১০ বাণ্ডিল)...	২-০-০
রায়তের ক্ষতি ...	১-১৪-০

ধান	টা-আ-পা
খাজনা	১-০-০
বীজ	-১২-০
লাঙ্গল	১-০-০
নিড়ান	-৯-০
কাটা	-৮-০
মই	-৪-০
মোট	৪-১-০
মূল্য (১০ মন ধান ১ টাকা দরে)...	১৩-৮-০
দর ...	১-০-০
	১৪-৮-০
মোট লাভ ...	১০-৭-০

ওয়াইজ নামক একজন নীলকর নীল-কমিশনকে বলেছিল যে তার ৬৫,০০০ বিঘার নীলচাষ আছে ও সে এর জন্য প্রতি বৎসর মাত্র ২০,০০০ টাকা দাদন দেয়।[৬৩] হিসাব করে দেখা যায় যে ওয়াইজ খুব কম করে ৬৫০ মণ নীল প্রস্তুত করত (১০০ বিঘায় ১ মন হারে) এবং এর দাম হত (মন প্রতি ২০০ টাকা করে) খুব কম করে ১,৩০,০০০ টাকা। দাদনের টাকা চাষীর কোনদিনই শোধ হত না। সুতরাং দাদনের বাবদ নীলকরকে মোটা টাকা প্রতি বছর খরচ করতে হত না। নীল রং প্রস্তুত করার জন্য ও তার খরচ খুব কমই হত। যে সব কর্মচারী নীলকরের জন্য সারা বছর কাজ করত তাদের সংখ্যা ২৫।৩০ জনের বেশি হত না। কেবলমাত্র যখন রং প্রস্তুতের সময় হত তখন ২০০ থেকে ৩০০ লোক নিযুক্ত হত। আমলাদের মাইনে খুব সামান্যই ছিল, ১০ থেকে ৩০ টাকা মাসে; আর মজুররা পেত ৪ থেকে

১০ টাকা। সুতরাং কুঠি-পরিচালনা করবার জন্ত নীলকরদের বছরে অতি সামান্তই খরচ করতে হত।

নীলচাষীদের এই প্রকার দাসত্ব ও তাদের দুরবস্থার কথা নীলকররাও ঢেকে রাখতে পারে নি। বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানির মোল্লাহাটি কুঠির ম্যানেজার নীল-কমিশনকে বলেছিল যে ১৮৫৯ সালে তার ২৩,২০০ জন নীলচাষীর মধ্যে মাত্র ২,৪৪৮ জনের অতিরিক্ত টাকা পাওনা হয়েছিল, আর বাদবাকি সকলেরই দেনা রয়ে গিয়েছিল। একজন ইংরেজ লেখক হিসেবপত্র পরীক্ষা করে বলেছেন যে "এর থেকে আমরা দেখতে পাই যে রায়ত নীলচাষ থেকে কিছুই লাভ করতে পারে না। নীল থেকে সে কোনো দিক দিয়েই লাভবান হয় না—স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও না, টাকাপয়সার দিক দিয়েও না, তার সুখ সুবিধার দিক দিয়েও না। নীলের বদলে একটা কিছু আবিষ্কার হলে সে বেঁচে যেত।" [৬৪]

নীল-কমিশন তাঁদের রিপোর্টে মোল্লাহাটির লরমুরের খাতা থেকে ৩ জনের ১৮৫৯ সালের দেনা-পাওনার হিসাব তুলে দিয়েছেন। [৬৫]

১। তাজু মণ্ডল, আলমপুর (৩॥ বিঘা)

জমা—	টা-আ-পা	খরচ—	টা-আ-পা
নীলগাছ বাবদ		১৮৫৮-এর বাকি	৩৬-৬-১
(টাকায় ৬ বাণ্ডিল দরে)	১১-৪-০	দাদন (১৮৫৯)—	৩-০-০
বীজ ...	০-৪-০	স্ট্যাম্প ...	০-৫-০
		চাষের খরচ ...	০-১০-০
মোট—	১১-৮-০	গাছ কাটার খরচ	০-৮-০
		বীজ ...	১-১২-০
		গাড়ি ...	০-১৩-০
		মোট—	৪৩-৬-১
			১১-৮-০
		রায়তের বাকি	৩১-১৪-১

২। হানিফ মুন্সী মণ্ডল, গাজীপুর (৩ বিঘা)

জমা—		খরচ—	
নীলগাছ (টাকায় ৬ বাণ্ডিল)	৩-৬-৮	১৮৫৮র বাকি ...	৬৭-৩-০
বীজ ...	০-৪-০	দাদন ...	২-৮-০
মোট—	৩-১০-৮	স্ট্যাম্প ...	০-৮-০
		নিড়ান ...	০-১-৩
		গাছকাটা ...	০-৮-০
		বীজ ...	১-৪-০
		গাড়ি ...	০-৪-৩
		মোট—	৭২-৪-৬
			৩-১০-৮
		রায়তের বাকি	৬৮-৯-১০

৩। হরচাঁদ মণ্ডল, কানাসাল (৪ বিঘা)

জমা—		খরচ—	
নীলগাছ বাবদ (টাকায় ৬ বাণ্ডিল দরে)	৬-৪-৩	১৮৫৮র বাকি ...	৫৯-০-০
		দাদন (১৮৫৯) ...	২-৮-০
		স্ট্যাম্প ...	০-৮-০
		কাটা ...	০-৮-০
		বীজ ...	২-২-০
		গাড়ি ...	০-৭-৬
		মোট—	৬৫-৪-৬
			৬-৪-৩
		রায়তের বাকি	৫৯-০-৩

নীলচাষ যে রায়তকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যেত তা উপরের তথ্য-গুলি থেকে বেশ ভালভাবেই বোঝা যায়। তাই অধ্যাপক চাকলাদার তাঁর 'Fifty Years Ago' নামক প্রবন্ধে বলেছেন, "রায়তের পক্ষে নীলচাষ ছিল সম্পূর্ণভাবে লোকসানজনক আর তার পরিবারের পক্ষে তার অর্থ হত অনশন। নীলকরদের উদ্দেশ্য ছিল খুবই স্পষ্ট, একেবারে নিম্নতম খরচে, অথবা কোনো খরচ না করেই, সর্বোচ্চ মুনাফা করা। নীলচাষীকে সে নাম-

মাত্র মূল্যটাও না দিয়ে নীলগাছগুলি নিয়ে নিত। আর যদি ঐ নামমাত্র মূল্যটা চাষীকে দেওয়াও হত, তাহলেও নীলচাষ চাষীর পক্ষে হত অনেক ক্ষতিকর। তারপর আবার এই নামমাত্র মূল্যটা থেকে অনেক কিছু কাটা হত—আমলারা তাতে এত বেশি ভাগ বসাত এবং নীলগাছ ওজন করবার সময় এত অসৎ উপায় অবলম্বন করা হত যে এই নামমাত্র মূল্যটাও শূন্যের কোঠায় এসে পৌছত। রায়ত যদি কোনোমতে নীলের জমি থেকে আর কিছু না হোক, অন্তত খাজনাটাও তুলতে পারত তাহলে নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করত।...আরও দেখতে হবে যে, যখন আর সব দ্রব্যের দাম দ্বিগুণ, কিংবা প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছে, তখন নীলের জন্য যে দাম দেওয়া হত অথবা নামমাত্র দেওয়া হত, তা এক পয়সাও বাড়ে নি।" [৬৬]

১৮৫৬ সালে কলকাতায় এক মিশনারী কনফারেন্সে রেভারেণ্ড কুথবার্ট, যিনি অনেকদিন কৃষ্ণনগরে বাস করেছিলেন ও নীল-সমস্যা সম্বন্ধে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, বলেছিলেন যে, "নীলকরদের রাতারাতি বড়লোক হবার লোভটাই হচ্ছে নীলচাষের অপকারিতার কারণ। আমাদের ধর্মগ্রন্থে আছে যে মানুষের টাকার লোভটাই অনেক অনিষ্টের কারণ; বাংলা দেশের নীল ব্যবসায়ে এর কুফল ভাল করেই ফলছে। যদি নীলকররা একটা অনতিরিক্ত লাভ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকত, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে নীলচাষে এত অন্যায়-অবিচার হত না। রায়তের উপর কোনো অত্যাচার বা অবিচার না করেও নীলকর অনায়াসে শতকরা ২৫ টাকা লাভ করতে পারে কিন্তু যেহেতু সে আরও অনেক বেশি মুনাফা চায়, তারই জন্য এত অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়।" [৬৭]

নীলচাষে চাষীর যেমন সবদিক দিয়ে ক্ষতি হত, সাধারণ বছরে আর যে-কোনো ফসলের চাষে জমিদার মহাজনদের শোষণ সত্ত্বেও, তার কিছু না কিছু লাভ হতই। মাঝারি রকমের জমিতে ধানচাষে কৃষকের খরচ হত প্রতি বিঘায় ৪ টাকা, আর সে ধান পেত ৮ মণ, যার মূল্য ছিল ৮ টাকা; অর্থাৎ তার লাভ থাকত ৪ টাকা। নীল-কমিশনের সাক্ষ্যে মরেল বলেছিলেন যে তাঁর সুন্দরবনের জমিদারীতে প্রতি বিঘা ধানের জমিতে খরচ হয় ৭টাকা ৫আনা ৭॥পাই, আর ফসল হয় ১১টাকার, অর্থাৎ চাষীর লাভ হয় ৩ টাকা ১০ আনা ৪॥ পাই। [৬৮] ওয়াটস্ দেখিয়েছেন যে ভাল জমিতে ধানচাষের লাভ হত প্রতি বিঘায় ১০টাকা। [৬৯] বিহারের আফিং-চাষীরা বিঘা প্রতি লাভ করত ১১ টাকা ১২ আনা। [৭০]

নীল-কৃষকদের আর একটা বড় অভিযোগ ছিল যে জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধির জন্য একজন কৃষক অন্যান্য যে কোনো ফসলের জন্য বেশি মূল্য পাচ্ছিল, কেবলমাত্র তার নীলগাছের দাম পূর্বেও যা ছিল এখনও তাই রয়ে গেল। এর উপর আবার তার সব থেকে ভাল জমি ও তার বেশির ভাগ কাজের সময় তাকে নীলচাষের জন্য নিয়োগ করতে হত।

মূল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে ছোটলাট তাঁর রিপোর্টে যা বলেছিলেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : "নীল-সংকট চরমে ওঠার সব থেকে বড় কারণ হল সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধি। এটা জানা কথা যে সব কৃষিজাত দ্রব্যেরই মূল্য গত তিন বছরে দ্বিগুণ কিংবা প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছে। দিন মজুরের মজুরি ও গরু বলদ পোষার খরচও একই রকমে বেড়ে গিয়েছে।...এবং যেহেতু এই একটিমাত্র দ্রব্যের কোনো প্রকার মূল্যবৃদ্ধি হয় নি, এইটেই হচ্ছে সব থেকে বড কারণ যা রায়তের কাছে নীলচাষের অপকারিতাগুলিকে দ্বিগুণভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। চাষীর টাকার ক্ষতিটা ডবল হল ও অন্যান্য ক্ষতিগুলোও একই হারে বেড়ে গেল।...এবং চাষীরা একেবারে খোলাখুলি বিদ্রোহ না করা পর্যন্ত নীলকররা নীলগাছের দাম বাড়াবার কথা একদিনের জন্যও চিন্তা করে নি।" [৭১]

বাংলাদেশে যেভাবে নীলচাষ হত তার অপকারিতা সম্বন্ধে আর একটা গুরুতর দিক আলোচনা করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে একজন ইংরেজ লেখক হিসেব করে দেখিয়েছিলেন যে, বাংলাদেশে ২০ লক্ষ ৪০হাজার বিঘা শ্রেষ্ঠ জমিতে নীলচাষ করা হয় এবং তিনি এর উপর এই মন্তব্য করেছিলেন যে, "এর অর্থ হচ্ছে অর্ধ মিলিয়নের অনেক বেশি জমি খাদ্য-শস্য উৎপাদন থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং তা হয়েছে এমন একটা দেশে যেখানে দুর্ভিক্ষ স্থায়ী হয়ে দাঁড়িয়েছে।" নীলচাষের পূর্বে নদীয়া, যশোহর, ২৪ পরগনা, রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ, এই সব জেলাগুলি সমৃদ্ধশালী ও জনাকীর্ণ ছিল; নীলচাষের পর এই জেলাগুলি অবহেলিত অবস্থায় পড়ে থাকল।

নীল-বিদ্রোহের পর মাদ্রাজে নীলচাষ খুব দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই মাদ্রাজের উৎপাদন বাংলার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ হয়েছিল। মাদ্রাজ, বিহার ও অযোধ্যায় নীলচাষের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে এই সব স্থানে খাদ্যশস্য হয়ে যাবার পর নীলচাষের শুরু হত। বাংলাদেশে ঠিক তার উল্টো—যখন ধানচাষের সময়, ঠিক তখনই আবার নীলচাষেরও সময়। বাংলাদেশে নীলচাষের সঙ্গে ধানচাষের কেবলমাত্র সংঘর্ষই বাধত না.

নীলচাষ জমির পক্ষেও খুব ক্ষতিকর হত। পক্ষান্তরে, মাদ্রাজ, বিহার, অযোধ্যায় ফসলের আবর্তনের (rotation of crops) ফলে জমির উপকার হত।

চাষীকে লুণ্ঠন করার জন্য নীলকর আরও অনেক উপায় অবলম্বন করত। নীলগাছ কাটার পর চাষীকেই সেগুলি গরুর গাড়ি করে অথবা নৌকা করে কুঠিতে নিজের খরচে পৌঁছে দিতে হত। নীলকর চাষীকে এর জন্য কিছুই দিত না। এই জন্য চাষীকে ধারে গরুর গাড়ি ভাড়া করতে হত। নীল-কমিশন এবিষয়ে বলেছিলেন যে, "এর জন্য চাষীর ঋণ বেড়ে যায়। যানবাহনের খরচ কুঠিরই দেওয়া উচিত, চাষীর নয়।" [৭৩]

নদীয়া জেলায় হাতিয়ার একজন কৃষক সবির বিশ্বাস নীল-কমিশনকে বলেছিলেন যে তিনি ১০৬ বিঘা জমির মালিক, "নীলকরের মাপ অনুসারে আমাকে ৭ বিঘায় নীলচাষ করতে হয়, আসলে সেটা হচ্ছে ১১ বিঘা। কোনো কোনো বছরে তারা আমাকে এক টাকা, কি দু টাকা দাদন দেয়, কিন্তু কুঠির আমলারাই তার সব নিয়ে নেয়। কুঠি থেকে আমার ফসলের জন্য কোনোদিন আমি একটি পয়সা পাই নি। গত বছর আমি ২৫ নৌকা ভর্তি নীলগাছ দিয়েছিলাম, তারা বলে এক নৌকায় ৩।৪ বাণ্ডিল গাছ ধরে, আমি বলি এক নৌকায় ১২।১৬ বাণ্ডিল গাছ ধরে।" [৭৪]

নদীয়ার বাজিমাজু গ্রামের আর একজন কৃষক, মীরজান মণ্ডল বলেছিলেন, "নীলকর হচ্ছে একাধারে নীলকর, জমিদার ও মহাজন। মহাজনদের কাছে বাজার দর হচ্ছে টাকায় ১৪ থেকে ১৬ কাঠা ধান, কিন্তু নীলকর সেখানে দেয় মাত্র ৮ কাঠা এবং আমরা নীলকর ছাড়া অন্য কোনো মহাজনের কাছ থেকে ধার করতে পারি না। আমার আর একটা অভিযোগ হচ্ছে যে গত কার্তিক মাসে নীলকর আমার ৭০০ বাঁশ কেটে নিয়ে গিয়েছে। তারজন্য সে এখনও কিছুই দেয় নি। যদিও বা দেয়, তাহলে দেবে ১০০ বাঁশের জন্য মাত্র ৪ আনা।" [৭৫]

মীরজান মণ্ডল একটা অত্যন্ত খাঁটি কথা বলে ফেলেছেন, নীলকর একাধারে নীলকর, জমিদার ও মহাজন। সঙ্গে সঙ্গে সে আবার শাসক-শ্রেণীভুক্ত। ঔপনিবেশিক-তন্ত্রের সে হচ্ছে একটি চমৎকার প্রতীক। নীলচাষের অর্থনীতি হল পুরোমাত্রায় ঔপনিবেশিক অর্থনীতি, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অর্থনীতি নয়। নীলকরকে যাঁরা শিল্পবিপ্লব ও কৃষিবিপ্লবের ধারক ও বাহক হিসাবে দেখেছিলেন অথবা এখনও দেখেন তাঁদের কল্পনাশক্তি প্রশংসনীয় হতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিক বাস্তববোধের অভাব আছে।

নীলকরের তাণ্ডব

১৮৩৩ সালের সনদে ইউরোপীয়রা বাংলাদেশে জমি কিনে জমিদার রূপে বসবাস করবার অধিকার পেল। এর পরেই ইংরেজ বণিক ও নীলকরদের অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান কলকাতায় গড়ে উঠল। ১৮৩৫ সালে স্থাপিত হল 'বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স', ১৮৩৭ সালে হল 'নীলকর সমিতি'। এর কিছুদিন পরে 'দি ল্যাণ্ড হোল্ডার্স অ্যাণ্ড কমার্শিয়াল এসোশিয়েশন অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া' নামে আর একটা বৃহত্তর সংগঠন জন্ম নিল, যার মধ্যে নীলকর সমিতিই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করল। ১৮৩৩ সালের পূর্বে নীলকররা রায়তদের প্রতি অত্যাচার আর জমিদারদের সঙ্গে বিবাদবিসংবাদ তো করতই, তাছাড়া নিজেদের মধ্যেও এলাকার অধিকার নিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা করত। নীলকর সমিতি প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে তাদের নিজেদের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষ প্রায় একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল, এবং এক-এক অঞ্চলে নীলকররা একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসল। পূর্বে নীলকররা নিজেদের মধ্যে বিবাদ ও দাঙ্গাহাঙ্গামায় ব্যস্ত থাকায় অনেক সময় প্রজারা তাদের আক্রোশ থেকে কিছুটা বেঁচে যেত। ১৮৩৩ সালে 'নীলকর সমিতি' স্থাপিত হবার পর তাদের আত্মকলহ বন্ধ হয়ে গেল ও নীলচাষীরা পুরোমাত্রায় ভূমিদাসে পরিণত হল।

"কোনো কোনো জমিদার জমির উচ্চ দর পাইয়া নীলকরদের তাহা বিক্রয় করে" (যোগেশ বাগল : 'জাতি-বৈর', পৃঃ ৯৫)। আবার অনেক ক্ষেত্রে কোনো কোনো জমিদার নীলকরদের নিকট জমি বিক্রি করতে অসম্মত হয় ও তার ফলে অনেক জমিদারের সঙ্গে নীলকরদের দাঙ্গা হাঙ্গামা ও মামলা-মোকদ্দমা চলতেই থাকে। এখন থেকে নীলকরদের 'নিজ' জমিতে মজুর লাগিয়ে নীলচাষের পরিমাণ যদিও অনেক বেড়ে গেল, তবুও দাদনী জমিতে রায়তদের দ্বারা নীল-চাষ অনেক বেশি লাভজনক হওয়াতে. নীলকররা দাদনী জমির প্রতিই বেশি করে জোর দিল, যার ফলে দাদনী জমির মালিকদের উপর তাদের অত্যাচার আগের মতোই চলতে থাকল। যেখানে নিজ আবাদের জন্য নীলকরের খরচ হত প্রতি বিঘা ৬ টাকা ১৪ আনা ৬ পাই, সেখানে রায়তী আবাদের জন্য তার খরচ হত মাত্র ২ টাকা ৩ আনা, অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশেরও কম। (Indigo Commission's Report, Evidence, p. 193-201) চাষীদের লুণ্ঠন করার নীল-

করদের আরো একটা পন্থা ছিল। বাংলাদেশে সরকারী ও সাধারণভাবে একবিঘা জমির মাপ ছিল ১৪,০০০ বর্গ ফুট। কিন্তু নীলকররা এই মাপ মেনে চলত না, তাদের মাপ ছিল ২১,৫১১ বর্গ ফুট, অর্থাৎ দেড়গুণেরও বেশি। "নীলচাষীরা ভাল করেই জানত যে নীলচাষের জন্য নীলকর যে ভাবে জমি মেপে দেবে তাই তাকে মেনে নিতে হবে।" (ঐ পৃঃ ২০২)

রানাঘাটের জমিদার জয়চাঁদ পাল চৌধুরী যাঁর জমিদারিতে ১৮৫৭ সাল পর্যন্তও ৪৪,০০০ বিঘা পরিমাণ জমিতে নীলচাষ হত—'ইণ্ডিগো কমিশনে'র নিকট সাক্ষ্যদানকালে বলেছিলেন যেখানে ৮ খানা লাঙ্গলের (মজুর সমেত) বাজার দর ছিল এক টাকা, সেখানে নীলকরদের দাম ছিল মাত্র অর্ধেক অর্থাৎ টাকায় ১৬ খানা। তারপর জয়চাঁদ স্বীকার করলেন যে "সব নীলকরই ঐ দর দিত, সুতারাং আমিও তাই দিতাম।...নীলচাষে রায়তের কোনই লাভ থাকে না।" [৭৬] জয়চাঁদের মতে 'নিজ' চাষের জন্য নীলকরকে খুব কম করে খরচ করতে হত—লাঙ্গল দেবার জন্য মজুরি ১ টাকা ৮ আনা, নিড়ানী ৬ আনা, চৌকিদারী ট্যাক্স ৬ আনা, বীজ একটাকা ৪ আনা, ফসল কাটা ও গরুর গাড়ি ৮ আনা, জমির খাজনা ১ টাকা ৪ আনা, মোট ৫ টাকা ৪ আনা। জয়চাঁদের মতে নদীয়া, যশোহর, হুগলীতে গড়পড়তা বিঘা প্রতি ১৬ বাণ্ডিল নীল গাছ হত (১০০০ বাণ্ডিল গাছ থেকে ৬ মণ নীল রং প্রস্তুত হত আর প্রতিমণ নীল নীলকররা বিক্রি করত ২৫০ টাকায়)। জয়চাঁদ একজন সাধারণ রায়তের উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, এই চাষীটির দুই বিঘা নীলচাষ করতে খরচ হয় খুব কম করে ১০ টাকা ১৩ আনা। (তাছাড়া চাষীকে জরিমানা ইত্যাদি বাবদ আরও খরচ করতে হত, যেমন গরুর অনধিকার প্রবেশের জন্য গরু-পিছু প্রতিদিন ৬ আনা। এই খরচগুলি হিসেবের খাতায় উঠত না, কারণ গরু ছাড়িয়ে আনার জন্য সঙ্গে সঙ্গে চাষীকে এই টাকা দিতে হত)। তারপর, তার ফসলের জন্য চাষী কি পেত ? তার ফসল হয়েছে ৩২ বাণ্ডিল ; টাকায় ৮ বাণ্ডিল দরে তার দাম হয় ৪ টাকা। যেখানে তাকে ফসল তৈরি করার জন্য খরচ করতে হয়েছে ১০ টাকা ১৩ আনা, সেখানে সে পাচ্ছে মাত্র ৪ টাকা, আর তার লোকসান হচ্ছে ৬ টাকা ১৩ আনা। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, রায়ত তার মজুরির জন্য কিছুই পাচ্ছে না, অর্থাৎ নীলকরের জন্য তাকে সারা বছর ধরে নিছক বেগার খেটে দিতে হচ্ছে। এতসব লোকসানের পরও চাষীকে আমলাদের 'দস্তুরি' কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দিতে হত, যার পরিমাণ দাঁড়াত

৮ থেকে ১০ আনা। এই পন্থায় যে চাষী নীলকরের কাছে একবার দাদন নিয়েছে, সেই দাদন আর কোনোকালেই শোধ হত না। [৭৭]

জয়চাঁদ পাল চৌধুরী আরও বলেন যে নীলচাষের প্রথমাবস্থায় চাষীদের অবস্থা এতটা খারাপ ছিল না, কারণ তখন দাদনের টাকা প্রতি বৎসর শোধ হয়ে যেত, তারপর আবার নিজের ইচ্ছামতো চাষীরা নতুন করে দাদন নিত। তাছাড়া, তখন রায়তের দেড় বিঘা নীলচাষ করলেই যথেষ্ট হত, কিন্তু এখন তাকে অন্তত ৬ বিঘা করে নীলের জন্য দিতে হয়; বর্তমানে 'নিজ' চাষের তুলনায় রায়তী চাষের পরিমাণ অনেক বেড়ে গিয়েছে। নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও রায়ত হয়তো একবিঘা নীলচাষে রাজী হত নীলকরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য। "নীলচাষ করার জন্য রায়তকে সারা বৎসর ধরে সমস্ত সময় তার জন্যই দিতে হয়, তার অন্যান্য ফসলের চাষকে উপেক্ষা করে।" তাহলে এতদিন ধরে চাষীরা নীলচাষ করছে কেন—এই প্রশ্নের উত্তরে জয়চাঁদ বলেছিলেন, "তার কারণ নীলকরদের অসংখ্য রকমের অত্যাচার ও বলপ্রয়োগ যথা, তাদের গুদামে আটক রাখা, তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, তাদের উপর মারপিট, ইত্যাদি।...আমি অনেক সময় নীলকরদের বলেছি চাষীদের উপর জুলুম না করতে, কিন্তু তারা আমার কথা মোটেই শোনে নি।" [৭৮]

নীলকররা কেবল চাষীদের উপর জুলুম করেই ক্ষান্ত হত না। জমিদারদেরও তারা ছেড়ে দিত না। নদীয়া ও যশোহরের জমিদার লতাফত হোসেন তার একটি সুন্দর উদাহরণ। কাঁচি কাটা ও সিদুঁরিয়া কুঠির নীলকররা অনেক দিন থেকে তাঁর বড ভাইদের কাছ থেকে জমি ইজারা নেবার চেষ্টা করছিল। তাঁর ভাইরা যখন মারা যান লতাফত তখন বালক ছিলেন—এই সুযোগে কাঁচিকাটার নীলকর লতাফতের বড় ভাই তাকে জমির ইজারা দিয়ে গিয়েছে এই দাবি জানিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে নালিশ করল। আদালতে নীলকরের পাট্টা জাল বলে প্রমাণিত হল। আদালতে হেরে গিয়ে নীলকর ৩০০ লাঠিয়াল নিয়ে লতাফতের কাছারি আক্রমণ করে জ্বালিয়ে দিল। ১৮৪৪ সালের সেপ্টেম্বরে নীলকরের কয়েকজন লোকের সামান্য শাস্তি হল। অনবরত দাঙ্গাহাঙ্গামা চলতেই থাকল। ১৮৪৬ সালে নীলকরের ভাড়াটিয়া লাঠিয়ালরা লতাফতকে আক্রমণ করে তার তিনজন লোককে খুন করল, আর অনেককে জখম করল। আদালতে আবার নীলকরের কয়েকজন লোকের সামান্য শাস্তি হল। এর কিছুদিন পর ৭২৫

বিঘা, ৫৫০ বিঘা ও ৩৫০ বিঘা জমি দাবি করে আদালতে নীলকর আবার হাজির হল। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে নীলকররা ৩৯,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে লতাফতের বিরুদ্ধে আরও একটা মামলা আনল। [৭৯]

কিভাবে কৃষককে জোর করে দাদন দেওয়া হত সে বিষয়ে ১৮৬০ সালের জুন মাসের 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় এই বিবরণীটি বেরিয়েছিল, "একজন নীলকর একটি গ্রামের ইজারা পাওয়া মাত্রই, তার প্রধান কাজ হয় গ্রামে কয়টি লাঙ্গল আছে তা স্থির করা, তারপর দ্বিতীয় কাজ হল প্রত্যেকটি লাঙ্গল প্রতি দুই বিঘা নীলচাষ করার জন্য সব রায়তকে বাধ্য করা।" লাঙ্গল সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য নীলকর নিজে সোজাসুজি চাষীর নিকট গিয়ে খবর নেয় না। সে "একমুহূর্ত সময় নষ্ট না করে গ্রামের কর্মকারকে গ্রেপ্তার করে কুঠিতে নিয়ে আসে।" কারণ একমাত্র সেই জানে গ্রামে কার কার কাছে কয়টি লাঙ্গল আছে। "এইভাবে সমস্ত খবর নেবার পর রায়তদের ডেকে পাঠান হয় ও তারপর এক এক জন করে প্রত্যেক রায়তকে বিঘা প্রতি দুই টাকা করে দাদন দেওয়া হয় এবং প্রত্যেককে লাঙ্গল প্রতি দুই থেকে ছয় বিঘা করে নীলচাষ করতে বলা হয়; তখন একটা সাদা স্ট্যাম্প-কাগজে তাদের দিয়ে সই করিয়ে নেওয়া হয় নয়তো বুড়ো আঙুলের ছাপ নেওয়া হয়। তারপর কুঠির লোক মাঠে মাঠে গিয়ে ভাল ভাল জমিগুলিকে বেছে কুঠির চিহ্ন বসিয়ে দেয়। সে সব জমিগুলি কোনো একটা মূল্যবান ফসল তৈরি করার জন্য চাষীরা প্রস্তুত করছিল।"

এই প্রসঙ্গে শান্তিপুরের একজন জার্মান পাদ্রী সি, বমভাইট্‌স ১৮৬০ সালে ১৭ই এপ্রিলে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ (২৮শে এপ্রিল ১৮৬০) যে চিঠিখানা লিখে-ছিলেন, তাতেও নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী পাওয়া যায়: "৮ বৎসর পূর্বে যখন আমার আগেকার কর্মস্থল সোলোতে বাস করছিলাম ও যখন আর্চিবল্ড হিল্‌স্ আশেপাশের তালুকগুলি নিয়ে নেবার চেষ্টা করছেন, তখন ১০ জন, ২০ জন, এমনকি ৫০ জন করে ঐ সব গ্রামের মণ্ডলরা আমার কাছে এসেছিল এবং এই সব গ্রামগুলিকে নীলকরদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আমি যাতে তালুকগুলি কিনে নিই তার জন্য অতিশয় পেড়াপীড়ি করেছিল। তারা এও বলেছিল যে যদি আমি তালুকগুলি কিনতে রাজী হই, তাহলে তারা তার খরচের অর্ধেক টাকা তুলে আমাকে উপহার দেবে। এমনকি তালুক-দাররা পর্যন্ত আমাকে বলে পাঠালেন যে আমি যেন তাঁদের তালুকগুলি কিনে

নিই। তাঁদের মধ্যে একজন—যিনি নীলকরের লাঠিয়ালদের দ্বারা নিজের বাড়িতেই ঘেরাও হয়ে ছিলেন ; গভীর রাত্রে বিপদ অগ্রাহ্য করে ২৫ জন রায়ত সঙ্গে করে আমার বাড়িতে এসে অনুরোধ করলেন যে আমি যেন তাঁর অভিযোগটা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পৌছে দিই ; তাঁর অভিযোগ ছিল যে তিনি নীলকরকে তাঁর তালুক বিক্রি করে দিচ্ছেন এই কথাটা নীলকর জোর করে তাঁকে দিয়ে সই করে নিতে চান। আমি ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেছিলাম, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি।...এর কিছুদিন আগে নীলকরের লাঠিয়ালরা চাষীদের ৫০ টা গরু দুপুর বেলায় ধরে নিয়ে চলে যায় এবং এই গরু চুরির মোকদ্দমা কৃষ্ণনগরের আদালতে চলা অবস্থাতেই চাষীদের জমিতে চাষীদের দিয়েই জোর করে নীলচাষ করিয়ে নেওয়া হচ্ছিল। কিছুদিন বাদে তালুকগুলি নিশ্চিন্দপুর কুঠির অধীনে চলে গেল। রায়তরা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ল। মেলিয়াপোতা, পাথরঘাটা ও গোবিন্দপুরের চাষীরা যারা পূর্বে কোনোদিন নীলচাষ করেনি আবার তারা আমাকে তাদের নীলকরদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য অনুরোধ করল। এই সব অত্যাচার করার কৌশলগুলি তখন আমি বুঝতে পারিনি, কিন্তু এখন বুঝতে পরি। যখন নীলকর শুনতে পেল যে মণ্ডলরা আমার বাড়িতে এসেছিল, সে—তাদের দণ্ডমুণ্ডের নতুন কর্তা—পাদ্রীর কাছে যাবার অপরাধে তাদের ২৫ টাকা জরিমানা করল। স্বভাবতই এর পর থেকে তারা আর আমার কাছে আসেনি এবং দাদনও তারা নিতে বাধ্য হল —প্রথমবার ও শেষবারের জন্য (শেষবারের জন্য এই কারণে যে প্রথমবার টাকা নেবার পর তারা আর কোনো টাকা পায় নি)। এইভাবে প্রতি বৎসর অত্যধিক খরচ করে নীলচাষ করতে তারা দণ্ডিত হল ; তাদের লোকসান ও সর্বনাশ শুরু হল।”

মেলিয়াপোতার লোকেরা ছিল খ্রীষ্টান ; তারা নীল বুনতে অস্বীকার করেছিল, ভেবেছিল যে তাদের পাদ্রী বোমভাইটস তাদের রক্ষা করবেন। “একদিন যখন আমি দূরে একজন মিশনারি বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, সেই সুযোগে নীলকর মিঃ স্মিথ্ গ্রামে এসে চাষীদের বলল যে, তারা যদি নীলচাষ করতে রাজী না হয় তাহলে ‘এক মুহূর্তের মধ্যে গ্রাম ধ্বংস করে দেবে।’ রায়তদের নীলচাষ করতে বাধ্য হতে হল, তখন তখনই তাদের দাদন দিয়ে দেওয়া হল...এবং চুক্তির খাতায় তাদের নাম লিখে নেওয়া হল। এই ছোট অনুষ্ঠানটুকু শেষ হলে পর, দাবি করা হয় যে রায়ত চুক্তি-বদ্ধ হয়েছে

ও ভবিষ্যতে কোন দাদন না পেয়েও সারা জীবন ধরে সে নীলচাষ করতে বাধ্য। আরও একটা কথা—নীলকর ও রায়ত উভয়ের মৃত্যুর পরও এ ধরনের চুক্তি কখনও ভেঙ্গে দেওয়া যায় না। নতুন নীলকর স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরেই নেয় যে মৃতচাষীর সন্তানও, কোন প্রকারের নতুন চুক্তি না সত্ত্বেও, সারাজীবন ধরে নীলচাষ করতে বাধ্য। আমি কয়েকটা উদাহরণ জানি যেখানে পৌত্ররা পিতামহের চুক্তিপত্রের উত্তরাধিকারী হয়েছে।"

বমভাইটস্ তারপর লিখেছেন, "চুক্তিপত্র সই করার সময় যারা উপস্থিত ছিল না, দাদনের টাকা তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল ও কোনরকম আড়ম্বর না করে চুক্তি-খাতায় তাদের নাম তুলে নেওয়া হয়েছিল। এইরকম একজন লোক হচ্ছে একটি গরিব অথচ সম্ভ্রান্ত খ্রীষ্টান। দেড় বিঘা জমি চাষের জন্য তার নিকট তিন টাকা পাঠান হয়েছিল। ক্রমশঃ এই দেড় বিঘা জমি তিন বিঘায় পরিণত হল, উপরন্তু কোন দাদনও মিলল না। এই তিন বিঘা আবার কুঠির বিঘা,—পাঁচ জমিদারী-বিঘার সমান। গত বছর এই লোকটি ১৬ গাড়ি নীলগাছ কুঠিতে পৌছিয়ে দিয়েছিল, কুঠির ওজন অনুসারে সেটা হল ১২ বাণ্ডিল, যার জন্য তাকে দেওয়া হল ৩ টাকা। কুঠির আমলারা এর থেকে তাকে শেষ পর্যন্ত কত বাড়ি নিয়ে যেতে দিয়েছিল তা আমার ঠিক মনে নেই, কিন্তু তার খরচের হিসাব আমার সামনে রয়েছে, তা হচ্ছে ১৭ টাকা ৫ আনা। কিন্তু আপনারা মনে রাখবেন যে, সে খুব ভালোয় ভালোয় নিষ্কৃতি পেয়েছিল। আমার সামনে আরও ৪০০০ হিসাব রয়েছে—যা যে কোন ব্যক্তিকে স্তম্ভিত করে দেবে। বর্তমানে এই ধরনের বহু লোককে নিশ্চিন্দপুরের নিকট দামুরহুদার কুঠির গুদামে কয়েদ করে রাখা হয়েছে এবং তাদের উপর অনেক রকমের পাশবিক অত্যাচার হচ্ছে যাতে তারা স্বীকার করে যে তারা দাদন নিয়েছে ও নীলচাষ করবে।"

কাপাসডাঙ্গার পাদ্রী ফ্রেডারিক স্যুড় নীল-কমিশনের সাক্ষ্যে বলেন যে "১৮৫৬ সালে একদিন বিকাল ৪ টার সময় আমি যখন লিখছিলাম, তখন ২।৩ জন লোক দৌড়ে এসে বলল যে লাঠিয়ালরা খ্রীষ্টানদের গরুবাছুর সব নিয়ে যাচ্ছে। ঘোড়ায় চড়ে তখনই আমি কুঠির দিকে ছুটলাম। বাজারের কাছে এসে দেখতে পেলাম ৩৫টা আন্দাজ গরু নিয়ে যাওয়া হচ্ছে; লাঠিয়ালরা আমাকে দেখেই ছুটে পালিয়ে গেল। যে সব খ্রীষ্টান আমার পিছনে আসছিল তারা গরুগুলিকে নিয়ে গেল। তখন আমাকে একজন বলল,

নদীর ধার দিয়ে লাঠিয়ালরা আর একদল গরু নিয়ে যাচ্ছে। আমি সেইদিকে গেলাম ও স্কুলের কাছে এসে দেখলাম একজন আমিন আর ৮ জন লাঠিয়াল গোটা চল্লিশেক গরু নিয়ে যাচ্ছে। আমিন আমাকে দেখবামাত্রই লাঠিয়ালদের বলল 'সাহেবকো মারো'; দুবার সে এই কথা বলেছিল। আমি ঘোড়া ফিরিয়ে চলে গেলাম।" বাড়ি পৌঁছে স্মৃড় নীলকরকে চিঠি লিখলেন; খুব কড়াভাবে নীলকর উত্তর দিল যে তিনি যেন এতে নাক না গলান। তখন স্মৃড় ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখলেন। ৩ দিন পরে পুলিশ আসল, এবং বহু মাইল দূরে দামুরহুদা থানায় সেই গরুগুলি খুঁজে পেল। স্মৃড় নীলকরের অত্যাচারের আরও অনেক উদাহরণ দেন: "রায়তরা যখন মাঠে তাদের কাজে খুব ব্যস্ত থাকে, তখন তাদের নীলকরের জমিতে কাজ করবার জন্য ডাকা হয়; তৎক্ষণাৎ না গেলে তাদের উপর মারপিট করা হয়। এর জন্য রায়তরা তাদের ধান, আখ, তামাক ইত্যাদি কিছুই চাষ করতে পারে না।" [৮০]

নীলচাষীদের ১৮৫০ সালের পূর্বের অবস্থা বর্ণনা করে দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ১৮৫০ সালে অক্ষয়-কুমার দত্ত লিখেছিলেন, "নীলকরদিগের কার্যের বিবরণ করিতে হইলে প্রজা-পীড়নেরই বিবরণ লিখিতে হয়। তাঁহারা দুই প্রকারে নীল প্রাপ্ত হয়েন, প্রজাদিগকে অগ্রিম মূল্য দিয়া তাঁহাদের নীল ক্রয় করেন, এবং আপনার ভূমি কর্ষণ করিয়া নীল প্রস্তুত করেন। সরলস্বভাব সাধু ব্যক্তিরা মনে করিতে পারেন ইহাতে দোষ কি? কিন্তু লোকের কত ক্লেশ, কত আশাভঙ্গ, কতদিন অনশন, কত যন্ত্রণা যে এই উত্তরের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, তাহা ক্রমে ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে। এই উভয়ই প্রজানাশের দুই অমোঘ উপায়। নীল প্রস্তুত করা প্রজাদিগের মানস নহে। নীলকর তাহাদিগকে বল দ্বারা তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত করেন, ও নীলবীজ বপনার্থে তাহার দিগের উত্তমোত্তম ভূমি নির্দিষ্ট করিয়া দেন। দ্রব্যের উচিত পণ প্রদান করা তাঁহার রীতি নহে, অতএব তিনি প্রজাদিগের নীলের অত্যল্প মূল্য ধার্য করেন। নীলকর সাহেব স্বাধিকারের একাধিপতিরূপ, তিনি মনে করিলেই প্রজাদিগের সর্বস্ব হরণ করিতে পারেন, তবে অনুগ্রহ করিয়া দাদন স্বরূপে যৎকিঞ্চিত যাহা প্রদান করিতে অনুমতি করেন, গোমস্তা ও অন্যান্য আমলাদের দস্তুরি ও হিসাবাদি উপলক্ষে তাহারও কোন্ না অর্দ্ধাংশ কর্তন যায়? একারণ প্রজারা যে ভূমিতে ধান্য ও অন্যান্য শস্য বপন করিলে অনায়াসে সংবৎসর পরিবার প্রতিপালন করিয়া কাল যাপন

করিতে পারে, তাহাতে নীলকর সাহেবের নীল বপন করিলে তার লাভ দূরে থাকুক, তাহাদিগের দুশ্ছেদ্য ঋণজালে বদ্ধ হইতে হয়। অতএব তাহারা কোনক্রমেই স্বেচ্ছানুসারে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। বিশেষতঃ কৃষিকার্যই তাহাদের উপজীব্য, ভূমিই তাহাদের একমাত্র সম্পত্তি এবং তাহারই উপর তাহাদের সমুদয় আশাভরসা নির্ভর করে। কোন ব্যক্তি এমত সঞ্চিত ধনে জলাঞ্জলি দিয়া আত্মবধ করিতে চাহে? কিন্তু তাহাদের কি উপায়ন্তর আছে? প্রবল প্রতাপান্বিত মহাবল-পরাক্রান্ত নীলকর সাহেবের অনিবার্য অনুমতির অন্যথাচরণ করা কি দীন দরিদ্র ক্ষুদ্র প্রজাদিগের সাধ্য? তাহারা অশ্রুপূর্ণ নয়নে সভয়ে মনের বেদনা নিবেদন করুক বা অতীব কাতর হইয়া আর্তনাদ নিঃসরপুরঃসর তাহাদের পদানত হউক, কিছুতেই তাহাদের চিত্তভূমি করুণারসে আর্দ্র হয় না—কিছুতেই তাহাদের অবিচলিত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় না। তাঁহারা এইরূপ ব্যবহার করিয়াও আপনাদিগকে নির্দয় জ্ঞান করেন না;…দীন দুঃখী প্রজারা এ প্রকার পৌরুষবাক্য শ্রবণ করিলে আর কি করিতে পারে? তাহার দিগকে স্বীয়ভূমিতেই অবশ্যই নীল বপন করিতে হয়। প্রত্যক্ষ দেখিয়াও স্বহস্তে গরল পান করিতে হয়। এই ভূমির নাম খাতাই জমি—খাতাই জমির প্রসঙ্গ মাত্রে প্রজাদের শোকসাগর উচ্ছলিত হইয়া উঠে।" [৮১]

নীল-কমিশনের কাছে সাক্ষ্যদান কালে বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট এসলী ইডেন সরকারী নথিপত্র ঘেঁটে ১৮৩০ থেকে ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত খুন, ডাকাতি, দাঙ্গা, লুট, আগুন লাগান ও লোক-হরণের ৪৯টি অত্যন্ত গুরুতর ঘটনার একটা তালিকা তৈরি করে কমিশনের নিকট পেশ করেছিলেন। ইডেন তারপর বলেছিলেন "আরও কতকগুলি পাশবিক ঘটনার আর একটা তালিকা আপনাদের দিচ্ছি, যে ঘটনাগুলি ১৮১০ সালের পূর্বে নীলচাষের ব্যাপারে ঘটেছিল। এর থেকেই দেখা যাবে যে নীলচাষের প্রথম থেকেই এই সব পাশবিক অত্যাচার শুরু হয়, যার জন্য তখন ৫ জন ইউরোপীয়ানকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল ও তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।" অতঃপর ইডেন তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এই রকম অত্যাচারের কতকগুলি উদাহরণ দেন: "একটি হচ্ছে রাজসাহী জেলায় বাঁশবেড়িয়ায় শ্যামপুর কুঠির ঘটনা। একজন লোককে ঐ কুঠির গুদামে কয়েদ রাখা হয়েছিল, সেই অবস্থায় সেখানে সে মারা যায়; কুঠির চাকররা তখন তার গলায় ইঁট বেঁধে তার দেহটা একটা ঝিলে ডুবিয়ে দেয়।…সেখানকার জজের নিকট ঐ চাকরগুলির কিছু শাস্তি হয়, কিন্তু

নিজামত আদালতে তারা খালাস পেয়ে যায় এই কারণে যে যদিও নিঃসন্দেহে ঐ লোকটির কুঠির গুদামে আটক থাকাকালেই মৃত্যু হয়েছিল, তথাপি সঠিক কি কারণে তার মৃত্যু হল তা নির্ণয় করা গেল না, সুতরাং যারা তার দেহটাকে লুকোবার চেষ্টা করেছিল তাদের শাস্তি দিয়ে লাভ নেই।"

ইডেন তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আর একটি ঘটনার উল্লেখ করেন: "আওরঙ্গবাদ মহকুমায় আমি যখন বদলি হলাম, আমি সেখানে দেখলাম যে, যেসব চাষীরা নীল বুনতে রাজী হয় না নীলকররা তাদের গরুবাছুর নিয়মিতভাবে ধরে নিয়ে যেয়ে আটকে রেখে দেয়। এর ফলে রায়তদের খুবই ক্ষতি হচ্ছিল। আমি তদন্ত করে একটা স্থানের কথা জানতে পারলাম। একদল পুলিশ পাঠিয়ে সেখান থেকে ৩০০ গরু উদ্ধার করলাম ও আমার নিজের বাড়িতে নিয়ে আসলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও নীলকরের ভয়ে কয়েকদিন পর্যন্ত চাষীরা গরুগুলি দাবি করতে ও নিয়ে যেতে সাহস করেনি।" [৮২]

ইডেনের এই কথাগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে নীলকররা সরকারের চাইতেও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল; কৃষকরা এটা বুঝতে পেরেছিল যে সাধারণত সরকার তাদের নীলকরদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে চায় না, আর যদিও বা দু-একজন ম্যাজিস্ট্রেট তার একটু-আধটু চেষ্টা করেন তাহলেও নীলকরদের হাত থেকে তাদের নিস্তার নেই।

ককবার্ণ বহুবছর নীলকর ছিলেন ও পরে মুর্শিদাবাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। তিনি বলেছিলেন: "যেসব নীলকর জমিদার হয়েছে তারা প্রজা-রক্ষার আইনের কথা শুনলে হাসে। কোন আইনই তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যায় না এই কারণে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রজার সব কিছু নীলকরের মুঠোর মধ্যে রয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রজা আইনের সাহায্য নিতে সাহসই করবে না।" [৮৩]

রামমোহন ও দ্বারকানাথ স্বপ্ন দেখেছিলেন যে নীলকররা জমিদার হলে দেশের উন্নতি হবে। বাস্তবিক পক্ষে তারা জমিদার হবার পর থেকে তাদের দৌরাত্ম্যও অত্যাচার তিন গুণ বেড়ে গেল এবং কৃষকদের দাসত্বও সেই অনুপাতে দৃঢ়তর হল। নীলকর আর শুধুমাত্র নীলকর রইল না—সে হল একইসঙ্গে নীলকর, জমিদার ও মহাজন। দেশীয় জমিদার ও মহাজনদের চাইতে সে হয়ে দাঁড়াল আরও অনেক বেশি অত্যাচারী ও শোষণকারী জমিদার মহাজন। নীলকর জমিদার হিসাবে কোনো ক্ষেত্রে চাষীদের কাছ থেকে দেশীয় জমিদারের চাইতে কম

খাজনা আদায় করে নি ; [৮৪] আর দেশীয় মহাজনদের চাইতে তার সুদের হার ছিল ডবল। [৮৫] তার উপর নীলকর সমস্ত রকমের নৃশংস অপরাধ করেও, এমনকি খুন-খারাবি, ডাকাতি-রাহাজানি করেও নিস্তার পেয়ে যেত। সে ছিল আইনের ঊর্ধ্বে। মর্ত্যরাজ্যের ম্যাজিস্ট্রেট অথবা স্বর্গরাজ্যের ভগবান কাউকেই সে তোয়াক্কা করত না। সে সত্যই ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই-এর মতো বলতে পারত, "রাষ্ট্র? সে তো আমি!" এইরকম চরম ঔপনিবেশিক অবস্থা শিল্প-বিপ্লব, অথবা কৃষি-বিপ্লবের অবস্থা নয়।

একাধারে নীলকর, জমিদার ও মহাজন হওয়াতে নীলকরের স্বৈরাচারী বীভৎস অত্যাচার ও তাণ্ডবের কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না। দেলাতুর ১৮৪৮ সালে ফরিদপুরে ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। নীল-কমিশনের সামনে সাক্ষ্যে তিনি বলেছিলেন: "এমন একটা বাক্স নীল ইংলণ্ডে পৌঁছয় না যেটা মানুষের রক্তে রঞ্জিত নয়—এই উক্তির জন্য মিশনারিদের দোষ দেওয়া হয়েছে। এই উক্তি আমারও উক্তি। ফরিদপুর জেলায় ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন আমি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তা থেকে আমি জোর দিয়েই বলতে চাই যে কথাটা সম্পূর্ণভাবে সত্য। আমি কয়েকজন রায়তকে দেখেছি যাদের দেহ বল্লম দিয়ে এপিঠ-ওপিঠ ভেদ করে দেওয়া হয়েছিল। কয়েকজন রায়তকে আমার সামনে আনা হয়েছিল যাদের নীলকর ফোর্ড গুলি করে মেরেছিল। আমি আরও কয়েকজন রায়তের কথা জানি যাদের সড়কি দিয়ে জখম করে হরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।" [৮৬]

ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও নীলকরদের সম্বন্ধে এই ধরনের উক্তি অনেকেই করে-ছিলেন। লেয়ার্ড বলেছিলেন: "নীলকররা অসহায় কৃষকের জমি দখল করেছে, তারা সশস্ত্র হয়ে কৃষকের বাড়িতে প্রবেশ করেছে, তার বাড়ি ধ্বংস করেছে, গাছ কেটে ফেলেছে, বাগানের গাছ উপড়ে ফেলেছে—যারা বাধা দেবার চেষ্টা করেছে তাদের কাউকে খুন করেছে, কাউকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে নিজেদের তৈরি জেলে কয়েদ করে রেখেছে। দেশময় এমন একটা উদ্দাম অরাজকতা বিরাজ করছে, যে কোনো সভ্য দেশে যার তুলনা মেলে না।" [৮৭]

এত রকমের পৈশাচিক অত্যাচার ও বেআইনী কাজ যে ইউরোপীয়রা অবাধে করে যেতে পারত তার অন্যতম কারণ ছিল এই যে ফৌজদারী মামলায় মফস্বলের আদালতগুলির ইউরোপীয়দের বিচার করার কোনো অধিকার ছিল না—কেবলমাত্র কলকাতায় সুপ্রিমকোর্টই তাদের বিচার

করতে পারত। তাছাড়া মফস্বলের আদালতগুলির সংখ্যাও এত কম ছিল আর সেগুলি এত দূরে দূরে অবস্থিত ছিল যে এই কারণেও অনেকে নীলকরদের ও তাদের ভারতীয় কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারত না। ১৮৩৩ সালের সনদে ইউরোপীয়রা এদেশে বসবাস ও অবাধ বাণিজ্যের অধিকার পাবার পর থেকে তারা অধিক সংখ্যায় নানা রকমের ব্যবসাবাণিজ্য ও চা, নীলচাষ ইত্যাদির জন্য বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করতে থাকে। ক্রমশ তাদের অত্যাচার ও বেআইনী কাজের মাত্রাও বেড়ে যেতে থাকে। ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশকে এরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনত না। অনেক সময় উপরওয়ালাদের সঙ্গে খাতির থাকায় এদের ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশরাও ঘাঁটাতে সাহস করত না। কিন্তু নিরঙ্কুশভাবে এদের অত্যাচার, উপদ্রব চলতে থাকায়, সরকারী কর্মচারীরাও এদের হাত থেকে রেহাই পেত না, যার ফলে দেশের মধ্যে একধারে যেমন অরাজকতা বেড়ে যেতে লাগল, অন্যধারে তেমনি শাসনকার্যেরও যথেষ্ট ক্ষতি হতে লাগল। এই সময়কার বিচার-পদ্ধতির মধ্যেও বড় একটা শৃংখলা ছিল না।

সরকার মাঝে মাঝে আদালতের সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করত, কিন্তু সে কাজ বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে নি। এই রকম একটা আদালত যখন যশোহর জেলার লোহাগড়ায় স্থাপন করা হল, তখন নীলকর ম্যাকআর্থার সরকারের নিকট প্রতিবাদ জানাল যে একটা অদালত ও একটা নীলকুঠি একই যায়গায় পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে না। এর কিছুদিন পরে ম্যাক-আর্থারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসল যে সে বলাই শেখ ও আরও কয়েকজনকে হরণ করে আটক রেখেছে। দেড় মাস ধরে খোঁজখবর নিয়ে তাদের সম্বন্ধে কিছুই জানা গেল না। একদিন ম্যাজিস্ট্রেট যখন ম্যাকআর্থারের বাড়ি যাচ্ছিলেন তখন হঠাৎ জানতে পারলেন বলাই শেখকে গুদামে আটক রাখা হয়েছে। ম্যাকআর্থারকে ডেকে গুদাম খুলিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট বলাই শেখ ও আরও কয়েক জনকে মুক্ত করলেন। বলাই নীলকরের অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল, আর অন্যদের অপরাধ যে, নীলকর জমিদারের বিরুদ্ধে তার একটা জমি দখল করার জন্য তাদের মিথ্যা সাক্ষী দিতে বলেছিল, কিন্তু তাতে তারা রাজী হয় নি। (৮৮)

তখনকার দিনে বিচার ও আদালতের ব্যবস্থা কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে ভূদেব মুখোপাধ্যায় একটা সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন :

"কলিকাতা সুপ্রিমকোর্টে এবং সদর দেওয়ানী ও তদধীন যাবতীয় কোর্টে একপ্রকার পরস্পর বিদ্বেষভাব ছিল। মফস্বলে কোন আদালত যদি কোন নীলকর বা কোন সওদাগর সাহেবের প্রতি হস্তার্পণ করিতে যাইতেন, অমনি ঐ আদালতের বিচারপতির বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে নালিশ হইত এবং ঐ নালিশের খরচার দায়ে বিচারপতি পীড়িত হইতেন। এইজন্য গভর্নমেণ্ট ঐ সময়ে এমত নিয়ম করেন যে, সুপ্রিমকোর্টের খরচার টাকা সরকার হইতেই দেওয়া হইবে। গভর্নমেণ্ট এরূপ নিয়ম করিয়া রাখিয়াছেন যে, সুপ্রিমকোর্টের সমক্ষে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হইবে সে মোকদ্দমা আর কোম্পানির কোন আদালত গ্রহণ করিতে পারিবে না। কিন্তু সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিরা ওরূপ কোন নিয়ম করেন নাই। যে মোকদ্দমা কোম্পানির আদালতে রুজু আছে তাঁহারা সে মোকদ্দমা আপনারা বিচার করিবার নিমিত্ত গ্রহণ করিতেন। এই সকল কারণে কোম্পানির আদালতগুলি বিলক্ষণ অবমানিত ও হীনবল হইয়াছিল। বিশেষতঃ ইংরেজরা কোম্পানির আদালতের অধীন ছিলেন না এবং ঐ সকল আদালতের কোন তোয়াক্কাই রাখিতেন না। এক দেশের মধ্যে থাকিয়া কতকগুলি প্রজা এক আদালতের অধীনে এবং কতকগুলি তাহার অধীনে নয় এরূপ ব্যাপার সহজেই নিতান্ত বিসদৃশ। তাহাতে আবার অনেক ইংরেজ মফস্বলে থাকিয়া কৃষি বাণিজ্যাদি নির্বাহ করেন, এদেশীয়দের সহিত সকল প্রকার কাজকারবার করেন অথচ এদেশীয়েরা যে আদালতের অধীনে সে আদালতকে মান্য করেন না, এরূপ করাতে যৎপরোনাস্তি বিশৃঙ্খলা ঘটে।" [৮৯]

এই সব বিশৃঙ্খলা ও বিচারবৈষম্য কিছুটা দূরীভূত করার উদ্দেশ্যে ১৮৪৯ সালে ভারত-সরকারের আইনসচিব ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন (সাধারণত 'বেথুন' বলে পরিচিত) একটি নতুন আইনের পাণ্ডুলিপি রচনা করেন। প্রস্তাবিত আইন অনুসারে মফস্বলের ফৌজদারী আদালতে ইউরোপীয়দের বিচার হতে পারবে ও জুরীদ্বারা বিচার হবে, কিন্তু এই আদালতগুলি তাদের মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবে না। অর্থাৎ একটি অতি সাধারণ আইনের খসড়া, যারদ্বারা বিচারবৈষম্য সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় না ও ইংরেজদের বিশেষ সুবিধাগুলি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় না। কিন্তু এই খসড়া আইনের কথা জানা মাত্র কলকাতার ও মফস্বলের ইউরোপীয় সমাজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তাদের 'বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স', 'নীলকর সংঘ', জমিদার ও বণিকসংঘ, তাদের পরিচালনাধীন সমস্ত ইংরেজী

সংবাদপত্রগুলি এই খসড়া আইনকে 'কালাকানুন' (Black Act) নাম দিয়ে তার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করল, যার ফলে সরকার এই আইনের খসড়াটি প্রত্যাহার করে নিল। এসময়ে বাঙালীরাও চুপ করে বসে ছিল না। তারাও এই খসড়া আইনের সপক্ষে নানাভাবে সমর্থন জানাল। বিখ্যাত বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ তখন ভারতীয় সভার সভাপতি ও বাংলার রাজনৈতিক নেতা। প্রস্তাবিত আইনকে সমর্থন করে তিনি অনেক বক্তৃতা দিলেন ও 'Black Act' নামে একখানি পুস্তিকাও প্রকাশ করলেন। রামগোপাল অনেক জনহিতকর ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেইরকম একটি সংগঠনের নাম ছিল 'বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল অ্যাণ্ড হরটি-কালচারাল সোসাইটি'; কেরী-প্রতিষ্ঠিত এই সংঘের রামগোপাল ছিলেন সহ-সভাপতি। প্রস্তাবিত আইনের সমর্থনে পুস্তিকা লেখবার অপরাধে ইংরেজ সমাজ তাঁর উপর এতই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল যে তাঁকে উক্ত সমিতির সহ-সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দিল।

রামগোপাল ঘোষ তাঁর পুস্তিকাতে লিখেছিলেন, "বলপূর্বক কৃষকদের ফসল দখল করার কথা, বেআইনীভাবে লাঠিয়ালদের উপস্থিতিতে চাষীর জমিতে নীলচাষ করানো, ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক রকম সংবাদ আমি পেয়েছি। নিরপরাধ রায়তদের কিভাবে সপরিবারে কুঠিতে নিয়ে গিয়ে নীলকরের খুশিমতো তাদের আটক রাখা হয় তাও শুনেছি। আমি আরও শুনেছি কি করে রায়তদের প্রহার করা হয়, এমনকি প্রহার করে হত্যাও করা হয়, বাড়িঘর ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়া হয়, গ্রামকে গ্রাম আগুন দিয়ে ভস্মীভূত করা হয় এবং ঠাণ্ডা মাথায় বন্দুক দিয়ে নরহত্যা করা হয়। নীলের চাষ করা থেকে চাষীর পক্ষে অন্য যে কোনো ফসল তৈরি করা অনেক লাভজনক। কিন্তু তার হাত পা বাঁধা, কারণ নীলচাষ করার জন্য তাকে দাদন নিতে বাধ্য করা হয়েছে।....এই সব অপরাধের জন্য যে শাস্তি তাদের পাওয়া উচিত তার থেকে যে তারা রেহাই পেয়ে যায় তার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে তারা মফস্বলের আদালতের নাগালের বাইরে।"

'কালাকানুনের' আন্দোলনের চাপে সরকারকে নতি স্বীকার করতে হল এবং তার ফলে নীলকরদের অত্যাচার আরও বেড়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্যের কি? তাদের অবাধ অত্যাচার এত চরমে উঠল যে, ১৮৫৪ সালের ২০শে এপ্রিল নদীয়া জেলার জজ-ম্যাজিস্ট্রেট স্কোন্স বাংলা সরকারের সেক্রেটারি

বীডনকে এসম্বন্ধে একটা গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট দিতে বাধ্য হলেন এবং তাতে তিনি সেক্রেটারিকে অনুরোধ করলেন যে এবিষয়ে যেন একটা তদন্ত-কমিশন শীঘ্রই বসানো হয়। তিনি লিখলেন :

"নীলচাষ সম্বন্ধে তদন্তের ব্যাপারে একটি মাত্র সোজা বিষয় সমস্ত সমস্যাটার গোড়ার কথা বলে আমার মনে হয়। অর্থাৎ রায়তরা স্বেচ্ছায়, না অনিচ্ছায় নীলচাষ করতে রাজী হয়? তারা যদি স্বেচ্ছায় চাষ করে, তার অর্থ নীলের চাষ লাভজনক ও তারা এতে সন্তুষ্ট ; আর অনিচ্ছায় চাষ করলে বোঝা যাবে যে তার মধ্যে সেখানে আছে বলপ্রয়োগ, চাষীর সর্বনাশ ও এমন চুক্তি যা পূরণ করা চলে না। সুতরাং আমি এই একটি মাত্র সোজা প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেছি যে চাষীরা স্বেচ্ছায় নীলচাষ করতে রাজী কিনা? এবং উত্তরে আমি যা জানতে পেরেছি তা হল প্রতিকারবিহীন অবিচারের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। এইকথা শোনবার সময় বারবার আমাকে বলা হয়েছে যে, এত অসংখ্য ধরনের নিষ্ঠুরতা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব।" [৯০]

এই চিঠির জন্য বাংলার লেফটেনান্ট গভর্নর ১৮৫৪ সালে ৫ই জুন এক চিঠিতে লর্ড ডালহাউসির দ্বারা সমর্থিত হয়ে স্কোন্সকে তিরস্কার করেন ; তাতে তিনি বলেন যে, নীলের ব্যাপারে দুইটি পক্ষ আছে—নীলকর ও রায়ত ; স্কোন্স মাত্র একপক্ষের কথা শুনেছেন,—'নেটিভদের' কথা ; তিনি 'সম্ভ্রান্ত' নীলকরদের কথা শোনেন নি—তাঁদের কথা যদি তিনি শুনতেন "তাহলে তাঁর মতামত ও সুপারিশ হয়তো তিনি পরিবর্তন করতে পারতেন।" ঐ চিঠিতে লেফটেনান্ট গভর্নর আরও জিজ্ঞাসা করেন, নীলকররাই কি একমাত্র অত্যাচারী, জমিদার ও মহাজনরাও কি অত্যচারী নয়? এটা কি সম্ভব, এটা কি চিন্তা করা যায় যে, যে-জেলায় ব্রিটিশ রাজ প্রতিষ্ঠিত সেখানে আইন নেই, বিচার নেই? ছোটলাটের শেষ কথা হল কোনো রকমের কমিশন বসানোর প্রয়োজন নেই। [৯১]

এই প্রসঙ্গে যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল লতিফের কাহিনীটিও খুব স্মরণীয়। ১৮৫৪ সালের ২৭শে মার্চ পচাপোড়ার কুঠির মালিক ম্যাকেঞ্জির বিরুদ্ধে এক পরোয়ানা জারি করেন যাতে তিনি নীলকরকে বলেন যে তিনি যেন রায়তদের বিরুদ্ধে লাঠিয়াল ব্যাবহার না করেন, তাদের উপর অত্যাচার না করেন ও তাদের জমিচাষ করতে বাধা না দেন। যদি তাঁর কোনো অভিযোগ থাকে, তাহলে আদালতে রায়তদের বিরুদ্ধে নালিশ করার

সব সুযোগই রয়েছে। ঐ পরোয়ানায় ম্যাকেঞ্জির দুজন [illegible]ও আদালতে হাজির হতে বলা হল—তাদের বিরুদ্ধে কয়েকটা অভিযোগের উত্তর দিতে। তারা আদালতে হাজির হয় নি। উপরন্তু ম্যাকেঞ্জি ভারত সরকারের সেক্রেটারির নিকট অভিযোগ করল যে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তার, লারমুর ও অন্যান্য নীলকরদের বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং তাঁর পরোয়ানাতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তাদের বিরুদ্ধে অপমানসূচক ভাষা ব্যবহার করেছেন। সদাশয় ইংরেজ সরকার তৎক্ষণাৎ বিষয়টির তদন্ত করতে হুকুম দিলেন। আবদুল লতিফ বললেন তিনি কোনো প্রকার অপমানসূচক ভাষা ব্যবহার করেন নি, তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা হচ্ছে "সব আদালতে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়"। তিনি আরও বললেন, "এই পরোয়ানার ভিতর দিয়ে যিনি কথা বলছেন, তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নন, তিনি হচ্ছেন ভারত সরকার; ভারত সরকারই তাঁর বিচারালয়ের মাধ্যমে কথা বলছেন। নীলকররা চান যে সরকারের সমকক্ষ হিসাবে তাঁদের সম্বোধন করা হোক, যা করা খুবই অসঙ্গত হবে। সেটাও অসঙ্গত হবে যদি আদালত গরিব ও ধনীদের জন্য ভিন্ন ভাষা ব্যবহার করেন।" [৯২]

নিজের চাকুরিকে বিপদাপন্ন করে ডেপুটিম্যাজিস্ট্রেট আবদুল লতিফ নির্ভীক-ভাবে ভারতের সেই বিপদসংকুল যুগে যে সৎসাহস দেখিয়েছিলেন তার উদাহরণ ভারতের ইতিহাসে বিরল। লতিফ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল রায়তের জন্যই সুবিচার চেয়েছিলেন। বিশেষ করে নবীনচন্দ্র ঘোষ ও আরও অন্যান্য রায়তদের উপর নীলকরের অত্যাচার বন্ধ করার জন্য তিনি ঐ পরোয়ানা জারি করেছিলেন। লতিফের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করবার জন্য যাদের উপরে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, বারাসতের জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট তাঁদের অন্যতম। তিনি তাঁর রিপোর্টে বলেন, "তিনি একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও কর্তব্যপরায়ণ সরকারী কর্মচারী" কিন্তু নীলকরদের প্রতি তিনি "অত্যন্ত অবিচার" করেছেন; অধিকন্তু, রায়তরা ছিল ফরাজী আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত (?), সুতরাং এই বিষয়ে তাঁর আরও সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত ছিল।

নীল-কমিশনের নিকট সাক্ষ্যদান কালে ১৮৬০ সালে নদীয়া জেলার অস্থায়ী ম্যাজিস্ট্রেট ডবলিউ. যে. হের্সেল্ এই সময়কার নীলকরদের অত্যাচারের একটা লম্বা তালিকা দিয়েছিলেন ('ইণ্ডিগো কমিশন রিপোর্ট' পরিশিষ্ট নং ১১), তা থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া গেল :

১। ১৮৫৫ সালের এপ্রিল মাসে নীলকর ব্রোড্রিকের লাঠিয়ালদের সঙ্গে রায়তদের এক লড়াই হয়। তাতে রায়ত বিষ্ণু ঘোষকে খুন করা হয় ও তার শব গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়। বিচারে শান্তিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এটাকে সাজানো মামলা বলে ডিসমিস করে দেন। এর বিরুদ্ধে আপিল হলে, সেসন জজ, এই বলে আপিল নাকচ করেছেন যে ম্যাজিস্ট্রেট এ বিষয়ে তদন্ত করেছিলেন।

২। ১৮৫৫-এর জুলাই নীলকর ডম্বাল ১৫০ জন লাঠিয়াল নিয়ে ইস্কান্দারপুর গ্রাম আক্রমণ করে লুট করে, কারণ ওখানকার রায়তরা নীলচাষ করার জন্য দাদন নিতে অস্বীকার করেছিল। অসংখ্য কৃষক এই দাঙ্গায় গুরুতর রূপে আহত হয়। মামলা হলে পর ডম্বাল নিজে নির্দোষ প্রমাণিত হল, কিন্তু তার পাঁচ জন লোকের ১ বৎসর কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা জরিমানা হল। ডাম্বলের পুত্র—যে আক্রমণ পরিচালনা করেছিল, তাকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে উপস্থিত হতে বললেন এবং তাকে জামিনও দিলেন, কিন্তু সে আদালতে হাজির হয় নি। সেসন কোর্টে আপিলে সকল অপরাধীকেই খালাস করে দেওয়া হয়।

নীলকরদের অনেক সময় রায়তদের ছাড়া জমিদারদের সঙ্গেও দাঙ্গাহাঙ্গামা হত, তারও কয়েকটা উদাহরণ হের্সেল দিয়েছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নীলকরদের ভয়ে ভীত না হয়ে জমিদাররা তাদের বিরুদ্ধে লড়তেন, যেমন, ১৮৫৬ সালে ডম্বালের সঙ্গে বেলপুকুরিয়ার জমিদার কালাচাঁদ ভট্টাচার্যের, ১৮৫৭ সালে লারমুরের সঙ্গে ব্রজনাথ পাল চৌধুরীর, ১৮৫৫ সালে কাঠুরিয়ার নীলকরের সঙ্গে জয়রামপুরের তালুকদার রামচন্দ্র রায়ের। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নীলকরেরা আক্রমণ করত, আর কৃষকরা আত্মরক্ষা করত; আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে, কৃষকরা মরিয়া হয়ে নীলকরদের আক্রমণ করত; আমরা পূর্বেও বহু ক্ষেত্রে দেখেছি, কৃষকরা বিনা প্রতিবাদে অত্যাচার সহ্য করে নি। হের্সেল তারও কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন:

(১) বেতাই নামক গ্রামের ইসুব বিশ্বাস ও বৃন্দাবন দত্তের নেতৃত্বে ৮০ জন রায়ত দুর্ধর্ষ আর্চিবল্ড হিলস্-এর নীলকুঠি আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেয়; (২) ১৮৬০ সালে গোপাল মণ্ডল ও আরও ১৫০ জন কৃষকের নামে মোকদ্দমা করা হয় যে এই লারমুরের যেসব লাঠিয়াল তাদের দাদন দিতে গিয়েছিল, তারা তাদের উপর সশস্ত্র আক্রমণ করেছিল।

ইংরেজ ব্যবসায়ীর, বিশেষ করে নীলকরদের ক্ষমতা এতই বেড়ে যেতে লাগল যে তারা সরকারকে চাপ দিতে শুরু করল যে ১৮৩০ সালের বেআইনী আইন আবার বিধিবদ্ধ করা হোক—যে আইনের দ্বারা তথাকথিত নীলচুক্তির জন্য নীলকর চাষীকে ফৌজদারী মামলার সাহায্যে জেলে আটক রাখতে পারত। যদিও এরকম বর্বর আইন কোনো সভ্য দেশে দেখা যায় না, তবুও ব্রিটিশ সরকার এই প্রশ্ন নিয়ে খুব আগ্রহের সঙ্গে ১৮৫৫ সালে অলোচনা শুরু করে দিল। কিন্তু আলোচনা চলতে চলতেই সিপাহী-বিদ্রোহ শুরু হওয়াতে তা স্থগিত রাখতে হল।

কিন্তু ইতিমধ্যে নীলকররা আর একটি অধিকার পেল যার ফলে তাদের ক্ষমতা অনেক বেড়ে গেল ও তারা অধিকতর স্বৈরাচারী হয়ে উঠল। ১৮৫৬ সালে তাদের অনেকে অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হল—যারাই অপরাধী তারাই হল বিচারক! যাহোক, নীলকরদের ক্ষমতা ও অত্যাচারের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকলেও, একটা বিষয় লক্ষণীয় যে অসহায় কৃষকরা সব সময় চুপ করে এই অত্যাচার সহ্য করে যায় নি। অনেক ক্ষেত্রে তারা নিজেরা সংঘবদ্ধভাবে নীলকরদের অত্যাচার প্রতিরোধ করেছে, সশস্ত্র সংগ্রাম করেছে, প্রাণ দিয়েছে ও দলে দলে জেলে গিয়েছে। বাংলার কৃষকশ্রেণীর মধ্যে যে একটা সুপ্ত বৈপ্লবিক শক্তি রয়েছে, নীলচাষের প্রথম থেকেই তার পরিচয় তারা দিয়েছে। ১৮৬০ সালে ব্যাপকভাবে নীলচাষীদের যে বিদ্রোহ ঘটে তার মহড়া ১৮৫৪-৫৫ সাল থেকে ভালভাবে শুরু হয়।

জমিদার ও নীলকর

১৮৩৩ সালের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদে বাংলাদেশে ইংরেজদের জমি কিনবার অধিকার দেবার পর অনেক নীলকর প্রচুর জমি কিনে বড় বড় জমিদারে রূপান্তরিত হয়েছিল। তারা এই জমি কিনেছিল জমিদারদের কাছ থেকেই। মোদ্দা কথা হচ্ছে যে টাকার লোভে অনেক জমিদার উঁচু দর পেয়ে নীলকরদের জমি বিক্রি করেছিলেন। আবার কোনো কোনো জমিদার নীলকরদের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন ও তাঁরা স্বেচ্ছায় কোনোদিন নীলকরকে জমি বিক্রি করতে চান নি। আবার অনেক জমিদার ছিলেন যাঁরা নীতিগতভাবে নীলকরকে জমি বিক্রি করার বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু নীলকরদের সঙ্গে তাঁদের ঝগড়া বাধত জমির দাম ও সেলামির টাকা নিয়ে। এমনও দেখা গিয়েছে যে অনেক জমিদার তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী শরিক কিংবা পার্শ্ববর্তী জমিদারকে জব্দ করবার জন্য নিজের এলাকায় রাজার জাতকে ডেকে এনে জমি দিয়ে বসিয়েছেন। আবার বহুক্ষেত্রে জমিদার নীলকরকে জমি দেবার বিরোধী হলেও নীলকর কিংবা ম্যাজিস্ট্রেটের ভয়ে জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন। নীল ব্যবসা খুবই লাভজনক ছিল বলে অনেক জমিদার নিজেদের জমিদারিতে নীলের চাষ প্রবর্তন করেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার নিজেদের নীলকুঠিও স্থাপন করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে নীল-কমিশন মন্তব্য করেছেন, "আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি যে জমি কিনবার ব্যাপারে নীলকরদের একমাত্র বাধা হচ্ছে জমির মূল্য নিরূপণ করা নিয়ে। এটা সত্য যে একজন প্রচুর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জমিদার, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখার্জী নিজেই ঘোষণা করেছেন যে তিনি নীতিগতভাবে ইউরোপীয়দের জমি বিক্রি করার ঘোরতর বিরোধী। এই ভদ্রলোকটি তাঁর নিজের জমিদারি সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহশীল। এবং তাঁর এলাকায় কোনো নীল বোনা হয় না বললেই চলে। বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরও নিজের বিষয়ে এই রকম মত ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু তিনি মনে করেন যে 'আলস্য, অভিজ্ঞতা ও ঋণের জন্য' দেশীয় জমিদাররা জমি পত্তনি দিতে পছন্দ করেন, কারণ এতে তাঁরা জমিদারি চালাবার হাঙ্গামা থেকে নিষ্কৃতি পান এবং এই রকম একটা নিশ্চিত রোজগারের সাহায্যে রাজধানীতে কিংবা কোনো একটা বড় শহরে বাস করতে

পারেন।” মুন্সী লতাফত হোসেনের সঙ্গে জমি নিয়ে নীলকরের বিবাদ লেগেই ছিল, “অবশেষে ১৮৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে হুকুমনামা পাঠালেন, যে হুকুমনামা হচ্ছে আমাদের মতে, নীলকরের সঙ্গে আপোস করার জন্য জমিদারকে ভীতি প্রদর্শন।...সাধারণত, আসল প্রশ্ন হচ্ছে টাকার, এবং নীলকর যদি দাবির টাকা দিতে সক্ষম হয় তাহলে তার পক্ষে পত্তনিতে জমি কেনার আর কোনো বাধা থাকে না।” জমিদার ও নীলকরের মধ্যে বিবাদে “সাধারণত এই দাঁড়ায় যে কোনো না কোনো কারণ বশতঃ জমিদার শেষ পর্যন্ত নীলকরের সঙ্গে রফা করতে বাধ্য হয়।” [৯৩] লারমুর নীল-কমিশনের সাক্ষ্যে বলেছিল যে ১৮৫০ সালের পূর্বে সহজেই জমিদারি কিনতে পারা যেত, কিন্তু তারপর থেকে জমিদাররা পূর্বের ডবল হারে সেলামি চাইতে লাগলেন। জমিদাররা খাজনাও বাড়িয়ে দিলেন; [৯৪] নীলকরদের মতে এই অত্যধিক সেলামিই যত অনিষ্টের কারণ। নীলকরদের কাছ থেকে টাকা আদায় করার জন্যই জমিদার তাঁর জমির দর চড়িয়ে দেন, এবং এই দর না পেলে তিনি রায়তদের উস্কিয়ে দেন এবং নীলকরদেরও তখন জোর-জবরদস্তি ছাড়া উপায় থাকে না।

সাধারণত জমিদাররা নীলকরদের নিকট তাঁদের জমিদারি বিক্রি করতেন না, তাঁরা সাধারণত পত্তনি দিতেন। পত্তনি হত সাধারণত ৫ বৎসরের জন্য; ৫ বৎসর পর আবার নীলকরকে নতুন করে পত্তনি নিতে হত ও আবার সেলামি দিতে হত। এটাও ছিল একটা ঝগড়ার কারণ। ছোটলাট গ্র্যাণ্ট এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্যলিপিতে লিখেছিলেন, “জমিদারি অধিকার ও তার সব-রকমের গৌণ ও নিম্নতর অধিকারগুলি পরিবর্তনীয় অথবা অপরিবর্তনীয় খাজনার অধিকার অর্পণ করে; সরকারকে খাজনা দেওয়া হল তার একমাত্র শর্ত; এবং এই অধিকারগুলি খুব মূল্যবান এই কারণে যে, তাতে আর্থিক লাভ হয় এবং প্রজাদের উপর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ঐ অধিকারগুলির অর্থ সাধারণত জমির মালিকানা নয়; জমির দখলকার হিসাবে জমির মালিকানা থাকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রায়তদের উপর; কৃষকের এই রায়তী স্বত্ব জমিদারী স্বত্ব থেকে প্রাচীন এবং তা থেকে নিরপেক্ষ।” [৯৫]

নীলকররা সবরকম স্বত্বই, জমিদারীই হোক আর রায়তীই হোক, কিনবার অধিকারী ছিল, এবং “দেশীয় জমিদাররা সাধারণত শ্রেণীগতভাবে তাদের বিরোধী ছিলেন না।” [৯৬] কিন্তু রায়তী স্বত্ব অধিকারের ভিত্তিতে যে

নীলচাষ হত তা তত লাভজনক হত না—এবিষয়ে অন্যস্থানে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা এও দেখেছি যে, রায়তের জমিতে রায়তকে দিয়ে নীলচাষ করানো নীলকরের পক্ষে অনেক বেশি লাভজনক ছিল। সেই কারণেই সে জমিদারী, পত্তনি ইত্যাদি আয়ত্ত করবার জন্য বেশি ঝুঁকত। দেশীয় জমিদাররা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, অন্তত প্রথম দিকে, টাকার লোভেই যে এইসব জমিদারী স্বত্বগুলি নীলকরদের বিক্রি করতেন তাতে সন্দেহ নেই।

উক্ত মন্তব্যলিপিতে গ্র্যাণ্ট উঁচুদরে নীলকরদের পত্তনি দেওয়ার প্রথাকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করে বলেছেন, "জমিদাররা এমন একটা খাজনায় নীলকরদের পত্তনি দেন যার পর নীলকরের হাতে অন্যান্য খরচের জন্য কোনো উদ্বৃত্ত টাকা থাকে না এবং এই খাজনা আইনসঙ্গতভাবে রায়তদের কাছ থেকে যা দাবি করা যায় তার চাইতে অনেক বেশি। এই রকম ক্ষেত্রে পত্তনিদার একটি মাত্র কারণেই বেশি খাজনা দিতে রাজী হয়। সে আশা করে যে তার পত্তনির অপব্যবহার করে সে আইনত রায়তদের কাছ থেকে যা আদায় করবার অধিকারী তার চাইতে অনেক বেশি আদায় করতে পারবে। কোনো দেশীয় জমিদার এইভাবে জমি কিনলে, তিনি বেআইনীভাবে কৃষকদের নিকট আবওয়ার আদায় করে নেন।…এই রকম অবৈধ আবওয়ারের সঙ্গে নীলকরদের নীলগাছের মাধ্যমে যে আবওয়ার আদায় করা হয় তার আইনত বা নীতিগত কোনো তফাত নেই। জমিদারদের পক্ষে কেবলমাত্র নিজেদের অধিকারই নয়, রায়তদের অধিকারও বিক্রি করে দেওয়া খুব অন্যায়।" [৯৭]

এইভাবে নীলকররা জমিদারদের নিকট থেকে জমি কিনতেন এবং কিছুদিনের মধ্যে তাঁদেরই ঘাড়ে চেপে বসতেন। আইন ও আদালতের তখন এমনই অবস্থা ছিল যে, কৃষকদের কথা তো দূরে থাকুক, জমিদাররাও সরকারের নিকট সুবিচার আশা করতে পারতেন না। এই প্রসঙ্গে সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর 'যশোহর খুলনার ইতিহাসে' বলেছেন: "নীলকরের বিরুদ্ধে বিচারের সময় ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে কুঠিয়াল সাহেব বিচারকের পাশে চেয়ারে বসিতেন, দেশীয় জমিদার বা প্রজা কাঠগড়ায় খাড়া থাকতেন। বিচারক অফিসান্তে কুঠিতে কুঠিতে নিমন্ত্রণ খাইয়া বেড়াইতেন। নীলকুঠি চাষী ও জমিদারের ঘাড়ের উপর অবস্থিত, আর আদালত অনেক দূর, অর্থ ও সময়ের শ্রাদ্ধ করিয়া সেখানে পৌঁছাইতে পারিলেও বিচারের ফলাফল এইসব ক্ষেত্রে জানাই

ছিল। জমিদার নিজের তালুকমুলুক নীলকরকে ইজারা পত্তনি দিয়া সম্ভ্রম রক্ষা করিতেন, রায়তেরা লোকসান জানিয়াও নীলের দাদন লইতেন।"

১৮৬০ সালের জুন মাসের 'ক্যালকাটা রিভিউ'ও অনেকটা এই ধরনের কথা বলেছিল: নীলকরের বোঝাপড়া হয় জমিদারের সঙ্গে, রায়তদের সঙ্গে নয়; তাদের রায়তদের বলা উচিত—নীলচাষ কর, তোমরা তার জন্ম ভাল দাম পাবে; তারা তা না করে জমিদারদের বলে, তোমার এই জমিদারীতে ১০০০ রায়ত আছে, যদি তুমি এই জমিদারীর পত্তনি আমাকে দাও, তাহলে তোমার বছরকার খাজনা ছাড়াও তোমাকে আমি ৫০০০ টাকা দেব। যাই হোক, জমিদার, নীলকর ও কৃষকের মধ্যে এই স্বার্থসংঘাতই হচ্ছে জমিদারী প্রথার বৈশিষ্ট্য—চাষী জমির মালিক হয়েও সে ক্রীতদাস, আর যে জমির মালিক নয়, শুধু খাজনা আদায় করার যার অধিকার, সেই প্রকৃত প্রভু। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নীলচাষীদের এতবড় বিদ্রোহের পরও বাংলাদেশের জমিদারী প্রথার অথবা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার বিরুদ্ধে কেউ একটা কথাও সেদিন বলেন নি; কোনো বাঙালী এ প্রশ্নটা একবারও তোলেন নি। নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ করার জন্য ও কৃষকদের স্বার্থরক্ষা করার জন্য অনেক উপদেশ তাঁরা দিয়েছিলেন, কিন্তু কৃষকদের সব থেকে বড় শত্রু যে জমিদারী প্রথা, তা তুলে দাও—একথাটা বলেন নি।

যাই হোক, নীলকররা জমিদার হয়ে বসার পর জমিদারদের স্বার্থের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাধতে লাগল। অনেক ক্ষেত্রে জমিদাররা নীলকরের অত্যাচার সহ্য করে গিয়েছেন, আবার অনেক জমিদার তাদের প্রতিরোধও করেছেন। যেসব জমিদার নীলকরের কাছে মাথা নত করেন নি তাঁদের মধ্যে প্রথমেই যশোহর জেলার নড়াইলের জমিদার রামরতন রায়ের নাম উল্লেখ করতে হয়, যিনি রতনবাবু বলে তখনকার দিনে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর 'যশোহর জেলার ইতিহাসে' লিখেছেন, "রতনবাবুর আমলে নীলকর সাহেবেরা দেশময় সর্ব্বত্র নীলের কুঠি স্থাপন করিয়াছিলেন। উহাদের আদর্শে দেশীয় ধনী ও জমিদারগণ নীলের ব্যবসায়ে অর্থ লাভ করিতে সচেষ্ট হন। তন্মধ্যে রতনবাবু একজন। তিনিও বহু কুঠির মালিক হইয়াছিলেন। কয়েকটি নাম করিতেছি—ঘোড়াখালি, মহিষাকুণ্ড, চাউলিয়া, তালদিয়া, জতরকাটি, ধোপাদি, গোপালপুর, শৈলকুপা, শ্রীখণ্ডী, কুমারগঞ্জ, আউড়িয়া, আফরা, তুজারডাঙ্গা, শ্রীরামপুর ইত্যাদি। উহার অনেকগুলি সাহেবদিগের

নিকট হইতে খরিদ করা হয়। যে বৎসর নীল-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, সেই বৎসরই রতনবাবুর মৃত্যু ঘটে।" হাটবাড়িয়ার জমিদাররা ও নলডাঙ্গার রাজা অনেক কুঠির মালিক ছিলেন। [৯৮]

রতনবাবুর মৃত্যুর পর হরিশ মুখার্জী তাঁর 'হিন্দু পেট্রিয়টে' ২৮শে এপ্রিল লিখেছিলেন: "তাঁর শত্রুদের তিনি তাঁকে ভয় করতে শিখিয়েছিলেন। একদিন রাতারাতি একজন অত্যাচারী ও ধৃষ্ট নীলকরের বাগিচায় নীলগাছগুলি একেবারে নির্মূল হয়ে গেল এবং পরদিন সকালবেলায় দেখা গেল সেইখানে একটি সুন্দর কচি নারকেল গাছের বাগান গড়ে উঠেছে।"

তখনকার 'লিগাল রিমেমব্রেন্সার' বোফোর্ট বলেছিলেন যে, "অন্য লোককে পত্তনি দিয়ে গ্রামের উপর নিজের ক্ষমতা ও প্রভাব হারাতে বেশির ভাগ জমিদারই পছন্দ করেন না। অনেক জমিদারের অন্য উদ্দেশ্যও আছে। যশোহরের একটা মস্ত বড় অংশ রামরতন রায়ের জমিদারী। তাঁর নিজেরই প্রচুর নীলচাষ আছে এবং বোধ হয় সেই কারণেই তিনি নীলকরদের জমি দেবার বিরোধী ছিলেন।" আরও একটা কারণে নীলকরদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হত; তাদের কাছ থেকে "তিনি খুব বেশী করে সেলামী চাইতেন।" [৯৯]

সিকারপুর কুঠির ফরাসী ম্যানেজার তিসেন্দী নীল-কমিশনকে বলেছিল যে, "বাবু রামরতন রায়ের সঙ্গে শান্তি ও নির্বিবাদে বাস করার জন্য সম্প্রতি সিকারপুর কুঠিকে তাঁর কাছ থেকে একটা পত্তনী নিতে হয়েছিল, যার সদর জমা ছিল মাত্র ৭,৫০০ টাকা, কিন্তু আমাদের তার মূল্য দিতে হয়েছিল ২৯,০০০ টাকা; তাছাড়া আরও দিতে হয়েছিল ১০,০০০ টাকা বকেয়া খাজনা বাবদ।" [১০০] এখানে উল্লেখযোগ্য যে নদীয়ায় নীল বিদ্রোহের অন্যতম নেতা মহেশচন্দ্র চাটার্জী ঝিনাইদহতে রামরতন রায়ের নায়েব ছিলেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে এমন দু-চার জন নির্ভীক জমিদারও ছিলেন যাঁরা "যেমন কুকুর তেমন মুগুর" নীতিতে বিশ্বাস করতেন ও সেই নীতি অনুসরণ করে চলতেন, তাঁদের নিজেদের প্রজাদের প্রতি তাঁদের ব্যবহার যাই হোক না কেন।

কৃষক ও জমিদারের মিলিত প্রতিরোধের উদাহরণ আমরা দেখতে পাই ১৮২৯ সালের জালালপুরের ঘটনা সম্বন্ধে ঢাকা বিভাগের কমিশনারের রিপোর্টে। এই ঘটনায় নীলকরের দিকে ছিল ৫০০ লোক, আর গ্রামবাসীরা ছিল ১,০০০ জন। পুলিশ আসলেই দু-তিন হাজার কৃষক এসে তাদের

ঘেরাও করে ফেলত। সাংকেতিক আওয়াজের দ্বারা তাদের একত্রিত করা হত। একবার ২,০০০ কৃষক পুলিশদের মারধর করে বন্দী করে নিয়ে যায় এবং ম্যাজিস্ট্রেটকে সৈন্যের সাহায্য চাইতে হয়। [১০১]

এইরকম আর একটি দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই যশোহর জেলার অন্যতম প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত ঝাউদিয়ার জমিদার করম আলি চৌধুরীর মধ্যে। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন নীলকর এক ইঞ্চি জমিও তাঁর কাছ থেকে পায় নি। নীলকরের সঙ্গে কয়েকবার তাঁর রক্তাক্ত লড়াই হয়েছিল এবং কুখ্যাত আর্চিবল্ড হীলস্‌কেও ল্যাজ গুটিয়ে পালাতে হয়েছিল করম আলির লাঠিয়ালদের সামনে। তাঁর মৃত্যুর পর করম আলির পুত্র এ সংগ্রাম আর চালাতে পারে নি। [১০২] সুজনপুরের নীলকর দম্বালের সাক্ষ্যতে দেখা যায় যে রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্রের হাতে তার ও তার ছেলের উচিত শিক্ষা হয়েছিল। [১০৩]

মোল্লাহাটির নীলকর ফরলঙ নীল-কমিশনের নিকট অভিযোগ করেছিল যে নিশ্চিন্দপুরের জমিদার রামনিধি চাটার্জী ও নবকৃষ্ণ পাল তার নিশ্চিন্দপুরের কুঠির বিরুদ্ধে খুব শত্রুতা করেছেন। "বর্তমানে রায়তদের তাঁরা অসৎ উপদেশ দিয়ে বেড়াচ্ছেন।" [১০৪]

নদীয়া জেলায় হাঁসখালি থানার অন্তর্গত বীরনগরের জমিদার শম্ভুনাথ মুখার্জীর ৩০০০ বিঘা নীলের চাষ ছিল। তিনি কয়েকখানা গ্রাম নীলকরকে পত্তনি দিয়েছিলেন ও তার জন্য ৫০০০ টাকা সেলামি নিয়েছিলেন। গ্রামের লোকেরা নীলকরকে জমি না দিতে তাঁর কাছে আবেদন করেছিল ও তারা বলেছিল ঐ টাকা নিজেদের মধ্যে থেকে তুলে দেবে। শম্ভুনাথ নীল-কমিশনকে বলেছিলেন, "কিন্তু নীলকরের সঙ্গে ঝগড়া হবার ভয়ে আমি তাদের পত্তনি দিয়েছিলাম। আমার ভাই বামনদাস মুখার্জী নীলকরকে পত্তনি দিতে রাজী হন নি; তাঁর সঙ্গে এই জন্য নীলকরের কয়েকবার সংঘর্ষ হয়েছিল। অবশেষে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে হুকুম করেছিলেন নীলকরকে পত্তনি দিতে।" [১০৫]

নদীয়ার দৌলতপুর থানার অন্তর্গত খালবোয়ালিয়ার কুঠি থেকে এক মাইল দূরে দিগম্বরপুরের জমিদার কৈলাশচন্দ্র রায়ের (কৃষ্ণনগরের মহারাজার আত্মীয়) কাহিনী খুবই শিক্ষাপ্রদ। [১০৬] ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যখন নীলকর এই স্থানে প্রথম আসে তখন কোনো জমিদারই তাকে জমি দিতে

রাজী হয় নি নীলকরকে কিছুকাল পরে কৈলাসচন্দ্রের পিতামহ শম্ভুনাথ রায় কয়েকখানা গ্রাম দেন ও খালবোয়ালিয়াতেও কুঠি তৈরি করবার জন্য নীলকরকে কিছু জমি দেন। সেই সময় নীলকরের সঙ্গে রায় পরিবারের খুব দহরম মহরম ছিল। ক্রমে নীলকর প্রভূত ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠল, তার সঙ্গে সঙ্গে তার ক্ষমতাও অনেক বেড়ে গেল ও তার মনোভাবও সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হল। পরে কৈলাশচন্দ্রের সঙ্গে খুব অসম্মানজনক ব্যবহার করা হয়। যখন-তখন নীলকরের লোক এসে তাঁর গাছ-গাছড়া, বাঁশঝাড় কেটে নিয়ে চলে যায় ও তাঁর জিনিসপত্র, জমিজমা ক্ষতি করে এবং সব থেকে বড় কথা সময়মতো তিনি তাঁর খাজনা পান না। খাজনা আদায়ের জন্য তাঁর লোকদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হয় ও নীলকরের আমলাদের নিকট অপমানিত হতে হয়। এই অবস্থায় কৈলাশচন্দ্র ঠিক করলেন যে, তিনি নীলকরের পত্তনি আর করবেন না। সুতরাং তালুকদার প্রাণকৃষ্ণ পালকে ঐ জমির পত্তনি দিয়ে দিলেন, তখন নীলকর কৈলাশচন্দ্রের বাড়ির চারিদিকে লাঠিয়াল মোতায়েন করে তাঁর লোকজনের উপর হামলা শুরু করল। কৈলাশচন্দ্রও নিজের আত্মরক্ষার জন্য সব ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন এবং ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটও নালিশ করলেন। তাতে হিতে-বিপরীত হল। পুলিশ তাঁকে তো রক্ষা করলই না, বরং উল্টে তাঁরই বাড়ি দুবার খানাতল্লাসী করল ও তাঁর কয়েকজন লোককে ধরে নিয়ে গেল। এইভাবে গ্রামে যখন বাস করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল, তিনি সপরিবারে কৃষ্ণনগর পলায়ন করলেন।

কিন্তু এই প্রকার নির্বাসন তাঁর পছন্দ হল না। তিনি প্রাণকৃষ্ণের নিকট থেকে পত্তনি ফিরিয়ে নিলেন এবং নীলকরের নায়েবের সঙ্গে যোগাযোগ করে নীলকরকে আবার ১০ বৎসরের জন্য পত্তনি দিলেন। সব গণ্ডগোল মিটে গিয়েছে মনে করে কৈলাশ নিজের ভিটায় ফিরে যাবেন ঠিক করলেন (ভিটাই বটে, ভিটার উপর যা কিছু ছিল নীলকর ইতিমধ্যে যা পারল লুটপাট করে নিয়ে গেল, আর যা পারল না তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল।) নীলকরের নায়েব কৈলাশচন্দ্রকে খুব নম্রভাবে চিঠি লিখলেন ও আশ্বাস দিয়ে বললেন যে একবার এসে নীলকরের সঙ্গে দেখা করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কুঠিতে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে বন্দী করা হল ও নীলকরের ক্ষতি করেছেন বলে ৫০০০ টাকা তাঁর কাছে চাওয়া হল। তারপর

তাঁকে কুঠির জেলখানায় আরও কয়েকজন বন্দীর সঙ্গে আটক করে রাখা হল।

কৈলাশচন্দ্রের আত্মীয় কৃষ্ণনগরের মহারাজা যথাসময়ে সব খবর পেলেন, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ করা তিনি যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচনা করলেন না। কৃষ্ণনগরের মহারাজা আর যাই হন না কেন, তিনি রামরতন রায়ের জাতের লোক ছিলেন না। নীলকর হোয়াইটের জন্য একখানা চিঠির বাহক করে তাঁর গুরুকে পাঠালেন খাল বোয়ালিয়ার কুঠির ম্যানেজারের নিকট। অনেক দর কষাকষির পর কুঠির ম্যানেজার ৫০০০ টাকা থেকে দু হাজারে নামল। নীলকরের পাওনা চুকিয়ে দেবার পর কৈলাশচন্দ্র মুক্তি পেলেন, কিন্তু তাঁর ভিটায় তিনি ফিরে যেতে পারলেন না, কৃষ্ণনগর ফিরে যাবার অনুমতি—পেলেন।

বড় বড় জমিদারদের উপর যখন নীলকররা এত দুর্ব্যবহার ও অত্যাচার করতে সাহস করত তখন ছোট ছোট জমিদার ও জোতদারদের প্রতি তাদের ব্যবহার কিরূপ ছিল তা সহজেই অনুমেয়। এখানে তার একটি উদাহরণই যথেষ্ট হবে।

নদীয়ার অন্তর্গত গোয়ালতলির গাঁতিদার বেণীমাধব মিত্র নীল-কমিশনের সাক্ষ্যে বলেছিলেন যে, রায় চৌধুরী জমিদারদের কাছ থেকে নীলকর পত্তনি নেবার পর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গাঁতির খাজনা ডবল করে দিল। "কৃষ্ণনগরের মহারাজার কাছ থেকে আমার ১০০ বছরের পুরনো পাট্টা রয়েছে। সেই পাট্টা অনুসারে আমার জমির খাজনা কেউ বাড়াতে পারে না। লারমুর তার লোকজন পাঠিয়ে আমাকে আমার পরিবারসুদ্ধ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল ও আমার পাট্টা কেড়ে নিল। আমাকে আটক করে রাখবে এই ভয়ে আমি আর দেশে ফিরি নি।······আমি ৩ বার সরকারের নিকট অভিযোগ করেছি।" বেণীমাধবের গোমস্তা ম্যাজিস্ট্রেট এলিয়টের নিকট নালিশ করেছিলেন, "কিন্তু সেই সময় লারমুরকে অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হল, সুতরাং এ বিষয়ে আর কিছু করা গেল না।" এ বিষয়ে আর একটা গুরুতর ব্যাপার জড়িত ছিল—এ অঞ্চলের বেশির ভাগ রায়তই মুসলমান "এবং যেহেতু সরকার সিপাহী-বিদ্রোহের জন্য এদের প্রতি বিরোধী-মনোভাব পোষণ করতেন, আমার নালিশ সম্বন্ধে আর কোনো প্রকার উচ্চবাচ্য হল না।" বেণীমাধব তারপর বলেন: "আমার বাগানে অনেকগুলি আম-কাঁঠালের গাছ ও বাঁশঝাড় ছিল।

লারমুর সেগুলি কেটে নিয়ে যায়, কিন্তু তার জন্য কোনো পয়সা দেয় নি। সে আমার জমিতে নীল বুনতে থাকে, কিন্তু কোনোদিন সে আমাকে খাজনা দেয় নি এবং আমার রায়তদের কাছ থেকেও সে আমাকে খাজনা আদায় করতে দেয় নি।" বেণীমাধবের হয়ে তাঁর গোমস্তা নালিশ করেছিলেন বলে, তাঁকেও গ্রাম ছেড়ে পালাতে হল—"তাঁকে মারবার জন্য রাস্তায় রাস্তায় নীলকরের লাঠিয়ালরা ঘুরে বেড়াত।" এসম্বন্ধে পুলিশ কি করছিল? "পুলিশের থানা ছিল ৫।৬ ক্রোশ দূরে বাগদাতে, আর থানার লোকরা ছিল নীলকরের পক্ষে। সুতরাং থানায় নালিশ করা অনর্থক।" [১০৭]

কৃষকরা যখন নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল, জমিদাররা কি এতদিনকার পুঞ্জীভূত অপমান ও অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার এই অপূর্ব সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন? বেশির ভাগ জমিদারই নীলকরদের বিরুদ্ধে ছিলেন, এবং তাঁদের অনেকেরই এই সংগ্রামে কৃষকদের প্রতি সহানুভূতি ছিল; তাঁদের মধ্যে কয়েকজন পরোক্ষভাবে নানা উপায়ে কৃষকদের সাহায্যও করেছিলেন। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে কোনো জমিদারই বিদ্রোহে যোগ দেন নি এবং হার্সেল নীল-কমিশনকে বলেছিলেন যে তাঁরা ইচ্ছা করলে কৃষকদের যতখানি সাহায্য করতে পারতেন, তার তুলনায় খুব কমই সাহায্য করেছিলেন। [১০৮] পক্ষান্তরে কয়েকজন জমিদার বিদ্রোহ দমন করবার জন্য নীলকরদেরই সাহায্য করেছিলেন। নদীয়ার দুজন প্রধান জমিদার শ্যামচন্দ্র পাল চৌধুরী ও হাবিবউল হোসেন কৃষকদের বিদ্রোহ দমন করতে লারমুরকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন। [১০৯]

অভ্যুত্থান

১৮৫৯ সালের পূর্বে নীলচাষীরা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ করেছিল তার উল্লেখ ইতিপূর্বেই করা হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে তিতু মীরের বিদ্রোহও বর্তমান বাংলার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ফরাজীদের মতো তিতু মীরও চেয়েছিলেন মুসলমানদের মধ্যে বিশুদ্ধ ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠা, জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ও বিদেশী বিধর্মী ইংরেজদের দেশ থেকে বিতাড়ন। কথিত আছে তিতু মীর অন্য মতাবলম্বী মুসলমানদেরও বিরুদ্ধে ছিলেন এবং তাদের অনেক মসজিদও পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। আবার এও জানা যায় যে ভূষণার জমিদার মনোহর রায় তিতুর দলভুক্ত ছিলেন এবং তিতুকে বহু প্রকারে সাহায্য করেছিলেন। ধর্মের গোঁড়ামী ও বৈপ্লবিক রাজনীতির এইরূপ সংমিশ্রণের ফলে তিতু মীরের বিদ্রোহ যে একটা জটিল আকার ধারণ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিতু মীরকে লড়তে হয়েছিল জমিদার, নীলকর ও ইংরেজ সরকারের সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে।

তিতু মীরের দেশ ছিল নদীয়া ও চব্বিশ পরগনার মধ্যবর্তী নীলকুঠি-অধ্যুষিত অঞ্চল এবং এইজন্য নীলকরদের বিরুদ্ধে তিতু মীরের বহু সংঘর্ষ ঘটেছিল। অনেক ক্ষেত্রে নীলকরদের পরাজয়ও স্বীকার করতে হয়েছিল। অবশেষে তিতু মীরের শক্তি: বৃদ্ধিতে সরকার এতই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে যে ১৮৩৯ সালে তাঁর বিরুদ্ধে তাকে ফৌজ পাঠাতে হয়; তখন দুইদলের মধ্যে কতকগুলি খণ্ডযুদ্ধ হয়। এই রকম একটি যুদ্ধে তিতু মীরকে লড়তে হয়েছিল গোবরডাঙ্গার জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও মোল্লাহাটির নীলকুঠির ম্যানেজার ডেভিসের সম্মিলিত বাহিনীর কয়েকটি হাতি সহ ২০০ হাবসী ও ১০০০ লাঠিয়ালের সঙ্গে। সরকার, নীলকর ও জমিদারদের সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে ১৮৩৯ সালে নারকেলবাড়িয়ায় এই রকম আর একটা লড়াইয়ে তিতু মীর যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেন।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় বাংলাদেশে নীলবিদ্রোহ ঘটলে বাংলা ও ভারতের ভবিষ্যৎ কি হত সে বিষয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এই সময়ে অনেক নীলকরকে অ্যাডিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিয়োগ করা হয়েছিল।

বাংলার কৃষকশ্রেণী, বিশেষ করে নীলচাষীরা বিদ্রোহী-ভাবাপন্ন হলেও নীলকর ও জমিদাররা সরকারের সাহায্যে তাদের দাবিয়ে রাখতে পেরেছিল। তাছাড়া তখনকার অধিকাংশ বাঙালী শিক্ষিতরা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ও বিদেশী সরকারের সপক্ষে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

যাই হোক, ১৮৫৯ থেকে সংঘবদ্ধভাবে নীলচাষীদের প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হল। এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করে তখনকার একটি ইংরেজী পত্রিকা লিখেছিল, "প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটা প্রতিক্রিয়া আছে এটাই নিয়ম। নীলকরদের অত্যাচারের মাত্রার উপরেই নির্ভর করবে রায়তদের প্রতিরোধের রূপ। এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয় নি। যে মহকুমা থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল লতিফকে অসম্মানজনকভাবে বদলি করা হয়েছিল নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রথম শুরু হয় সেখান থেকেই। নীলচাষ না করবার জন্য কৃষকদের এই দৃঢ়-সংকল্প যেমনই আকস্মিক তেমনই অপ্রত্যাশিত।" [১১০]

১৮৫৯ সালের প্রথমদিকে যখন স্যার পিটার গ্র্যাণ্ট বাংলার ছোটলাট নিযুক্ত হলেন, তখন থেকেই "এই নীলের প্রশ্নটা একেবারে অপরিহার্যভাবে গভর্নমেণ্টের উপর চাপ দিতে লাগল।" [১১১] মার্চমাসে বারাসতের একজন নীলকর অভিযোগ করল যে তার চাষীরা নীলচাষ করতে আর রাজী হচ্ছে না এবং চাষীদের এইরকম অসৎ ব্যবহারের জন্য সে দায়ী করল তাদের নিজেদের অত্যাচারকে নয়, সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেটকে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে সিপাহী-বিদ্রোহ দমন করার পর যখন ভারতবর্ষ শাসন করার ভার ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ব্রিটিশ সরকার নিয়ে নিল, তখন তাঁরা ভারত-সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে পাকা-পোক্ত করে গড়ে তুলতে সিদ্ধান্ত করলেন। কাজেই তাদের প্রথম কাজ হল স্বৈরাচারী নীলকরদের কিছুটা সংযত করা, কেননা নীলকররা তখন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আর একটা রাষ্ট্রের মতো (a state within a state) আচরণ করছিল। তাছাড়া, সিপাহী-বিদ্রোহ ঠিক দমন হতে না-হতেই, নীলচাষীরা যেভাবে মরিয়া হয়ে উঠেছিল, তাতে এই পন্থা অবলম্বন না করেই বা তাদের কি উপায় ছিল?

উপরি-উক্ত নীলকর যখন দেখল যে চাষীরা নীল না বুনতে বদ্ধপরিকর তখন সে তাদের জমিতে জোর করে নীলচাষ করবে বলে ঠিক করল। চাষীরা ম্যাজিস্ট্রেট এসলী ইডেনের নিকট পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করল। ইডেন শান্তি রক্ষার জন্য সেখানে পুলিশ পাঠিয়ে দিয়ে এক পরোয়ানা জারি করলেন

যে নিজের জমিতে নীলচাষ করা কৃষকদের ইচ্ছাধীন ; এজন্য তাদের উপর জোর-জুলুম করা বে-আইনী হবে।

সে সময়কার অবস্থা বর্ণনা করে একটি সমসাময়িক পত্রিকা লিখেছিল "বাংলার গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা আকস্মিক ও অত্যাশ্চর্য পরিবর্তন এসে গিয়েছে। এক মুহূর্তে তারা নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। যে রায়তদের আমরা ক্রীতদাসের মতো অথবা রুশদেশের ভূমিদাসের মতো চিন্তা করতে অভ্যস্ত ছিলাম, জমিদার ও নীলকরদের নির্বিরোধ যন্ত্ররূপে যাদের আমরা জানতাম, অবশেষে তারা জেগে উঠেছে, কর্মতৎপর হয়ে উঠেছে ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে যে তাদের আর শিকল পরিয়ে রাখা চলবে না। বর্তমানে গ্রামের লোকরা যে-রকমের আশ্চর্য অনুভূতির দ্বারা নীলচাষকে গণ্য করছে ও যার ফলে তারা অনেক স্থানে ফেটে পড়েছে—তা সব-থেকে দূরদর্শী ব্যক্তিরাও কল্পনা করতে পারেন নি। ১৮৫৭ সালের ঠিক পরেই এই সব ঘটনা বাংলার ভবিষ্যতের উপর যে খুব প্রভাববিস্তার করবে তাতে সন্দেহ নেই।" [১১২]

যে ৭৭ জন নীলচাষী নীল-কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দেয় তা থেকে তারা নীলচাষ না করতে কতদূর বদ্ধপরিকর হয়েছিল তা জানা যায়। তাদের কয়েকটি মতামত এখানে দেওয়া হল :

দিনু মণ্ডল—আমার গলা কেটে ফেললেও আমি নীল বুনব না···বরং মৃত্যু স্বীকার করব, তবু নীল বুনব না (উত্তর নং ১১৫০)। জামির মণ্ডল—আমি এমন দেশে চলে যাব যেখানকার লোক নীল কখনও চোখে দেখে না বা নীল বোনে না (উত্তর নং ১১৮০)। হাজি মোল্লা—বরং বাড়িঘর ছেড়ে অন্য দেশে চলে যাব, তবু নীল বুনব না। ভিক্ষা করে খাব, তবু নীল বুনব না। (উত্তর নং ১২১৬)। কবি মণ্ডল—আমি কারো জন্যই নীল বুনব না, এমনকি বাপ-মার জন্যও না। পাঞ্জু-মোল্লা—আমাকে গুলি করে মেরে ফেলুন, তবু আমি নীল বুনব না। (উত্তর নং ১২৪৯)

নদীয়া ডিভিসনের কমিশনার এ, গ্রোট বাংলা সরকারের সেক্রেটারির নিকট তাঁর সাপ্তাহিক রিপোর্টে (১০ই—১৭ই মার্চ, ১৮৬০) কৃষকদের মনোভাব জানিয়ে লিখেছিলেন : "এই সপ্তাহে আমি ডামুর-হুদা মহকুমা পরিদর্শন করেছি। সাধারণভাবে আমার যে ধারণা হয়েছে তা হচ্ছে যে রায়তরা নীল না বুনতে পূর্বের চাইতে এখন ঢের বেশি বদ্ধপরিকর। এই আন্দোলন এখন

ঢের বেশি শক্তিশালী এবং আমার মনে হল ঢের বেশি ভালোভাবে সংগঠিত।" [১১৩]

১৮৬০ সালের ১৬ই মার্চ নীলকররা ছোটলাটকে একটা স্মারকপত্র পাঠায়, তাতে তারা অভিযোগ করে যে কৃষকরা দলবদ্ধভাবে বিদ্রোহী-ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে এবং নীলকররা চাষীদের দিয়ে আর নীলচাষ করাতে পারছে না। সিন্দুরী কুঠির উদাহরণ দিয়ে তারা বলে যে, "মফস্বলের আদালতগুলিতে কোনো রায়তের বিরুদ্ধে এখন কোনো মামলা আনা অসম্ভব হয়ে পড়েছে, কারণ আমাদের অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য আমরা কোনো সাক্ষী যোগাড় করতে পারছি না; এমনকি আমাদের কর্মচারীরা পর্যন্ত আদালতে গিয়ে সাক্ষ্য দিতে আর সাহস করে না"; এবং "রায়তরা বর্তমানে খুব উত্তেজিত অবস্থায় আছে, বস্তুত তারা ক্ষেপে গিয়েছে, যে-কোনো প্রকার দুষ্কর্মের জন্য তারা প্রস্তুত। প্রতিদিন তারা আমাদের কুঠি ও বীজের গোলাগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেবার চেষ্টায় আছে। আমাদের অধিকাংশ ঝি-চাকররা আমাদের ত্যাগ করে চলে গিয়েছে, কারণ রায়তরা তাদের ভয় দেখিয়েছে যে তাদের তারা খুন করবে নয়তো তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেবে এবং আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে যে, যে-দু-এক জন আমাদের সঙ্গে এখনও আছে তারাও শীঘ্রই চলে যেতে বাধ্য হবে, কারণ পাশের বাজারে তারা খাদ্যদ্রব্য কিনতে পারছে না।" নীলকররা কৃষকদের দাবিয়ে রাখার জন্য ছোটলাটকে সত্বর কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলল, তা নইলে তাদের আর মফস্বলে ধনপ্রাণ নিয়ে থাকা সম্ভব হবে না। "সমস্ত জেলায় বিপ্লব শুরু হয়ে গিয়েছে।" উদাহরণ স্বরূপ তারা বলল: ১। মোল্লাহাটি কুঠির সহকারী ম্যানেজার ক্যাম্পবেলকে আক্রমণ করে মেরে, মৃত মনে করে মাঠের মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছিল; ২। ঐ কুঠির আর একজন সহকারী, হাইড যখন ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল তখন তাকে কৃষকরা আক্রমণ করে, কিন্তু ঘোড়ার দ্রুতগতির জন্য সে বেঁচে যায়; ৩। খাজুরার কুঠি কৃষকরা লুঠ করে জ্বালিয়ে দিয়েছে; ৪। লোকনাথপুরের কুঠি আক্রান্ত হয়েছিল; ৫। চাঁদপুরে গোলদার কুঠির গোলায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল; ৬। বামনদি কুঠির চাষীরা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করছে, অন্যান্য কুঠিতে বিদ্রোহ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। সমস্ত কৃষ্ণনগর জেলাটাই নীলকরদের আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছে। [১১৪]

এই সংবাদ পরিবেশন করে হরিশ মুখার্জী তাঁর 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ দুঃখ করে বলেছেন যে রায়তদের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য তাদের কোনো সংগঠন নেই।

সেই যুগেই হরিশচন্দ্র সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এই সময়কার 'ঢাকা নিউজ' লিখেছিল: "রুশদেশের শত-শত বৎসরের ভূমিদাসরা তাদের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করছে; বাংলাদেশের রায়তরা যদি তাদের জমিতে স্বাধীনভাবে চাষ করতে চায়, অথবা জন্মাবার পূর্ব থেকেই তাদের শ্রমকে বিক্রি করার পরিবর্তে নিজেদের খুশিমতো তা নিয়োগ করতে চায়, তাহলে কেন আমরা তাদের বাধা দেব।" [১১৫]

দ্বিতীয় বেঙ্গল পুলিশ ব্যাটালিয়নের পরিচালক হাবিলদার সেভো খান পাবনা জেলার নিশানপুর কুঠি থেকে তাঁর দেশে একটা চিঠিতে (১০ই এপ্রিল, ১৮৬০) লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, "সকাল বেলায় আমরা প্রস্তুত হয়ে পীরারী নামক একটা গ্রামে মার্চ করে গেলাম। সেখানে পৌঁছবামাত্রই সড়কি, তীরধনুক, লাঠি নিয়ে দুহাজার লোক আমাদের চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। তারা ক্রমশ আমাদের দিকে এগিয়ে এল এবং একটা সড়কি দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের ঘোড়াটাকে জখম করল। আমরা শুনলাম যে এই বিদ্রোহীরা আশেপাশের ৫২টা গ্রাম থেকে এসে জমায়েত হয়েছে। এদের মধ্যে একজন লোক আমাদের খুব দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং ঐদিক থেকে কয়েকটা গুলির আওয়াজও এসেছিল।" [১১৬] এই ঘটনার শেষ কি হল তা এই হাবিলদারের চিঠিতে জানা যায় না। এই ঘটনা থেকে আর একটা জিনিস স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে বিদ্রোহী কৃষকরা লড়াই করবার জন্য ভালোভাবেই প্রস্তুত হচ্ছিল—তার জন্য তারা কেবলমাত্র সড়কি, তীরধনুকের উপরই নির্ভর করে নি, বন্দুক, গোলাবারুদও সংগ্রহ করেছিল।

এই সময়ে নীলকর সমিতির অস্থায়ী সম্পাদক ফোর্বস বাংলা সরকারের সেক্রেটারিকে লিখেছিলেন যে, "আমার মতে নিম্নবঙ্গে একটা সাধারণ বিদ্রোহ এখন সুনিশ্চিত, যদি সরকার অবিলম্বে এটা দমন করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন।" বাংলা সরকারের সেক্রেটারি এই রিপোর্টের উপর মন্তব্য করেছিলেন যে, "সরকারের সাহায্য ছাড়া কৃষকদের অসন্তোষ দমন করা এখন নীলকরদের ক্ষমতার একেবারে বাইরে চলে গিয়েছে।" [১১৭]

মার্চ, এপ্রিল, মে, জুনে বিদ্রোহের আগুন নদীয়া, যশোহর, বারাসত পাবনা, রাজশাহী, ফরিদপুর—চারিদিকে হু হু করে ছড়িয়ে পড়ল। এক নতুন উদ্দীপনা, এক নতুন আশা ও উৎসাহ নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হিন্দু, মুসলমান; খ্রীষ্টান

কৃষকরা অগ্রসর হয়ে চলেছে। এপ্রিল মাসে বারাসতের সমগ্র কৃষকরা একবাক্যে ঘোষণা করল যে তারা প্রাণ থাকতে আর নীল বুনবে না। জুলাই মাসে ব্রিটিশ জমিদার ও বণিক সমিতির সভাপতি ম্যাকিন্‌টে বিলেতে তখনকার ভারতসচিব স্যার চার্লস উডকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তা থেকেই সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় কৃষকদের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা কত দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল। ম্যাকিন্‌টে লিখেছিলেন :

"মফস্বলের অবস্থা হচ্ছে বর্তমানে (জুলাই, ১৮৬০) সম্পূর্ণরূপে বিশৃঙ্খল। কৃষকরা তাদের দেনা ও চুক্তিপত্র অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না। তাদের পাওনাদার ও মালিকদের দেশ থেকে একেবারে তাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করছে। তারা চায় এই প্রদেশ থেকে সমস্ত ইউরোপীয়দের তাড়িয়ে দিতে, তাদের যেসব সম্পত্তি তারা দখল করছে সেগুলি রাখতে ও ইউরোপীয়দের কাছে সমস্ত দেনা নাকচ করে দিতে।" [১১৮]

১৮৫৯ সালে হার্সেল যখন নদীয়া জেলায় ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসেন তখন তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে "নীলচাষ সম্বন্ধে কৃষকরা খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। রায়তদের মধ্যে সাধারণভাবে একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে তাদের মুক্তির আর বিলম্ব নেই। তারা এমনভাবে ব্যবহার করছিল যে তারা যেন একটা সাংঘাতিক রকমের উৎপীড়নের হাত থেকে রক্ষা পেতে যাচ্ছে, কিন্তু সেই মুক্তির মন্দগতিতে তারা অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছিল।...নীলচাষ সম্বন্ধে রায়তরা আগের চাইতে এখন দশগুণ বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"

নীলচাষীদের সংগ্রাম কত তাড়াতাড়ি বৈপ্লবিক আকার ধারণ করছিল তার খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায় কৃষ্ণনগরের একজন জার্মান পাদ্রী বমভাইটসের 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড'-এ (৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৮৬০) লিখিত একখানা চিঠিতে। তিনি লিখেছিলেন যে বল্লভপুরের প্রজারা নীলচাষ করতে অসম্মত হলে নীলকর লাঠিয়াল লাগিয়ে তাদের গ্রাম আক্রমণ করবে বলে শাসিয়েছিল, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে গ্রামের লোকরাও লড়াইয়ের জন্য তৈরি হল। "নীলকরের পরিকল্পিত আক্রমণ কার্যে পরিণত হয় নি তার কারণ নীলকরের লাঠিয়ালরা লড়াইয়ের জন্য প্রজাদের দৃঢ়সংকল্প দেখে ভীত হয়ে পড়েছে। কৃষকরা ৬টা বিভিন্ন কোম্পানিতে নিজেদের ভাগ করে নিয়েছিল। একটি কোম্পানি হয়েছিল শুধু তীরধনুক নিয়ে। প্রাচীন কালের ডেভিডের মতো ফিঙাধারা নিক্ষেপকারীদের নিয়ে আর একটা কোম্পানি। ইটওয়ালাদের নিয়ে আর

একটা কোম্পানি, যারা আমার উঠোন থেকেও ইটপাটকেল কুড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। আর এক কোম্পানি হল বেলওয়ালাদের ; তাদের কাজ হল শক্ত কাঁচা বেলগুলি নীলকরের লাঠিয়ালদের মাথা লক্ষ্য করে মারা। থালাওয়ালা-দের নিয়ে আর একটা কোম্পানি, তারা তাদের ভাত খাবার পিতলের থালাগুলি অনুভূমিকভাবে শত্রুকে লক্ষ্য করে ছুড়ে মারে, তাতে শত্রু নিধন ভালো করেই হয়। আরও একটা কোম্পানি হল রোলাওয়ালাদের নিয়ে,যারা খুব ভালো করে পোড়ানো ভাঙা কিংবা আস্ত মাটির বাসনকোসন নিয়ে শত্রুকে অভ্যর্থনা জানায়। বিশেষ করে বাঙালী মেয়েরা এই অস্ত্র প্রয়োজন মতো ভালো-ভাবেই ব্যবহার করতে জানে। এদিন নীলকরের লাঠিয়ালরা যখন দেখতে পেল যে মেয়েরা এইসব অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাদের দিকে ছুটে আসছে, তখন তারা ঘাবড়ে গিয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল। এসব ছাড়া আরও একটা বাহিনী গঠিত হয়েছে, যারা লাঠি চালাতে পারে তাদের নিয়ে। তারপর তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহিনী হল যুধিষ্ঠির কোম্পানি অর্থাৎ সড়কিওয়ালারা। এই কোম্পানিতে মাত্র বারো জন লোক আছে, কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার একজন সড়কিওয়ালাই ১০০ জন লাঠিয়ালকে হটিয়ে দিতে পারে। এরা সংখ্যায় কম হলেও, এরা দুর্ধর্ষ এবং এদেরই ভয়ে নীলকরের লাঠিয়ালরা এমন ভীত হয়ে পড়েছে যে এখন পর্যন্ত তারা এগোতে সাহস করে নি।" [১১৯]

বাংলার কৃষকরা কিভাবে নীলকরদের প্রতিরোধ করত তার একটু আভাস দিয়েছেন শ্রীঅনাথনাথ বসু তাঁর 'মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ' বইয়ে, "লাঠিয়ালগণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য কৃষকগণ এক অপূর্ব কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিল। প্রত্যেক পল্লীর প্রান্তে তাহারা একটি করিয়া দুন্দুভি রাখিয়াছিল। যখন লাঠিয়ালগণ গ্রাম আক্রমণ করিবার উপক্রম করিত, কৃষকগণ তখন দুন্দুভি ধ্বনি দ্বারা পরবর্তী গ্রামে রাইয়তগণকে বিপদ সংবাদ জ্ঞাপন করিলে তাহারা আসিয়া দলবদ্ধ হইত। এইরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চারি-পাঁচখানি গ্রামের লোক একত্র হইয়া নীলকর সাহেবদিগের লাঠিয়ালগণের সহিত তুমুল সংগ্রামে ব্যাপৃত হইত।" [১২০]

এই প্রসঙ্গে সতীশচন্দ্র মিত্র লিখেছেন : "গ্রামের সীমায় একস্থানে একটি ঢাক থাকিত। নীলকরের লোকে অত্যাচার করিতে গ্রামে আসিলে, কেহ সেই ঢাক বাজাইয়া দিত, অমনি শত শত গ্রাম্য কৃষক লাঠিসোটা লইয়া দৌড়াইয়া

আসিত। নীলকরের লোকেরা প্রায়ই অক্ষত দেহে পালাইতে পারিত না। সম্মিলিত প্রজাশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। প্রজাদের নামে অসংখ্য মোকদ্দমা হইত, তাহারা জেলে যাইত—বিচারালয়ে তাহাদিগকে সমর্থন করিবার জন্য লোক জুটিত না। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভা হইতে দুই-তিন জন মাত্র মোক্তার পাঠান হইয়াছিল, তাঁহারা সব মোকদ্দমার কার্য করিতে পারিতেন না। এই সময়ে শিশিরকুমার তাঁহার অঞ্চলে প্রজার একমাত্র বন্ধু ছিলেন; তিনি নানাভাবে উহাদিগকে সাহায্য করিতেন।…সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে নানা সাহেব ও তাঁতিয়া তোপীর নাম দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; নীল-বিদ্রোহী কৃষকরাও তাহাদিগের নেতাদিগকে এই সব নামে অভিহিত করিত।" [১২১]

যেসব বাঙালীরা দাবি করেন যে সিপাহী-বিদ্রোহ বাঙালীর মনে রেখাপাত করে নি, বাঙালীর মন জয় করতে পারে নি, উপরের এই উদ্ধৃতিটিই প্রমাণ করে তাঁদের উক্তি কতখানি ফাঁকা। হতে পারে যে অশিক্ষিত, ধর্মান্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সিপাহীরা তথাকথিত গর্বান্ধ প্রগতিবাদীদের প্রশংসাভাজন হতে পারে নি, কিন্তু তারা যে বাংলার প্রথম ব্যাপক মুক্তি-সংগ্রামের জঙ্গী কৃষক জনসাধারণের মন ভালোভাবেই জয় করতে পেরেছিল তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

শিশিরকুমার ঘোষের বয়স যখন ১৭।১৮ বছর তখন তিনি নীল-বিদ্রোহে একটা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই বিদ্রোহ চলাকালে তিনি যে-সব চিঠি লিখেছিলেন তা অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। পরবর্তী কালে ১৮৮০ সালে অমৃতবাজার পত্রিকায় যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন [১২২], তাতেও আমরা এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাই। তাতে তিনি বলেছিলেন যে, বাংলার ৫০ লক্ষ নীলচাষী যে পরিমাণ দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিল "তার উদাহরণ জগতের ইতিহাসে খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। যেসব কৃষকদের জেলখানায় বন্দী করে রাখা হয়েছিল তারা পর্যন্ত নীল বুনতে রাজী হয় নি, যদিও তাদের যথাবিধি সরকারীভাবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে তাদের জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে, তাদের ঘর-দুয়ার, যা নীলকররা ধ্বংস করে দিয়েছে, সেগুলিকে আবার তৈরি করে দেওয়া হবে এবং তাদের স্ত্রী-পুত্র পরিবারদের, যারা ভিখারী হয়ে তখন দেশময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের ফিরিয়ে এনে দেওয়া হবে।"

শিশিরকুমার বলেন যে কৃষকদের সংঘবদ্ধ করায় কৃতিত্ব হচ্ছে দুইটি ব্যক্তির—কৃষ্ণনগরের নিকট চৌগাছা গ্রামের বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাসের। বিষ্ণুচরণ একজন ছোট জোতদার ও দিগম্বর একজন ছোট মহাজন ছিলেন। তাঁরা উভয়েই কিছু কাল বিভিন্ন কুঠিতে দেওয়ানের কাজ করেছিলেন, কিন্তু আত্মসম্মান বজায় রেখে কোথাও সেই কাজে বেশি দিন থাকতে পারেন নি। নীলকরদের অত্যাচারের ফলে ক্রমশঃ তাঁরা কৃষকদের পাশে এসে দাঁড়ালেন ও তাদের সংঘবদ্ধ করে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। "এই সময়টা ছিল যখন নানা সাহেব ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য বিদ্রোহ পরিচালনা করছেন। কিন্তু নানার প্রচেষ্টা ছিল সরকারের বিরুদ্ধে, আর এই দুই বিশ্বাসের প্রচেষ্টা ছিল নীলকরদের বিরুদ্ধে।" চৌগাছাব এই বিশ্বাসদ্বয়ের কথা লিখতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনীকার লিখেছেন, "কত ওয়াট, টাইলর, হ্যামডেন, ওয়াশিংটন নিরন্তর বাঙ্গলায় জন্মগ্রহণ করিতেছেন—ক্ষুদ্র বনফুলেব মত মনুষ্য নয়নান্তরালে ফুটিয়া ঝটিকাঘাতে ছিন্নভিন্ন হইতেছে, আমরা তাহা দেখিযাও দেখি না—আমরা তাহার চিত্র তুলিয়া রাখি না; কেননা আমরা ইতিহাস লিখিতে জানি না—সবে চিত্র আঁকিতে শিখিতেছি।...বাঙ্গালী মার খাইয়া অবশেষে মারিবার জন্য বুক বাঁধিয়া দাঁড়াইল। একখানি ক্ষুদ্র গ্রামের (চৌগাছার) দুই-জন সামান্য প্রজা।...এই দুই স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ বাঙ্গলার নিঃস্ব সহায়শূন্য প্রজাদের এক প্রাণে বাঁধিল—সিপাহীবিদ্রোহের সদ্যনির্ব্বাপিত আগুনের ভস্মরাশি লইয়া গ্রামে গ্রামে ছড়াইতে লাগিল।"

চৌগাছা ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামটি যখন ১৮৫৯ সালের শেষ দিকে ঘোষণা করল যে তারা আর নীল বুনবে না, তখন নীলকর ১০০০ লাঠিয়াল নিয়ে গ্রাম দুটিকে ধূলিসাৎ করবার জন্য অগ্রসর হল। নীলকররা এরূপভাবে ব্যবহার করতে সাহস করছিল সদর থানা কৃষ্ণনগর শহরের ৮।১০ মাইলের মধ্যে। এবারকার লড়াইয়ে গ্রামবাসীরা হটে গেল; নীলকরের লাঠিয়ালরা গ্রাম লুঠ করল, তারপর আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিল। কয়েকদিনের মধ্যে মামলা শুরু হয়ে গেল, অনেক কৃষককে গ্রেপ্তার করা হল, অনেক কৃষকের জেল হল। বিশ্বাসদের ধরবার অনেক চেষ্টা করা হল, তাঁরা গা ঢাকা দিয়ে থাকলেন। বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর মামলার সমস্ত খরচ নিজেরা দিলেন। যারা জেলে গেল তাদের পরিবার পালনের খরচও তাঁরা দিলেন। এইভাবে তাঁদের সঞ্চিত ১৭ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেল। তাঁদের নিজেদের জীবনও সব সময়ই নীলকরের লাঠিয়ালদের

জন্য বিপন্ন হয়ে থাকত। রাত্রিকালে যে কোনো সময়ে তাঁরা আক্রান্ত হতে পারতেন। তাঁরাও সব সময় যে কোনো হামলার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতেন। স্বেচ্ছা-সেনাবাহিনী গ্রামকে দিবারাত্র পাহারা দিত।

বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর দেখলেন যে একটা লড়াইয়ে অন্তত নীলকরদের হারাতে না পারলে গ্রামে আর কারও বাস করা সম্ভব হবে না। শুধু চৌগাছাই নয়, আশেপাশের গ্রাম থেকেও মেয়ে ও শিশুদের অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হল। বরিশাল থেকে কয়েকজন নামকরা লাঠিয়াল নিয়ে আসা হল। কৃষকরা দলে দলে লাঠিচালনা, সড়কিচালনা ইত্যাদি শিখতে লাগল। একটি রায়তও নীল বুনল না; কিছুদিনের মধ্যেই কাঠগড়া কুঠি (চৌগাছা যার অন্তর্গত ছিল) বন্ধ হয়ে গেল।

কৃষকদের ভালো করে জব্দ করবার জন্য এবার নীলকর ১৫০০ লাঠিয়াল নিয়ে লোকনাথপুর আক্রমণ করল। এবার কৃষকরা এই আক্রমণের জন্য তৈরিই ছিল। অনেকক্ষণ প্রচণ্ড লাঠি-যুদ্ধের পর নীলকরের লাঠিয়ালরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। কৃষকদের এইটাই হল প্রথম বড় জয়। এরপর তারা এইরকম আরও অনেক লড়াইয়ে জয়লাভ করেছিল। শিশিরকুমার সর্বশেষে উপরোক্ত প্রবন্ধে অনুযোগ করে লিখেছিলেন যে তখনকার সংবাদপত্রগুলি বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বরের সম্বন্ধে কিছু লেখে নাই; "তাঁদের নাম পর্যন্ত কেউ জানে না এবং এই হচ্ছে সর্বপ্রথম যে তাঁদের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে লেখা হচ্ছে। উভয়েরই বংশধর এখনও বেঁচে আছেন। দিগম্বরবাবু একেবারেই সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর পুত্র মোটেই ভালো অবস্থায় দিন যাপন করছেন না।"

এই প্রসঙ্গে সতীশচন্দ্র মিত্র যা লিখে গিয়েছেন তাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

"শুধু চৌগাছার বিশ্বাসেরা নহেন, দেশমধ্যে এমন অনেক লোকের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই বিদ্রোহ স্থানিক বা সাময়িক নহে; যেখানে যতকাল ধরিয়া বিদ্রোহের কারণ বর্তমান ছিল সেখানে ততকাল ধরিয়া গোলমাল চলিয়াছিল। উহার নিমিত্ত যে কত গ্রাম্য বীর ও নেতার উদয় হইয়াছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহাদের নাম নাই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকে অবস্থানুসারে যে বীরত্ব, স্বার্থত্যাগ ও মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার কাহিনী শুনিবার ও শুনাইবার জিনিস। যাহারা তাহার চাক্ষুষ বিবরণ দিতে পারিতেন, আজ ৬৪ বৎসর পরে (১৩২৯ সালে লিখিত) তাঁহাদের

অধিকাংশই কাল-কবলিত। এখনও গল্পগুজবে যাহা আছে, শীঘ্রই তাহা লুপ্ত হইবে। প্রাচীন যশোহরের মানচিত্রে কত শত গ্রামের নীলকুঠির চিত্র আছে; এখনও উহার অনেক ভগ্নস্তূপ ইমারতের গায়ে বা রাস্তার খোয়ায় আত্মগোপন করে নাই। ঐ সকল কুঠির তিরোভাবের সঙ্গে কিছু ঐতিহাসিকতা বিজড়িত আছে।...কিন্তু কে আজ সেই যুদ্ধক্ষেত্রের তালিকা নির্ণয় করিবে? লড়াই ত অনেক হইয়াছিল, আজ কয়জনে তাহার খবর রাখে?...এখনও কৃষকের মুখে গ্রাম্য সুরে শুনিতে পাওয়া যায়:

'মোল্লাহাটির লম্বা লাঠি, রইল সব হুদোর আঁটি।

কোলকাতার বাবু ভেয়ে, এল সব বজরা চেপে লড়াই দেখবে বলে।'

"লড়াই হইয়াছিল, কত লোক কত স্থানে হত বা আহত হইয়াছিল, তাহার খবর নাই। খবর এইটুকু আছে, তাহাদের যন্ত্রণা ও মৃত্যু সফল হইয়াছিল, জেদ বজায় ছিল। মোল্লাহাটির যে লম্বা লাঠির বলে নীলকরেরা বাঘের মত দেশ শাসন করিতেন, প্রজারা চাষ বন্ধ করিলে সে লাঠির আঁটি পড়িয়া রহিল, উহা ধরিবার লোক জুটিল না। নীলকরের উৎপাৎ বন্ধ হইয়া আসিল।"

ইতিহাসকার সতীশচন্দ্রের এই লেখা প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বের। কিন্তু বাঙালীর প্রথম মুক্তি-সংগ্রামের গ্রাম্য বীরদের কাহিনী দুর্ভাগ্যবশত এখনও লিপিবদ্ধ হয় নি। ঘটনার একশো বছর পরে লিপিবদ্ধ না করার ফলে আজ অনেক কিছু লুপ্ত হয়ে গিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও এখনও গল্প-গুজবে, কিংবদন্তীতে যা আছে, তা সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হলে ইতিহাসের পক্ষে তার মূল্য কম হবে না।

এই সংগ্রাম পরিচালনা করবার জন্য কৃষকদের মধ্য থেকেই এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অনেক নেতা বেরিয়ে এসেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কৃষ্ণনগরের ম্যাজিস্ট্রেট হার্সেলকে নীল-কমিশন জিজ্ঞাসা করেছিল: "আপনি কি এমন মোড়লকে জানেন যে নিজের জ্ঞানবুদ্ধি ও দৃঢ় চরিত্রের দ্বারা রায়তদের উদ্বোধিত করতে পারে ও অন্যান্য গ্রামের রায়তদেরও একতাবদ্ধ করতে পারে?" এ প্রশ্নের জবাবে হার্সেল বলেছিলেন, "আমি এই ধরনের একশত লোকের নাম করতে পারি। একটা গ্রামে এমন সব নেতাদের আবির্ভাব হয়েছে যারা অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে দ্রুত প্রভাব বিস্তার করেছে।" [১২৬]

এই রকম কৃষক নেতার দু-একটি নাম এস্থলে করা যেতে পারে। [১২৭] কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী আসাননগরের মেঘাই সর্দার নীলকরের বিরুদ্ধে চাষীদের ঐক্যবদ্ধ করেন। অনেকবার নীলকরের লাঠিয়ালদের সঙ্গে মেঘাই সর্দারের দলের সংঘর্ষ হয়। একবার সুযোগ পেয়ে নীলকরের লোকরা মেঘাইকে নৃশংসভাবে রাস্তার উপর হত্যা করে। মেঘাই-এর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগঠন করার জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। শেষ পর্যন্ত এই কৃষক-নেত্রীর কি পরিণতি হয়েছিল জানা যায় না। এই কাহিনী আসাননগরের প্রাচীন গ্রামবাসীদের নিকট এখনও শোনা যায়।

বাঁশবেড়িয়ার বৈদ্যনাথ ও বিশ্বনাথ সর্দারের কাহিনীটিও বিখ্যাত। তাঁরা গ্রামের কৃষকদের, বিশেষ করে গ্রামের বাগদী লাঠিয়ালদের নিয়ে একটি দল গঠন করেছিলেন এবং কয়েকবার বাঁশবেড়িয়া ও খাল-বোয়ালিয়ার নীলকুঠির উপর সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে লুঠ করেছিলেন। শোনা যায় যে এই আক্রমণের সময় নীলকর সাহেবরা ও তাদের মেমরা পর পর কয়েকদিন কুঠির পাশে কলিঙ্গা খালের জলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে কালো হাঁড়ি মাথায় দিয়ে কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়েছিল। নীলকরের আমলারাও তাঁদের হাত থেকে রেহাই পায় নি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'ইছামতীতে' এইরকম একটি 'ডাকাতের' দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বৈদ্যনাথ ও বিশ্বনাথ চৌগাছার পার্শ্ববর্তী ডাকাতিগাড়ি নামক অঞ্চলে আস্তানা করে বাস করতেন। চৌগাছার বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর যখন বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরেন তখন বৈদ্যনাথ ও বিশ্বনাথ তাঁদের অন্যতম প্রধান সহায়ক হন। পরে বিশ্বনাথকে আসান-নগরে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। আসাননগরের গ্রামের ঐ মাঠকে সেই থেকে ফাঁসিতলার মাঠ বলা হয়। কুমুদরঞ্জন মল্লিক তাঁর 'নদীয়া কাহিনী'তে বৈদ্যনাথ ও বিশ্বনাথকে সাধারণ ডাকাত বলে বর্ণনা করেছেন।

কৃষ্ণনগর বারের একজন বিশিষ্ট সদস্য ও কৃষ্ণনগর মিউনিসিপালিটির ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান শ্রীসুধীন্দ্রচন্দ্র মৌলিক মহাশয়ের একজন পূর্বপুরুষ নদীয়ার জয়রামপুর গ্রামে (বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তানে অবস্থিত) বিদ্রোহী কৃষকদের পরিচালনা করেছিলেন। এইজন্য অনেকদিন ধরে তাঁদের পরিবারের উপর সরকারী জুলুমও চলেছিল। যে দামামা বাজিয়ে কৃষকদের সে সময়ে

সংগ্রামে আহ্বান করা হত, সেই দামামাটি এখনও তাঁদের বাড়িতে সযত্নে রক্ষিত আছে।

নীল-বিদ্রোহের আর একজন গ্রাম্য নেতার নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি হচ্ছেন ঝিনাইদহের মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বহুদিন পূর্বে তিনি নিজেও কিছু কালের জন্য নীলকরের দেওয়ান ছিলেন, তারপর তিনি নড়াইলের দুর্ধর্ষ জমিদার রামরতন রায়ের নায়েব হিসেবে কাজ করতেন। তিনি নীল-কমিশনে একজন সাক্ষী ছিলেন। দামুরহুদা অঞ্চলে তিনি কৃষকদের সংঘবদ্ধ করেন ও সশস্ত্র সংগ্রামে নীলকরদের প্রতিরোধ করেন। মোল্লাহাটির কুখ্যাত ম্যানেজার ফরলং নীল-কমিশনের কাছে অভিযোগ করেছিল যে নিশ্চিন্দপুর কুঠির গণ্ড-গোলের মূলে ছিল এই মহেশচন্দ্র। আর্চিবল্ড হিল মহেশচন্দ্রের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেন। মহেশচন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে, তিনি প্রতি রাত্রে কৃষকদের নিয়ে মিটিং করতেন, কৃষকরা যাতে আর নীল না বোনে এবং নীলকরের লোকেরা যাতে গ্রামে ঢুকতে না পারে তার জন্য তাদের উত্তেজিত করতেন।

কৃষকদের দেশব্যাপী এতবড একটা সংগ্রাম নিশ্চয়ই হঠাৎ একদিনে হয়ে যায় নি। এর জন্য কৃষকদের প্রচুর সভা-সমিতি, আলোচনা করতে হয়েছিল, কর্মপদ্ধতি ও লডাইয়ের কৌশল নির্ণয় করতে হয়েছিল। অভিজ্ঞ নেতার অভাব গ্রামবাসীদেরই যতটা সম্ভব পূরণ করতে হয়েছিল। শহরের লোকের নিকট থেকে কোনোরূপ সাহায্য না পেয়েও কৃষকরা যে এতদিন ধরে এতবড় একটা বিরাট সংগ্রাম চালাতে পেরেছিল, তাতে তাদের সুপ্ত বৈপ্লবিক শক্তির পরিচয়ই পাওয়া যায়।

বহুদিনব্যাপী এই যে গণ-সংগ্রাম, কৃষকদের এই যে বীরত্বপূর্ণ মুক্তি-সংগ্রাম মূলতই গ্রামবাসীদের নিজেদের প্রচেষ্টায় হয়েছিল। কয়েকটি গৌরবময় উদাহরণ ছাড়া এই সংগ্রামে কৃষকরা শিক্ষিত শহরবাসীদের কাছ থেকে বিশেষ কোনো সাহায্য পায় নি, যদিও এটা ঠিক যে তাদের সহানুভূতি কৃষকদের দিকেই ছিল। গ্রামবাসীরা নিজেদের প্রচেষ্টায় দেশব্যাপী এত বড়ো একটা সংগ্রাম চালাতে পারে এ-কথাটা তারা কল্পনাও করতে পারে নি। এবং এই গণ-অভ্যুত্থানের পিছনে যে চক্রান্তকারীদের হাত রয়েছে এটা তারা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরেই নিয়েছিল। [১২৮] এবং নীল-কমিশনও এই চক্রান্তকারীদের আবিষ্কার করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল।

অনাথনাথ বসু এই সম্বন্ধে বলেছেন : "যশোহরের আইন-ব্যবসায়ীগণ নীলকরদিগের অত্যাচারের ভয়ে কৃষকগণের পক্ষাবলম্বন করিতে সাহস করিতেন না। কলিকাতা হইতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েশনের সদস্যগণ মধ্যে মধ্যে দুই একজন মোক্তারকে উৎপীড়িত কৃষকগণের পক্ষাবলম্বনের জন্য প্রেরণ করিয়া মহৎ উপকার করিয়াছিলেন।...কলিকাতাবাসী-অনেকে নীলকরদিগের অত্যাচারের জন্য কৃষকদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও দূর হইতে তাহাদের বিশেষ কোন উপকার করিতে পারিতেন না।" [১২৯] ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশনের মোক্তার প্রেরণ সম্বন্ধে হার্সেল নীল-কমিশনে সাক্ষ্য-দান কালে বলেছিলেন : "আমি ঐ এসোশিয়েশনের নিকট থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি যাতে তাঁরা মোক্তার পাঠানোর ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন। আমি সেই চিঠি আপনাদের নিকট পেশ করছি।" [১৩০] মামলায় কৃষকদের সমর্থন করার জন্য হরিশচন্দ্র যে কলকাতা থেকে মোক্তার পাঠিয়েছিলেন তা সকলেই জানেন এবং হরিশচন্দ্র ঐ সভার একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। এই কারণেই হয়তো অনেকের ধারণা হয়েছিল যে, হয়তো বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশনই মোক্তারদের পাঠিয়েছিল। আর এমনও হতে পারে যে সত্যসত্যই এই অ্যাসোশিয়েশনই মোক্তারদের পাঠিয়েছিল, কিন্তু প্রকাশ্যে তা স্বীকার করতে সাহস পায় নি।

শহর থেকে চক্রান্তকারীরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে কৃষকদের উত্তেজিত করত কিনা, এই সম্বন্ধে হার্সেল বিশেষভাবে তদন্ত করে নীল-কমিশনকে বলেছিলেন, "অনেক লোকের বিরুদ্ধে কৃষকদের উত্তেজিত করার অভিযোগ আনা হয়েছে। এই ধরণের যেসব লোকের সন্ধান পাওয়া যায়, তারা হচ্ছে জমিদারের কর্মচারী কিংবা জমিদাররা নিজেরাই।" এই 'উস্কানীদাতাদের' মধ্যে মহেশ চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষকরে উল্লেখ করে হার্সেল বলেন যে "দামুরহুদা মহকুমাতেই তাঁর বাস, সুতরাং বইরের আমদানী চক্রান্তকারী বলে তাঁকে অভিহিত করা যায় না; এই একটি উদাহরণ ছাড়া জেলার সীমানার বাইরে থেকে এসে কৃষকদের উত্তেজিত করেছে বলে এমন কোনো লোককে আমার নিকট হাজির করাও হয় নি, আমি সেরকম কোনো নামও শুনি নি।" হার্সেল তারপর বলেন যে সব রায়তরা কৃষ্ণনগর শহরে আসত তাদের কলকাতায় গিয়ে হরিশচন্দ্র মুখার্জীর সঙ্গে দেখা করতে বলা হত; এইভাবে অনেক রায়ত কলকাতায় গিয়ে তাঁকে

দিয়ে দরখাস্ত লিখিয়ে নিয়েছে ও উপদেশ নিয়েছে, "কিন্তু আমি মনে করি না যে সে উপদেশগুলি অসঙ্গত হত।" [১৩১] এসম্বন্ধে সব তথ্য বিবেচনা করে নীল-কমিশনও রায় দিয়েছিলেন যে নীল-বিদ্রোহের জন্য সরকারী কর্মচারী কিংবা পাদ্রী, কিংবা জমিদার, কিংবা বাইরের কোনো চক্রান্তকারী—কারোর ঘাড়ে দোষ চাপান যায় না। নীলচাষের গলদপূর্ণ অবস্থাই এই বিদ্রোহের জন্য দায়ী ; কৃষকরা এই দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য নিজেরাই নিজেদের সংগঠিত করেছিল ও এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে গিয়ে পরস্পরকে সাহায্য করেছিল [১৩২] নদীয়ার সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাকলিনও বলেছিলেন যে, বাইরে থেকে এসে কৃষকদের উস্কানি দিয়েছে এমন কোনো লোকের খবর তিনি পান নি। এমনকি আর্চিবল্ড হিলও নীল-কমিশনকে বলেন যে, "না, এমন কোনো লোকের কথা আমার কানে পৌঁছয় নি।"

এই নীল-বিদ্রোহে কৃষকদের ভূমিকা সম্বন্ধে একশত বৎসর পূর্বে হরিশচন্দ্র যা লিখে গিয়েছিলেন আজও তার একটি বর্ণও ম্লান হয় নি—"বাংলাদেশ তার কৃষকদের সম্বন্ধে নিশ্চয়ই গর্বিত হতে পারে। নীল-আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের রায়তরা যে নৈতিক শক্তির এত সুস্পষ্টভাবে পরিচয় দিয়েছে তা আর কোনো দেশের কৃষকদের মধ্যে দেখা যায় না। দরিদ্র, রাজনৈতিক জ্ঞান ও ক্ষমতা বিহীন, নেতৃত্বশূন্য হয়েও এই সব কৃষকরা এমন একটা বিপ্লব ঘটাতে সমর্থ হয়েছে যা গুরুত্বে ও মহত্বে কোনো দেশের সামাজিক ইতিহাসের বিপ্লবের তুলনায় নিকৃষ্ট নয়। তাদের এমন শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে যাদের হাতে ছিল দুর্ধর্ষ ক্ষমতার সবরকম উপকরণ। সরকার ছিল তাদের বিরুদ্ধে, সংবাদপত্রগুলি তাদের বিরুদ্ধে, আইন-আদালত সবই তাদের বিরুদ্ধে—এতগুলি শক্তির বিরুদ্ধে তারা যে সফলতা অর্জন করেছিল তার সুফল সমাজের সকল শ্রেণী ও দেশের ভবিষ্যৎ বংশধররা উপভোগ করতে পারবে।...ইতিমধ্যেই রায়তদের অত্যাচারীরা বুঝতে পেরেছে যে তাদের স্বেচ্ছাচারী রাজত্বের অবসান হতে চলেছে।...এই বিপ্লবের জন্য তাদের অসংখ্য দুর্ভোগ ভোগ করতে হচ্ছে—প্রহার, অপমান, গৃহচ্যুতি, সম্পত্তি-ধ্বংস সবই তাদের ভাগ্যে ঘটেছে, সব-রকমের অত্যাচার তাদের উপর হয়েছে। গ্রামকে গ্রাম আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, পুরুষদের ধরে নিয়ে কয়েদ করে রাখা হয়েছে, স্ত্রীলোকদের উপর পাশবিক অত্যাচার হয়েছে, ধানের গোলা ধ্বংস করা হয়েছে, সব-রকমের নৃশংসতা তাদের উপর হয়েছে। তবুও রায়তরা মাথা

নোয়ায় নি···যদি তারা আরও কিছুদিন এইভাবে নির্যাতন সহ্য করতে পারে, তাদের সামাজিক অবস্থায় একটা বিপ্লব এসে যাবে, যার প্রতিক্রিয়া দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে।" [১৩৩]

শিশিরকুমার ঘোষও নীল-বিদ্রোহের তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: "এই নীল-বিদ্রোহই সর্ব প্রথম দেশের লোককে রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা শিখিয়েছিল। বস্তুত বাংলাদেশে ব্রিটিশ রাজত্বকালে নীল-বিদ্রোহ হচ্ছে প্রথম বিপ্লব।" [১৩৪]

হরিশচন্দ্র, শিশিরকুমার ও বঙ্কিমচন্দ্র

নীলকরদের অত্যাচারের কথা বাঙালী পরিচালিত সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে বের হত, কিন্তু নীলচাষীদের পক্ষে কোনোপ্রকার আন্দোলন বলে কিছু গড়ে ওঠে নি। রামমোহন ও দ্বারকানাথ নীলকরদের ও নীলচাষকে সমর্থন করেছিলেন বলে শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে অনেকদিন পর্যন্ত এ বিষয়ে অনেক রকম বিভ্রান্তিও ছিল। তাছাড়া তখনকার শিক্ষিত বাঙালীরা নিজেদের চাকরির সমস্যা, নয়তো অত্যন্ত উচ্চ ধরনের আধ্যাত্মিক চিন্তা, নয়তো সমাজ-সংস্কার ইত্যাদির সমস্যা নিয়েই বেশির ভাগ ব্যস্ত থাকতেন। বাংলা-দেশের শতকরা ৮০।৯০ জন লোক গ্রামে বাস করলেও এবং তাদের অধিকাংশ কৃষক হলেও তাঁরা দেশের অগণিত কৃষকদের দুরবস্থা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অভিশাপ, জমিদার-মহাজনদের শোষণ ও অত্যাচার—এই সব গুরুতর জাতীয় সমস্যাগুলি নিয়ে বড একটা মাথা ঘামাতেন না+.

১৮৪৯ সালে অক্ষয়কুমার দত্ত-ই সর্বপ্রথম 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় পরিষ্কার-ভাবে নীলচাষীদের দুর্দশার কথা প্রকাশ করেন। তারপর থেকেই এই সব খবর বাঙালী পরিচালিত কাগজগুলিতে বার হতে শুরু করে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'প্রভাকর' পত্রিকায় নীলকরদের বিরুদ্ধে রানী ভিক্টোরিয়ার দয়া ভিক্ষা করে কবিতা লিখেছিলেন। হরিশচন্দ্র মুখার্জী তাঁর 'হিন্দু পেট্রিয়টে' এ-বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে লাগলেন এবং সিপাহী-বিদ্রোহ শেষ হতে না হতে নীল আন্দোলনই হরিশচন্দ্রের নিকট প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াল। এবং হরিশচন্দ্রের চেষ্টাতেই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশন নীলচাষীদের পক্ষ অবলম্বন করেন।

হরিশচন্দ্রের এই গৌরবময় কাহিনী সম্বন্ধে যোগেশচন্দ্র বাগল বলেছেন: "ইংরেজের স্বৈরাচারের কথা হিন্দু পেট্রিয়টে যেরূপ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতে লাগিল এমনটি তখনকার কোন পত্রিকায়ই বাহির হইত কিনা সন্দেহ। যশোহরের শিশিরকুমার ঘোষ, কৃষ্ণনগরের মনোমোহন ঘোষ, কুমারখালির হরিনাথ মজুমদার ও মথুরানাথ মৈত্রেয়, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতির দ্বারা প্রেরিত নীল-করদের অত্যাচারের কথা হরিশচন্দ্র যথারীতি পেট্রিয়টে প্রকাশ করিতেন এবং তাহার উপর টিপ্পনী ও মন্তব্যাদি লিখিতেন। এ কারণে কলিকাতার ইংরেজ ব্যবসায়ী মহল এবং ইংরেজ পরিচালিত পত্রিকাসমূহ তাঁহার উপর খড়্গহস্ত

হইল। কিন্তু ১৮৬০ সালে নিরীহ নীলচাষীরা যখন নীলকরদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে, জীবন যায় তাও স্বীকার তবু তাহারা নীল বুনিবে না এবং কলিকাতার হিন্দু পেট্রিয়ট তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়া ইহার ন্যায্যতার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিলেন তখন তাহাদের ক্রোধের সীমা রহিল না। ইহার ফল হরিশচন্দ্রের নিজের পক্ষে…বিষময় হইয়াছিল।" [১৩৫]

১৮৬০ সালে যখন নীলচাষীদের বিদ্রোহ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে ও চাষীরা যখন কিছুতেই আর নীলচাষ করতে রাজী হচ্ছে না, তখন সরকার ১৮৩০ সালের মতো আবার আইন জারী করলেন যে চুক্তিবদ্ধ চাষীরা যদি নীল চাষ না করে তাহলে তাদের ফৌজদারী আদালতে শাস্তি দেওয়া হবে। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটরা গ্রামের পর গ্রাম থেকে লোকদের ধরে দলে দলে জেলে পাঠাতে লাগল। দেখতে দেখতে জেলগুলি ভর্তি হয়ে গেল ও কৃষকদের উপর অনেক রকমের অত্যাচার শুরু হয়ে গেল। এই সময় চাষীদের প্রতিনিধিরা কলকাতায় এসে হরিশচন্দ্রের নিকট পরামর্শ ও সাহায্য চাইত। হরিশচন্দ্রের দ্বার তাদের জন্য সব সময়ই খোলা থাকত। "নীল-হাঙ্গামার সময় হরিশচন্দ্রের গৃহ অতিথি-শালায় পরিণত হইয়াছিল। এই সময়ে পেট্রিয়ট-এর নিয়মিত খরচ চালাইয়া তাঁহার বেতনের যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিত তৎসমুদয়ই নীলচাষীদের সেবায় ব্যয়িত হইত।" [১৩৬]

কৃষকদের সংগ্রামে হরিশচন্দ্রের সাহায্য যে কতখানি মূল্যবান ছিল তা তখনকার দেশের বাস্তব অবস্থার দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ইংরেজ বণিক ও ম্যাজিস্ট্রেটদের দৌরাত্ম্যে মফস্বলে উকিল-মোক্তাররা প্রজাদের পক্ষ সমর্থন করতে স্বভাবতই সাহস করতেন না। কাজেই নীলকরদের বিরুদ্ধে মামলায় রায়তদের পক্ষ সমর্থন করবার জন্য বড় একটা কাউকে পাওয়া যেত না। হরিশচন্দ্র অনেক চেষ্টা করে দু-একজন মোক্তারকে মফস্বলে রায়তদের মামলা তদ্বিরের জন্য পাঠাতে সমর্থ হয়েছিলেন। যেসব মোক্তাররা সাহস করে রায়তদের পক্ষ সমর্থন করতেন তাঁদের অনেক সময় বিপদে পড়তে হত, এমন-কি জেলেও যেতে হত। ১৮৬০ সালের ১৪ই এপ্রিল তারিখের 'ইংলিশম্যান' কাগজের এক সংবাদে জানা যায় যে, নীলকরদের বিরুদ্ধে নীল না বুনতে উত্তেজিত করবার জন্য কৃষ্ণনগরের একজন মোক্তারকে ছয় মাস কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সংবাদটি উদ্ধৃত করে 'হিন্দু পেট্রিয়টে' হরিশচন্দ্র মন্তব্য করেছেন যে, "এমনকি নতুন আইনেও এই রকম কাজ বেআইনী নয়।"

হরিশচন্দ্র নীল-কমিশনের নিকট সাক্ষ্যদান কালে বলেন যে, উক্ত আইনের দৌলতে সরকারী কর্মচারী, পুলিশ ও নীলকরদের অত্যাচার আবার বেড়ে গেল। ছোট স্যাঁতসেঁতে গুদামে রায়তদের আটক রাখা হত, বলপূর্বক সম্পত্তি লুণ্ঠন ও নীলকরদের প্ররোচনায় পুলিশ কর্তৃক রায়তদের স্ত্রীলোকদের উপর অনেক রকমের অত্যাচার-উৎপীড়ন হত। হরিশচন্দ্র নীল-কমিশনকে বলেন যে, "আমি নীল-হাঙ্গামার বিষয় খুব যত্নের সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখেছি। তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, বর্তমানে নীলচাষ রায়তদের পক্ষে সর্বপ্রকারে ক্ষতিকর।"

নীলচাষীরা যখন প্রতিজ্ঞা করেছে যে তারা জেলে যাবে, সব রকমের অত্যাচার সহ্য করবে, প্রয়োজন হলে প্রাণও দেবে, তবু তারা কিছুতেই নীল বুনবে না—এই রকম যখন দেশের অবস্থা তখন সদাশয় বাংলা সরকার ঘোষণা করল যে নীলকরদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এই সম্বন্ধে হরিশচন্দ্র 'হিন্দু পেট্রিয়টে' ১৮৬০ সালের ১২ই মার্চ লিখেছিলেন: "উৎপীড়নের জাল ভালো-ভাবেই বিস্তার করা হয়েছে।...অসংখ্য রায়তদের জেলে পোরা হয়েছে। এই শাস্তি দেওয়া একেবারেই বিফল হয়েছে, কারণ তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রায়তদের দিয়ে নীল বপন। সরকার এখন কৌশল বদলে ফেলেছেন। মফস্বলে ম্যাজিস্ট্রেটরা এখন প্রতিবিঘা নীলজমির জন্য নীলকরদের ২০ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে শুরু করেছেন। মিঃ হার্সেল খাল-বোয়ালিয়া কুঠির জন্য ১৯ টাকা করে দিচ্ছেন। এমনকি এই অসঙ্গত শর্ত অনুসারেও এই রকম ক্ষতিপূরণের হার বিঘা প্রতি ৮ অথবা ৯ টাকার বেশি হতে পারে না। গত বছর কাছিকাটা কুঠি ১৯০০০ বিঘার চাষে ১,৪৫,০০০ টাকা লাভ করেছিল। এই বৎসর ঐ কুঠির ৬০০০ বিঘায় নীলচাষ হয় নি, সুতরাং তারা এর জন্য ১,২০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবে। যদি ১৯,০০০ বিঘার জন্য তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় তাহলে তারা পেতে পারে ৩,৮০,০০০ টাকা, অর্থাৎ তারা নীলচাষ করে যা লাভ করে তার ৩ গুণ। এমনিতেই যখন নীলকররা দুই-তিন গুণ লাভ করবে, তখন তাদের কর্মচারীদের তারা হুকুম দিয়েছে যেন এ বৎসর কোনো নীল না বোনা হয়।"

এইভাবে হরিশচন্দ্র দিনের পর দিন 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর মারফত সরকার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন ও রায়তদের বিপদের দিনে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের যথাসম্ভব সাহায্য করছিলেন ও উৎসাহ

দিচ্ছিলেন। এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই সময় বাংলাদেশে অথবা ভারতবর্ষে কোনোপ্রকারের জাতীয় সংগঠনও ছিল না কিংবা কোনোপ্রকারের সংঘবদ্ধ আন্দোলনও ছিল না। তাছাড়া সিপাহী-বিদ্রোহ দমন করবার জন্য ভারত সরকার তখনও সন্ত্রাস-নীতি চালিয়ে যাচ্ছে, যার ফলে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করার ভয়ে সরকার-বিরোধী কথাবার্তা বলতে কেউই বড় একটা সাহস করত না। এই অবস্থায় হরিশচন্দ্র, প্রায় একাকী বললেই চলে, যেরূপ নির্ভয়ে নীলচাষীদের হয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তার উদাহরণ খুব বেশি মেলে না।

এই জন্য নীলকরদের কাছ থেকে তিনি যথেষ্ট 'পুরস্কার'ও পেয়েছিলেন। এমন কোনো ইতর ভাষা নেই যা তারা তাঁর প্রতি প্রয়োগ করে নি। একজন নদীয়ার নীলকর তাঁকে 'নিগার' বলে সম্বোধন করে গালিগালাজ দিয়ে যে চিঠি লিখেছিল তা তিনি নমুনাস্বরূপ হিন্দু পেট্রিয়টে ছাপিয়ে দিয়েছিলেন। আরও তাৎপর্যপূর্ণ কথা হল, হরিশচন্দ্র চিঠিটা ছাপিয়েছিলেন 'Americanism in Nadia' নাম দিয়ে। বাস্তবিক পক্ষে আমেরিকার দাসপ্রভুদের সঙ্গে নীলকরদের বিশেষ কোনো তফাত ছিল না এবং একই মনোভাব নিয়ে তারা ভারতবাসীদের দেখত। [১৩৭]

অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে হরিশচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে ও ১৮৬১ সালের ১৪ই জুন তারিখে মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর এই অকাল মৃত্যু বাংলাদেশের পক্ষে বজ্রাঘাতের মতো। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ কতখানি বিচলিত হয়ে পড়েছিল তা তখনকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত মন্তব্যগুলি থেকেই বোঝা যায়। [১৩৮]

কালীপ্রসন্ন সিংহ বলেছিলেন: "ভারত ভূমি তাঁহার অকাল মৃত্যুতে যত অপার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, ত্রিংশৎ সালের ভয়ানক জলপ্লাবনে, বিগত-বিদ্রোহে ও বর্তমান দুর্ভিক্ষে তত ক্ষতি স্বীকার করে নাই। তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার যত উন্নতি সাধন করিয়াছেন, সতীদাহ-নিবারণে রাজা রামমোহন রায়, বিধবা-বিবাহ প্রচলনে বিদ্যাসাগরও তত উপকার সাধন করিতে পারেন নাই।"

'সোমপ্রকাশ' (১৭ই জুন, ১৮৬১) লিখল: "তিনি একাকী নীলপ্রধান প্রদেশের প্রজাগণকে রাক্ষস সদৃশ নৃশংস নীলকরদিগের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন, একথা বলিলে অত্যুক্তি বোধহয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এতদ্বিষয়ে

তাঁহার এত উদ্যোগ, এত চেষ্টা ও এত পরিশ্রম ছিল যে, আমরা সেই অত্যুক্তি-দোষ স্বীকারেও অসম্মত নহি। তিনি নীলকরদিগের গর্ব চূর্ণ করিবার আদি কারণ সন্দেহ নাই।"

হরিশচন্দ্রের এককালের সহকর্মী এবং 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'মুখার্জিস ম্যাগাজিনে' (জুন ১৮৬১) লিখেছিলেন :

> "A thunderbolt has fallen upon native society. Hushed is every voice and fixed is every eye. The friend of the poor and the menter of the rich, the spokesman, the patriot, the brave heart that defied danger and battled foremost in the strife of politics has been swept away like a vision from our aching eyes....our loss is great. We were only just pulling forth the buds and blossoms of a healthy existence. From the darkness of ages we were only faintly emerging into light, groping our way through a choking mass of prejudices and struggling fully, though earnestly, through obstruction and difficulty. We had only recently learnt the value of political liberty......Harish Chandra Mukherjee was the soul of this movement."

হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর বাংলার চাষীরাও তাদের মনের কথা এইভাবে ব্যক্ত করেছে :

> "নীল বাঁদরে সোনার বাঙ্গলা করল এবার ছারখার
> অসময়ে হরিশ মল, লঙের হল কারাগার।"

হরিশচন্দ্রের কাহিনী তাঁর মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ হয় নি। নীলকররা তাঁর প্রতি যে ক্ষিপ্ত হয়েছিল তা পূর্বে বলা হয়েছে। আমরা আরও দেখেছি যে আর্চিবল্ড হিলস্ কর্তৃক হরমণি-হরণের ব্যাপারটা হরিশচন্দ্র হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। এই জন্য হিলস্ হরিশচন্দ্রের বিরুদ্ধে ১০ হাজার টাকা খেসারত দাবি করে মানহানির মামলা এনেছিল। মামলা চলাকালে হরিশচন্দ্রের মৃত্যু হয়। এতেও বীরপুঙ্গব হিলসের ক্রোধ কমল না। সে তখন হরিশচন্দ্রের বিধবা স্ত্রীকে প্রতিবাদী করে আলিপুর কোর্টে ১০ হাজার টাকা দাবি করে মোকদ্দমা চালাতে লাগল। এই মোকদ্দমার জন্য নিঃসহায় হরিশচন্দ্রের বিধবাকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। এই মামলা

তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল না। বাঙালীর হিতার্থে হরিশচন্দ্র নির্ভীকভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন বলেই বাঙালীর শত্রুরা একজন নিঃসহায় বিধবার উপর অতি নীচভাবে তার প্রতিশোধ নিচ্ছিল। সেই দুঃসময়ে বাঙালীরা হরিশচন্দ্রের বিধবার পাশে এসে দাঁড়ায় নি। এমনকি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশন, হরিশচন্দ্র যার একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন, তারাও নয়।

খুব দুঃখের সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী এ বিষয়ে লিখেছিলেন : "হিল্‌সের পশ্চাতে নীলকরগণ ছিলেন, হরিশের বিধবার পশ্চাতে কেহই ছিল না। এদেশীয়দের মধ্যে সে একতা কোথায়? কাজেই বন্ধুদিগের পরামর্শে হরিশের বিধবাকে আপসে মিটাইতে হইল। কিন্তু তথাপি বাদীর খরচা হিসাবে এক হাজার টাকা দিবার জন্য অঙ্গীকার করিতে হইল। এই এক হাজার টাকা অনেক কষ্টে সংগ্রহ করিয়া বিধবার বসতবাটিখানি ক্রোক হইতে উদ্ধার করিতে হইয়াছিল।" [১৩৯] তৎকালীন বাঙালী শিক্ষিত 'মধ্যবিত্ত'-শ্রেণীর সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রীর এই নির্ভীক সত্যভাষণ তাঁদের পক্ষে খুব গৌরব-জনক নয়।

নীল-বিদ্রোহের প্রসঙ্গে হরিশচন্দ্র মুখার্জী, দীনবন্ধু মিত্র, মধুসূদন দত্তের নাম ছাড়া আর যার নাম উল্লেখযোগ্য তিনি হচ্ছেন অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শিশিরকুমার ঘোষ। নীল-বিদ্রোহের প্রাক্কালে, ১৮৫৮ সালে, তাঁর বয়স ছিল ১৭।১৮। প্রায় একই বয়সে মনোমোহন ঘোষ কৃষ্ণনগর থেকে 'হিন্দু-পেট্রিয়ট'-এ নীলচাষীদের সংগ্রাম সম্বন্ধে লিখতে থাকেন। কৃষ্ণনগর থেকে আর একজন যিনি 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ লিখতেন তিনি ছিলেন স্কুল-ইন্‌স্পেকটর রাধিকাপ্রসন্ন মুখার্জী। এত অল্পবয়সেই শিশিরকুমার যশোহর-নদীয়ার গ্রামে-গ্রামে ঘুরে চাষীদের সংঘবদ্ধ করার কাজে লেগে গিয়েছিলেন। কৃষকরা তাঁকে সিদ্ধপুরুষ মনে করত; তাই তাঁকে তারা সিন্নিবাবু বলে ডাকত। যশোহর জেলার ঝিকরগাছার নিকটবর্তী পলুয়া-মাগুরা গ্রামে শিশিরকুমারের জন্ম। এই গ্রামই পরে অমৃতবাজার নামে পরিচিত হয়।

এই সময়ে নীল-বিদ্রোহকে যশোহর জেলায় আরও যাঁরা সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সাধুহাটির জমিদার মথুরানাথ আচার্য ও চণ্ডীপুরের জমিদার শ্রীহরি রায়। যশোহর থেকে গিরিশচন্দ্র বসু নামে একজন পুলিশ ইনস্‌পেক্টরও 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ নীলচাষীদের সমর্থনে প্রবন্ধ লিখতেন। অবশ্য এই অপরাধের

জন্ত তাঁর চাকুরি বেশি দিন রাখতে পারেন নি। সাধুহাটির জমিদার মথুরানাথ আচার্য ও তাঁর অন্যতম শরিক দিকপতিবাবু কৃষকদের দলবদ্ধ করেন। এইস্থানে বিদ্রোহকালে একদিন ৩০ হাজার কৃষক সমবেত হয়েছিল। মথুরাবাবুর প্রজারা নীলকুঠি ও তার কর্মচারীদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিল। অবশেষে নীলকর ম্যাকনেয়ার মথুরাবাবুর শরণাপন্ন হয়ে নিজের প্রাণ বাঁচান। চুয়াডাঙ্গায় যে বিদ্রোহ হয় তার প্রধান নেতা ছিলেন চণ্ডীপুরের জমিদার শ্রীহরি রায়।

শিশিরকুমার কিভাবে নীল-বিদ্রোহের দিকে অগ্রসর হলেন সে-সম্বন্ধে তাঁর জীবনীকার লিখেছেন: "যশোহরের নিকটবর্তী ঝিকরগাছা নামক স্থানে নীলকর-সাহেবদিগের একটি আড্ডা ছিল। উক্ত কুঠির সাহেবের সহিত শিশিরকুমারের পিতা হরিনারায়ণের একবার একটি মোকদ্দমা হইয়াছিল। বিচারে হরিনারায়ণ জয়লাভ করিয়াছিলেন।...মোকদ্দমায় পরাজিত হইয়া সাহেব...ক্ষিপ্রপ্রায় হইয়া উঠিলেন। প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সাহেব হরিনারায়ণের বাটি লুণ্ঠন করিবেন স্থির করিলেন। হরিনারায়ণ এই সংবাদে বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি পুত্রগণকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তোমরা বাড়ির মেয়েদের লইয়া অন্যত্র যাও, সাহেবের লোক বাড়ি লুণ্ঠন করিতে আসিলে অপমানের সীমা থাকিবে না।' পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া বালক শিশিরকুমার ক্রোধে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। শিশিরকুমার একটু সংযত হইয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, 'বাবা, দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে ততক্ষণ আমরা এ-বাটি পরিত্যাগ করিয়া যাইব না। কাহার সাধ্য আমাদের বাড়ি লুণ্ঠন করে? সাহেবের ভয়ে আমরা যদি বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করি, তাহা হইলে লোকে আমাদিগকে কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা ও উপহাস করিবে। সাহেবের লাঠিয়ালরা যদি আমাদের বাড়ি লুণ্ঠন করিতে আসে, তাহাদিগকে রীতিমত শিক্ষা না দিয়া ছাড়িব না।' শিশিরকুমারের তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা হরিনারায়ণের হৃদয়ে যুগপৎ সাহস ও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। দাদা ও মেজদার সহিত শিশিরকুমার ছাদের উপর প্রচুর ইষ্টকখণ্ড সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি কয়েকজন লাঠিয়ালও সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। সাহেব সকল কথা অবগত হইয়া হরিনারায়ণের বাড়ি লুণ্ঠন করিতে সাহস করেন নাই।" [১৪০]

শিশিরকুমারের গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্য পুলিশ নিযুক্ত হয়েছিল। কৃষকদের সংঘবদ্ধ করার কাজে তিনি গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াতেন। পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে ধরতে পারে নি। তাঁকে দমন করতে নীলকররাও কম চেষ্টা করে নি। অবশেষে যশোহরের ম্যাজিস্ট্রেট ম্যালোনী ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট স্কিনার শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে মামলা আনার জন্য বাংলা সরকারের নিকট আদেশ চেয়েছিলেন। কিন্তু সে আদেশ তাঁরা পান নি।

নীল-বিদ্রোহের সময় শিশিরকুমার যশোহর থেকে নিয়মিতভাবে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ নীল আন্দোলনের সংবাদ দিয়ে চিঠি লিখতে থাকেন। এই চিঠি-গুলিতে নীলকর ও সরকারের অত্যাচারের খবরও যেমন পাওয়া যায়, আবার অন্যধারে কৃষকদের সংগ্রামের সংবাদগুলিও পাওয়া যায়। [১৪১]

২৬শে মে ১৮৬০ সালের এক চিঠিতে শিশিরকুমার লেখেন যে জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট স্কিনার যশোহরের উত্তর-পশ্চিমে কালোপোল থানায় গিয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি কৃষকদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করতে এসেছেন। ৮০০০ রায়ত সেখানে জড়ো হয়েছিল। স্কিনার তাদের নীল বুনতে বললেন। কৃষকরা একবাক্যে তা প্রত্যাখ্যান করল। একবাক্যে তারা বলল যে, বাদশা হোসেন শাহ্‌র সময় তারা দুটাকা দাদন নিয়েছিল, কিন্তু যদিও তারা তার ২০ গুণ টাকা প্রতি বৎসর শোধ করেছে, এখনও তারা সেই ধার থেকে মুক্ত হতে পারে নি; উপরন্তু তাদের গাছপালা কেটে নিয়ে যাওয়া হয়, গরু-বাছুর আটকে রাখা হয়, এমনকি তাদের মুরগির ডিমগুলি পর্যন্ত সাহেবের খানার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট এতবড়ো বিরাট জনতার সেই সংগ্রামী মূর্তি দেখে ভীত হয়ে পড়েছিলেন। প্রসন্ন রায় দারোগা তাঁকে বাঁচিয়ে দিল। দারোগা বিভিন্ন গ্রাম থেকে ৪৯ জন মোড়লকে বেছে নিয়ে কৃষকদের বলল যে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার জন্য এই কয়জনই যথেষ্ট, আর সকলে বাড়ি যেতে পারে। দারোগার কথায় বিশ্বাস করে সকলে বাড়ি চলে গেলে ৪৯ জন মোড়লকে থানায় নিয়ে দু দিন আটকে রাখা হয়; খাবার তো দূরের কথা একটু জলও তারা পায় নি। তাদের উপর অনেক অত্যাচার করার পর তাদের হাজতে নিয়ে যাওয়া হয়। অত্যাচার আর সহ্য করতে না পেরে তাদের মধ্যে ৪৫ জন নীল বুনবে বলে একরারনামা সই করে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। আর চার জন তাতে রাজী হয় নি বলে তাদের ছয় মাসের জন্য জেল হয়। দারোগাবাবুর সঙ্গে সঙ্গে প্রমোশন হল।

২৩শে জুনের চিঠিতে শিশিরকুমার ইংরেজের বিচার-প্রহসনের এক নমুনা দিয়েছেন: "যখন ম্যাজিস্ট্রেট ম্যালোনী জজের চেয়ারে বসে ছিলেন, পোয়ামারি কুঠির বড় সাহেব স্মিথ তাঁর পাশে আর একটা চেয়ারে বসে তাঁকে কখনো পরামর্শ দিচ্ছিলেন, কখনো ধন্যবাদ দিচ্ছিলেন, কখনো বা প্রশংসা করছিলেন।"

আর একখানা চিঠিতে শিশিরকুমার নীলকরদের বাড়ির মেয়েরা ম্যাজিস্ট্রেটদের উপর প্রভাব বিস্তার কতখানি করত সে সম্বন্ধে লিখেছেন। স্কিনার ও সিভিলসার্জন নীলকর ম্যাকআর্থারের মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে গিয়েছিলেন, কিন্তু নীল-হাঙ্গামার জন্য সে বিবাহ ঘটে নি।

৫ই জুলাই-এর একখানা চিঠিতে আমরা জানতে পারি সে রায়তরা নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। যেইমাত্র সংবাদ প্রচার হল যে নীলকর কেনীর লোকেরা একজন রায়তকে অপহরণ করেছে, সঙ্গে সঙ্গে এক যোগে ২৭টি গ্রামের লোক কেনীর কুঠির সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করল। বিজলী কুঠির ওকান সাহেব কয়েকটি গ্রামের মণ্ডলদের গ্রেপ্তার করে তাদের দিয়ে জোর করে নীলচাষের চুক্তি সই করিয়ে নেয়; "গ্রামে ফিরে তারা সকল লোককে একত্রিত করল ও আমিন, তাগিদদারদের পেটাতে পেটাতে গ্রাম থেকে বার করে দিল।" তারপর শিশিরকুমার আনন্দের সঙ্গে বলছেন, "অবশেষে গ্রামের লোকরা তাদের নিজেদের অধিকার বজায় রাখার জন্য মোক্ষম পন্থা অবলম্বন করেছে। ২০শে জুন তারিখে মীরগঞ্জের জন ম্যাক-আর্থারের লোকদের সঙ্গে গ্রামের লোকদের মল্লিকপুরে একটা বড়ো রকমের যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে।"

শিশিরকুমারের ১লা আগস্ট তারিখের চিঠিতে দেখা যায় যে ম্যালোনী আর স্কিনার 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ যে ব্যক্তিটি তাদের মুখোস খুলে দিচ্ছে তার উপর খুবই চটে গিয়েছে। সে ব্যক্তিটি কে তা জানবার জন্য তারা উঠেপড়ে লেগেছে। নাজির আনন্দবাবুকে, পোস্টমাস্টার বিষ্ণুবাবুকে, শিশিরবাবুকে, শিক্ষক কৃষ্ণবাবুকে ও বাবু গিরিশ মল্লিককে তারা সন্দেহ করছে। গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য শিশিরকুমারকে গাঢাকা দিতে হয়েছে। 'হিন্দু পেট্রিয়ট'এর গ্রাহক কারা তাও তারা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছে; একমাত্র পাবলিক লাইব্রেরি ছাড়া তারা আর কোনো গ্রাহক বের করতে পারে নি।

১৮৬০ সালের আগস্ট মাসে চাষীদের সংগ্রাম যে চরমে পৌঁছেছিল তাও আমরা দেখতে পাই শিশিরকুমারের চিঠিতে। তিনি ১লা আগস্ট তারিখের চিঠিতে লিখছেন: "নীলগাছ কাটার সময় এসে গিয়েছে। মাগুরার বর্তমান ম্যাজিস্ট্রেট টাইলরের নিকট অসংখ্য রায়ত দরখাস্ত পাঠিয়েছে যে নীলগাছের বাণ্ডিলগুলি গ্রামের মধ্যেই ওজন করতে হবে এবং কুঠিতে নিয়ে যাবার পূর্বে তার পুরো দাম দিয়ে যেতে হবে। টাইলর এই দাবি ন্যায্য বলেই মনে করেন।" ঐ একই চিঠিতে শিশিরকুমার আরও জানিয়েছেন যে ২০শে জুলাই মল্লিকপুরে ২৫ জন নীলকরের লাঠিয়ালের সঙ্গে ২৫ জন কৃষকের লড়াই হয়, যখন তারা পাঁচু শেখকে ধরতে এসেছিল। উভয় পক্ষেই অনেকে আহত হয় ও পাঁচু শেখ আঘাতের ফলে মারা যায়।

৮ই আগস্ট শিশিরকুমার আবার লিখছেন: "যশোহরের রায়তরা ক্ষেপে উঠেছে।...আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে ছালকোপা, বিজলী, রামনগর কুঠিগুলি। হাজার হাজার কৃষক নীলকুঠির আক্রমণকে প্রতিরোধ করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফসল জোর করে নিয়ে যাবার জন্য নীলকররা রিভলভার, গুলিবারুদ ও লাঠিয়াল সংগ্রহ করছে; গ্রামের লোকরাও লাঠি, সড়কি সব সংগ্রহ করছে। তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে যে দাম না দিলে ফসল নিয়ে যেতে দেবে না।"

বলা বাহুল্য যে, নীলচাষীদের বিদ্রোহ দমন করার জন্য সরকার ও নীলকররা বদ্ধপরিকর হয়ে সব রকমের দমননীতিই অবলম্বন করেছিল। ১৮৬০ সালের ৩১শে মার্চ সরকার ১৮৩০ সালের মতো নতুন করে ১১নং আইন পাশ করে ঘোষণা করল যে যদি কোনো কৃষক চুক্তি ভঙ্গ করে তাহলে ফৌজদারী আইনে তার জেল হবে। এই আইনের দৌলতে ১৮৬০ সালে সহস্র সহস্র কৃষককে জেলে যেতে হয়েছিল। পুলিশকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া ছাড়াও নদীয়া, যশোহর ও অন্যান্য নীল এলাকায় সরকার প্রচুর সংখ্যক সৈন্য আমদানি করেছিল ও তাদের দিয়ে কৃষকদের উপর অবাধ নির্যাতন চালিয়েছিল।

এই অত্যাচারের প্রতিবাদে শিশিরকুমার 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে (১৮৬০) দুঃখ করে লিখেছিলেন: "যখন অনেক দেশে রাজারা তাঁদের অন্যায় আচরণের জন্য সিংহাসনচ্যুত হচ্ছেন, তখন আমরা দু-একজন পুলিশ অফিসারের সামনে চুপ করে থাকতে বাধ্য হচ্ছি।...একটা জাতির

আর একটা জাতির উপর অত্যাচার করার কোনো অধিকার নেই।" শিশির-কুমার অল্প বয়স থেকেই আরো অনেক বাঙালীর মতো দেশ-বিদেশের বিপ্লবের খবর রাখতেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে শিশিরকুমারের 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ লিখিত এই মূল্যবান চিঠিগুলি 'Peasant Revolution in Bengal' নামে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এতে আচার্য যদুনাথ সরকার একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। আশ্চর্যের বিষয় যে তাঁর এই ভূমিকার সঙ্গে এই পুস্তিকার বিষয়বস্তুর কোনো সামঞ্জস্য নেই। শিশিরকুমার যেখানে কৃষকদের দুঃখের কথা ও ইংরেজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের কথা বলেছেন, সেখানে স্যার যদুনাথ রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন এবং আরও আশ্চর্যের কথা এই যে কৃষকদের এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের বিষয়ে তিনি একটি কথাও বলেন নি। [১৪২]

কৃষকদের 'মুক্তি'র জন্য যদুনাথ যে "Breed of honest English ICS men"-দের নিকট "আন্তরিক কৃতজ্ঞতা" জানিয়েছেন তা ইংরেজ-ভক্তদের কাছে খুবই হৃদয়স্পর্শী হতে পারে, কিন্তু এই কল্পিত 'মুক্তির' মধ্যে কোনো ঐতিহাসিক সত্য দেখা যায় না। ১৮৬০ সালের ১১ আইন প্রয়োগ করে, সৈন্য ও পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে "Breed of honest English ICS men" কৃষকদের দমন করবার জন্য পুরোমাত্রায় সন্ত্রাসনীতি চালিয়েছিলেন। বহুদিন যাবৎ হাজার হাজার কৃষককে জেলে পুরে রেখেছিলেন। নীল-কমিশন নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনীগুলি পুরোমাত্রায় স্বীকার করলেও তার প্রতিকারের জন্য কোনো আইন পাশ করার কথা সরকারের নিকট সুপারিশ করে নি, সরকারও নিজের ইচ্ছায় কোনো রকম আইন পাশ করতে অগ্রণী হয় নি।

হরিশচন্দ্র ১৮৬০ সালের ১১ আইনকে কৃষকদের বিরুদ্ধে 'সন্ত্রাস আইন' নামে অভিহিত করে ১৫ই এপ্রিল তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়টে'-এ যা লিখেছিলেন তা স্যার যদুনাথের কথার সম্পূর্ণ বিপরীত। [১৪৩] আরও দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে এই 'সন্ত্রাস আইন' মাত্র ৬ মাসের জন্য করা হয়েছিল, তা আরও অনেকদিন পর্যন্ত বলবৎ ছিল এবং নীলকররা পুরোমাত্রায় তার সুযোগ গ্রহণ করেছে এবং নদীয়ার ও যশোহরের ম্যাজিস্ট্রেটরা, "that breed of honest English ICS men" এই দমননীতিতে সম্পূর্ণভাবে তাদের সাহায্য করেছেন।

স্যার যদুনাথ আরও একটি কথা বলেছেন যা ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না। তিনি উপরিউক্ত ভূমিকায় লিখেছেন: "এই হাঙ্গামার মূল কারণ ছিল অর্থনৈতিক। ইউরোপের বাজারে নীল রংয়ের দাম কমে যাওয়ার ফলে, নীলকরদের পক্ষে চাষীকে ন্যায্য দাম দেবার পর কোনোরকম লাভ করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। এই কারণে তারা অত্যাচার ও জোরজবরদস্তি শুরু করল।" [১৪৪] নীলকরদের সমর্থনে এতখানি ওকালতি আর কেউ করেন নি, যদিও স্যার যদুনাথ তাঁর উক্তির সমর্থনে কোনোরকম তথ্য-প্রমাণ দেন নি। এমনকি নীলকররাও নীল-কমিশনের নিকট সাক্ষ্যদান কালে নীলের দাম যে ইউরোপের বাজারে কমে গিয়েছে একথা জোর করে বলতে পারে নি। নীল-কমিশনের রিপোর্টে অথবা ছোটলাটের বিবরণীতেও নীলের দাম কমার কথা নেই। পক্ষান্তরে নীলের জন্য নীলকররা খুব ভালো দামই পাচ্ছিল এবং তারা যে প্রচুর লাভ করছিল এ কথাটাই সকলে বারবার বলেছেন। অন্যান্য ব্যাপারে যাই হোক, নীল-বিদ্রোহের প্রসঙ্গে ইংরেজ শাসক ও শোষকদের প্রতি স্যার যদুনাথের এতটা দরদ না দেখালেও চলত।

এখানে উল্লেখযোগ্য, নিরপেক্ষ ইংরেজরা, যাঁরা নীলচাষের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না, তাঁরা কেউই নীলকরদের ও ভারতের ইংরেজ শাসক-শ্রেণীর সমর্থন করেন নি। এই শ্রেণীর নিরপেক্ষ ইংরেজদের মত ব্যক্ত করেছেন পাদ্রী আলেকজান্দার ডাফের জীবনীকার জর্জ স্মিথ: "স্যার জে, পি, গ্র্যান্ট ছিলেন একজন সুদক্ষ ব্যক্তি। জনসাধারণের দিকে তাঁর দৃষ্টি দিল। কিন্তু অন্যদিকে ছিলেন একদল অল্পবয়স্ক সিভিলিয়ান ব্যুরোক্রাট। এঁরাই জন-সাধারণের সংস্পর্শে আসতেন এবং সব রকমের বোঝাপড়া ও সংস্কারের কাজকে অসম্ভব করে তুলেছিলেন। সর্বত্র রাজনৈতিক বুদ্ধির অভাবে ও কায়েমী স্বার্থের সংঘাতে সমগ্র বাংলাদেশ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল—নীলকরদের পক্ষে ও বিপক্ষে। [১৪৫]

নীলকর দমনে বঙ্কিমচন্দ্রকে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল। ১৮৫৮ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হয়ে খুলনা মহকুমায় এসেছেন। "এই সময় একজন নীলকর সাহেব হাতির শুঁড়ে মশাল বাঁধিয়া একখানি গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছিল। দারোগাগণ ঐ সাহেবকে কোনোমতে ধরিতে পারিল না, তার নিকট সর্বদা গুলিভরা পিস্তল থাকিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র

তাহার পিস্তল গ্রাহ্য না করিয়া সাহেবটিকে গ্রেপ্তার করিলেন। সাহেবটি British born subject, সুতরাং হাইকোর্টে সোপর্দ হইয়াছিলেন।" [১৪৬]

'নীলদর্পণ' যখন প্রকাশিত হয় ও লঙ-এর মামলা চলবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র আবার খুলনায় বদলি হয়ে এসেছেন। খুলনা, যশোহরের জমিদার-নীলকর মরেলের তখন দোর্দণ্ড প্রতাপ। মরেল বাইরে এত শান্ত, শিষ্ট, ভদ্র যে ছোটলাট গ্র্যান্ট তাঁর রিপোর্টে তার সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "He is a model settler and an example to all indigo planters"। ঐশ্বর্যশালী model settlerটি একটি শহর স্থাপন করে তার নাম রেখেছিল মরেলগঞ্জ। তার জমিদারিতে সে-ই সত্যিকারের রাজা ও তার অধীনে ৭০০ লাঠিয়াল, তার মধ্যে কয়েকজন বন্দুকধারী। এই বাহিনীর সেনাপতির নাম ছিল ক্যাপ্টেন হিলি। এই বীরপুঙ্গবটি পূর্বে আইরিশ ইয়োমানরী ক্যাভালরীতে ছিল এবং তখন আয়রল্যাণ্ডের সংগ্রামী কৃষকদের উপর অনেক 'বীরত্ব' দেখিয়েছিল। নীল-বিদ্রোহের পূর্বে মরেলের অঞ্চলে কোনো কৃষকের টু শব্দটি করার উপায় ছিল না; কিন্তু ১৮৫৯-৬০ সালে এখানকার কৃষকরা ঐক্যবদ্ধভাবে নীল বুনতে অস্বীকার করল এবং তখন থেকেই দাঙ্গাহাঙ্গামার শুরু হল। মরেল ও অন্যান্য নীলকরদের অত্যাচার দমন করতে বঙ্কিমকে অনেক শক্তি নিয়োগ করতে হয়েছিল। ১৮৬১ সালের নভেম্বর মাসে 'Friend of India" পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হল: "সুন্দরবন অঞ্চলের সুরুলিয়া গ্রামে এই অঞ্চলের প্রতাপশালী জমিদার মরেলের লোকজনদের সঙ্গে স্থানীয় লোকদের একটা দাঙ্গা হয়ে গিয়েছে। এরকম দাঙ্গা এখানে আজকাল খুব ঘন ঘন হচ্ছে। এই শেষ দাঙ্গাটা হয়েছিল মিস্টার হিলি ও একজন ভারতীয়ের নেতৃত্বে।"

ঘটনা হল এই: অন্যান্য গ্রামের মতো বড়খালি নীলচাষ বন্ধ করে দিয়েছে। রহিমউল্লার নেতৃত্বে বড়খালি গ্রামই সব থেকে বেশি সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ। এই অঞ্চলে বড়খালিই হল বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল। এখানকার বিদ্রোহ দমনের জন্য বড়খালিকে দমন করাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। অনেকবার চেষ্টা করেও মরেল এখানে বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি। ২৬শে নভেম্বর মরেলের ৩০০ লাঠিয়াল গভীর রাত্রে বড়খালি আক্রমণ করল।

"বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ব হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, হিলি সাহেব একটা দাঙ্গা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। কিন্তু কোথায় যে দাঙ্গা করিবেন তাহা পূর্বাহ্নে কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। সাহেবেরা ভাণ করিলেন, সুরুলিয়া

আক্রান্ত হইবে ; পুলিশ সেইদিকে ছুটিল। সাহেবেরা এদিকে রাত্রির অন্ধকারে লুকাইয়া বড়খালি অভিমুখে যাত্রা করিলেন।”

অতর্কিতে গভীর রাত্রে আক্রান্ত হলেও বড়খালির কৃষকরা নীলকরের লাঠিয়ালদের পাল্টা আক্রমণ করল। রহিমউল্লার ও কৃষকদের লাঠির আঘাতে অনেকে ধরাশায়ী হল। এমন সময় রহিমউল্লা হিলির গুলিতে আহত হলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও হিলি তাকে ধরতে পারল না। রহিমউল্লা “গৃহপ্রাঙ্গণে বসিয়া ক্ষতস্থান পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল : তখন দ্বিতীয় গুলি আসিয়া তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিল। রহিম তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। এ গুলি প্রথম গুলির ন্যায় হিলি সাহেবের বন্দুক হইতে ছুটিয়াছিল বলিয়া সাক্ষীরা সাক্ষ্য দেয়।” [১৪৭] তারপর যা হয় তাই হল। প্রথমত গ্রাম লুণ্ঠিত হল, পরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। বিজয়ী দল যাবার সময় রহিমের মৃতদেহ ও তার সমস্ত পরিবার ও আরও অনেককে বন্দী করে নিয়ে গেল।

কিন্তু এতবড়ো বিজয়ের ফলভোগ করা মরেলের ভাগ্যে ছিল না। বঙ্কিমের হাত থেকে তার নিস্তার নেই জেনে মরেল, তার অংশীদার লাইটফুট ও হিলি সকলকেই তাদের রাজ্য ছেড়ে পলায়ন করতে হল। ধরা পড়ল লাঠিয়ালরা ও তাদের নেটিভ সর্দার দৌলত চৌকিদার। দায়রার আদালতে দৌলতের ফাঁসির হুকুম হল, আর ৪০ জনের হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। শেষ পর্যন্ত মরেল ও লাইটফুট ছদ্মবেশে বিলাত পালিয়েছিল, কিন্তু হিলি বম্বেতে ধরা পড়ল। ১৮৬৩ সালে হাইকোর্টের বিচারে সে খালাস পেল, কারণ তাকে নাকি কেউ শনাক্ত করতে পারে নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের মাথার জন্য যে ১ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল তা খুলনার অধিবাসীরা সকলেই জানত। কিন্তু বঙ্কিম “এমন শোধ লইয়াছিলেন যে, মরেলগঞ্জকে শান্তমূর্তি ধারণ করিতে হইয়াছিল।” মরেলগঞ্জের ঘটনা ও মরেল-দমন বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে একটি প্রধান ঘটনা। বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় হল, মরেলগঞ্জের ঘটনার সময়েই বঙ্কিমচন্দ্র স্থিরচিত্তে বসে ‘দুর্গেশনন্দিনী’ লিখছিলেন।

নীলদর্পণ

নীলবিদ্রোহ কেবলমাত্র যে কৃষকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তা যে শিক্ষিত বাঙালীকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল, তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। বাংলার সংস্কৃতিতে, বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যে নীল-বিদ্রোহ একটা নবযুগের সৃষ্টি করল, কাজী আবদুল ওদুদের কথায়, একটি "অমৃত ফল ফলাল" [১৪৮] —দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হল। যে সময়টাতে নীল-আন্দোলন একটা জাতীয় বিদ্রোহের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছিল, ঠিক সেই সময় ১৮৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'নীলদর্পণের' প্রকাশ। আমেরিকার দাসপ্রথার বিরুদ্ধে 'Uncle Tom's Cabin' ('টমকাকার কুটির') যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, 'নীলদর্পণের' প্রভাবও বাংলাদেশে তদনুরূপ হয়েছিল। 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হতে না হতেই দেশব্যাপী ব্যাপক সাড়া পড়ে গিয়েছিল এবং সকল শ্রেণীর বাঙালীকে জাগিয়ে তুলতে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছিল।

দীনবন্ধু মিত্র ১৮৫৫ সালে হিন্দু কলেজে পড়া শেষ করে ১৫০ টাকা বেতনে পাটনায় পোস্টমাস্টার নিযুক্ত হয়েছিলেন। একজন সুদক্ষ কর্মচারী হিসাবে যেখানেই কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের দরকার হত সেখানেই—তাঁকে পাঠানো হত। লুসাই যুদ্ধের সময় যুদ্ধের ডাকের ব্যবস্থা করবার জন্য তাঁকে লুসাই পাহাড়ের জঙ্গলে যেতে হয়েছিল। এইসব কাজের জন্য তিনি সরকারের নিকট থেকে 'রায়বাহাদুর' খেতাব লাভ করেন। পোস্টআফিসের কাজের জন্যই তাঁকে নদীয়া ও যশোহরের শহরে ও গ্রামে অনেক ঘুরতে হয়েছিল। এইভাবে তিনি কৃষকদের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে ১৮৫৮ সালে দীনবন্ধুর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় ঘটে। 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হবার পর সেই পরিচয় প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। দীনবন্ধু সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন: "দীনবন্ধুর অদৃষ্টে ঐ পুরস্কার ('রায়বাহাদুর' উপাধি) ভিন্ন আর কিছু ঘটে নাই কেননা দীনবন্ধু বাঙালী কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যেখানেই কোনো কঠিন কার্য পড়িত দীনবন্ধু সেইখানেই প্রেরিত হইতেন। এইরূপ কার্যে ঢাকা, উড়িষ্যা, দার্জিলিং, কাছাড় প্রভৃতি সর্বস্থানে যাইতেন।... পোস্টাল বিভাগের পরিশ্রমের ভাগ ছিল তাঁহার, পুরস্কারের ভাগ জুটিত অন্যের কপালে। দীনবন্ধুর যেরূপ কার্যদক্ষতা ও বহুদর্শিতা ছিল তাহাতে

তিনি যদি বাঙ্গালী না হইতেন তাহা হইলে তিনি মৃত্যুর অনেক পূর্বেই পোস্টমাস্টার জেনেরাল হইতেন এবং কালে ডাইরেক্টর জেনেরাল হইতে পারিতেন।...পুরস্কার দূরে থাকুক শেষ অবস্থায় দীনবন্ধু অনেক লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" [১৪৯]

দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' প্রকাশ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "দীনবন্ধু বিলক্ষণ জানিতেন যে তিনি নীলদর্পণের প্রণেতা একথা ব্যক্ত হইলে, তাঁহার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। যে সকল ইংরেজের অধীন হইয়া তিনি কর্ম করিতেন, তাহারা নীলকরের সুহৃদ। বিশেষ, পোস্ট অপিসের কার্য্যে নীলকর প্রভৃতি অনেক ইংরেজের সংস্পর্শে সর্ব্বদা আসিতে হয়। তাহারা শত্রুতা করিলে বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারুক না পারুক, সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন করিতে পারে, এসকল জানিয়াও দীনবন্ধু নীলদর্পণ প্রচারে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। নীলদর্পণে গ্রন্থকারের নাম ছিল না বটে, কিন্তু গ্রন্থকারের নাম গোপন করিবার জন্য দীনবন্ধু কোনপ্রকার যত্ন করেন নাই। নীলদর্পণ প্রচারের পরেই বঙ্গদেশের সকল লোকই কোন না কোন প্রকারে জানিয়াছিলেন যে, দীনবন্ধু ইহার প্রণেতা।"

বঙ্কিমচন্দ্র আরও লিখেছেন: "এই গ্রন্থের নিমিত্ত লং সাহেব কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই হউক, অথবা ইহার কোন বিশেষ গুণ থাকার নিমিত্তই হউক, নীলদর্পণ ইউরোপের অনেক ভাষায় অনুবাদিত ও পঠিত হইয়াছিল। এই সৌভাগ্য আর কোন গ্রন্থেরই ঘটে নাই। গ্রন্থের সৌভাগ্য যতই হউক, কিন্তু যে যে ব্যক্তি ইহাতে লিপ্ত ছিলেন, প্রায় তাঁহারা সকলেই কিছু কিছু বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহার প্রচার করিয়া লং সাহেব কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, সীটনকার অপদস্থ হইয়াছিলেন। ইহার ইংরেজি অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অবমানিত হইয়াছিলেন এবং শুনিয়াছি শেষে তাঁহার জীবন নির্বাহের উপায় সুপ্রিমকোর্টের চাকুরী পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গ্রন্থকর্ত্তা নিজে কারারুদ্ধ কি কর্ম্মচ্যুত হয়েন নাই বটে, কিন্তু তিনি ততোধিক বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন।" [১৫০]

দেশের বাস্তব ভিত্তির উপর সাহিত্য রচনার ভিতর দিয়েই বাংলা সাহিত্যের নবযুগ আরম্ভ হয়। "ভদ্রসমাজে যাহাদের সুখ-দুঃখের কথা এতদিন অপাংক্তেয় ছিল, গল্পে-উপন্যাসে-নাটকে যাহাদের প্রবেশাধিকার ছিল না, দীনবন্ধুর কৃতিত্ব এই যে, তিনিই সর্বপ্রথম নীলদর্পণে তাহাদের স্থান করিয়া দিয়াছেন, কৃপা করিয়া নয়, আন্তরিক শ্রদ্ধা ও দরদ দিয়া, খ্যাতিহীন পরিচয়হীন

সাধারণ নরনারীর ভাবে ভাবিত হইয়া তাহাদের আঘাত প্রত্যাঘাত-মথিত হৃদয়ের চিত্র আঁকিয়াছেন।" [১৫১]

দীনবন্ধু মিত্রের জন্ম নদীয়া জেলার চৌবেড়িয়া গ্রামে। জন্ম থেকেই তিনি কৃষক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভবিষ্যতে কর্মসূত্রেও গ্রামবাসীদের, বিশেষ করে নীলচাষীদের লাঞ্ছিত ও অবমানিত জীবনের গভীর পরিচয় পেয়েছিলেন। নীলদর্পণের প্রতিটি চরিত্রে, প্রতিটি ছত্রে, প্রতিটি দৃশ্যে সেই বাস্তব পরিচয় ফুটে বেরিয়েছে। নীলদর্পণের নবীনমাধব ও বিন্দুমাধব এর সঙ্গে নীল-বিদ্রোহের অন্যতম নেতা চৌগাছা গ্রামের বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাসের অনেক সাদৃশ্য আছে। নাটকের ক্ষেত্রমণি, যে-কৃষক-কন্যা হারামণিকে অপহরণ করেছিল ও যার জন্য তখন একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, সে ছাড়া আর কেউ নয়। ম্যাজিস্ট্রেট, নীলকর প্রভৃতির চরিত্রও কাল্পনিক নয়। বাস্তবে তাদের যেরকম দেখা যেত ঠিক সেইরকম তারা নাটকে জীবন্তভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তোরাপ ও রাইচরণ দুজনেই অশিক্ষিত কৃষক, দুইটি চরিত্রই বাস্তব, এরাই ছিল নীল-বিদ্রোহের প্রতীক, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের প্রতীক। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তোরাপ একটি অপূর্ব চরিত্র। নাট্যকারের সৃষ্টি-নৈপুণ্যে তোরাপের চরিত্র নীলদর্পণে সর্বত্রই সব থেকে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।

কেবলমাত্র সাধারণ কৃষকই নয়, অবস্থাপন্ন কৃষক, জোতদার, ছোটখাট জমিদাররাও যে নীলচাষ থেকে রেহাই পেত না, তা দেখা যায় নীলদর্পণের প্রথম অঙ্কে, প্রথম গর্ভাঙ্কে। সাধুচরণ, একজন কৃষক, বলছে, "দক্ষিণ পাড়ার মোড়লদের বাড়ির দিকে চাওয়া যায় না, আহা কি ছিল কি হয়েছে! তিন বৎসর আগে দুবেলায় ৬০ খান পাত পড়তো, ১০ খানা লাঙ্গল ছিল, দামড়াও ৪০।৫০টা হবে। কি উঠানই ছিল, যেন ঘোড়দৌড়ের মাঠ, আহা! যখন আসধানের পালা সাজাত বোধ হত যেন চন্দন বিলে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে।... ধানের ভুঁয়ে নীল করে নি বলে মেজ, সেজ দুই ভাইকে ধরে সাহেব বেটা আর-বৎসর কি মারটিই মেরেছিল। উহাদের খালাস করে আনতে কত কষ্ট; হালগরু বিক্রি হয়ে যায়। ঐ চোটেই দুই মোড়ল গাঁ-ছাড়া হয়।" [১৫২] সাধু আবার গোলককে বলছে: "কর্তা মহাশয়, আপনিও দেশের মায়া ত্যাগ করুন। গতবারে আপনার ধান গিয়েছে, এইবারে মান যাবে।" গোলক: "মান যাওয়ার আর বাকি কি? পুষ্করিণীটির চারপাড়ে চাষ দিয়েছে, তাহাতে

এবার নীল করবে, তাহলেই মেয়েদের পুকুরে যাওয়া বন্ধ হল। আর সাহেব বলেছে, যদি পুর্ব মাঠের ধানিজমি কয়খানায় নীল না বুনি, তবে নবীনমাধবকে সাত কুঠির জল খাওয়াইবে। নবীনমাধব সাহেবকে বলেছে আমার গত সনের ৫০ বিঘা নীলের দাম চুকাইয়া না দিলে এ বৎসর এক বিঘাও নীল করিব না, এতে প্রাণ পর্যন্ত পণ, বাড়ি কি ছার।"

নীলকরদের অত্যাচার যে কেবল লুণ্ঠন ও শোষণেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তাদের দৌরাত্ম্য, ব্যাভিচার ও লাম্পট্য যে মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল তা আমরা দেখতে পাই প্রথম অঙ্কে, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে যেখানে নীলকরের আমিন, সাধুচরণের মেয়ে ক্ষেত্রমণিকে দেখে বলছে, "এ ছুঁড়িত মন্দ নয়। ছোট সাহেব এমন মাল পেলেত লুফে নেবে। আপনার বুন দিয়ে বড় পেস্কারি পেলাম, তা এরে দিয়ে পাব...।" নীলদর্পণে নীলকরদের বর্বরতা, স্থূলতা যেমন রূপ পেল "তেমনি রূপ পেল নীলকরদের আশ্রিত গোমস্তা-আদির দাস মনোভাব।" [১৫৩]

এর উপর শশাঙ্কশেখর বাগচী মন্তব্য করেছেন: "সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় উচ্ছৃঙ্খল কুঠিয়ালগণের এই লালসার মূলে ইন্ধন যোগাইত এই দেশেরই কুঠির কর্মচারীগণ। ভালো একটি মেয়ের সন্ধান দিতে পারিলে যে সন্ধান দিতেছে তাহার পদোন্নতির সম্ভাবনা থাকিত। আমিন এ কাজে নূতন ব্রতী নয়, ধর্মাধর্ম-বর্জিত সম্পূর্ণরূপে আত্মমর্যাদা শূন্য না হইলে নীলকরদের উপযুক্ত কর্মী হওয়া যায় না। ছোটসাহেবের চরিত্র ক্ষমার অযোগ্য সন্দেহ নাই কিন্তু দীনবন্ধু এই দেশীয় অপদার্থ নির্লজ্জ চরিত্রগুলিও ততোধিক ধিক্কৃত করিয়া আঁকিয়াছেন।"

নীলকরদের দৌলতে আমিন, গোমস্তা, এইসব তথাকথিত 'মধ্যবিত্ত'-দের আবির্ভাবে ও তাদের সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করে দ্বারকানাথ ঠাকুর কতখানি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। [১৫৪] ইংরেজ সরকারের কর্মচারী দ্বারকানাথ, নীলকর দ্বারকানাথ, জমিদার ও ব্যবসায়ী দ্বারকানাথের পক্ষে সেই যুগে এই ধরনের উক্তি একেবারে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আজকের দিনে, নীল-বিদ্রোহ, ইণ্ডিগো-কমিশন রিপোর্ট, নীলদর্পণ, লঙের বিচার-সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে হরিশ মুখার্জীর নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটবার শতবর্ষ পরেও কেউ কেউ এই ঘৃণ্য ক্রীতদাসগুলির মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন—"দেশের এই চমকপ্রদ অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও তার ফলস্বরূপ মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর উদ্ভব," "বাংলার

মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর উদ্ভব ও এই শ্রেণীর উত্তরোত্তর ক্ষমতা লাভের ইতিহাস” ও “ভারতের বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক বিপ্লব” [১৫৫] এটা কম আশ্চর্যের কথা নয়।

অর্থশাস্ত্রে ও ইতিহাসে ‘বুর্জোয়া’ ও ‘মধ্যবিত্ত’ কথাগুলি একটা বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়। মধ্যযুগে ইউরোপে সমাজ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল —একধারে সামন্ত জমিদাররা আর একধারে ভূমিদাসরা। ক্রমে আর একটি শ্রেণী জন্ম লাভ করে, যাকে ইউরোপীয়ানরা বলে বুর্জোয়া ও ইংরেজরা বলে মিডিল্ ক্লাস এবং কালক্রমে এই বুর্জোয়া-শ্রেণীই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বুর্জোয়ারা বিপ্লব ঘটিয়েছিল ও নিজ নিজ দেশে রাষ্ট্রীয়-ক্ষমতা দখল করেছিল। এই শ্রেণীর সঙ্গে বাংলার নীলকরদের সৃষ্ট ও লালিত-পালিত আমলা, গোমস্তাদের তুলনা করা যায় না, তাদের সঙ্গে ‘বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক’ বিপ্লবের কোনো সংস্রবই ছিল না। এই তথাকথিত ‘মধ্যবিত্তেরা’ ছিল বিদেশী বণিকদের কতগুলি ঘৃণ্য কেনা-গোলাম, কৃতদাসদের চাইতেও অধম। নীল-করয়া কৃষকদের জোর করে ভূমিদাস করে ফেলেছিল। কিন্তু কৃষকরা তার বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়ত, নিজেদের স্বাধীন করার চেষ্টা করত। আর ‘মধ্যবিত্তরা’ স্বেচ্ছায় টাকার লোভে গোলামী করত, বিদেশীর লুণ্ঠন কাজে ও নিজের দেশের লোকের উপর অত্যাচারে বিদেশীদের সাহায্য করত ও এই প্রকার দুষ্কর্ম করে কিছু টাকা ও সম্পত্তি করত। এদের দ্বারা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক কোনোপ্রকার প্রগতিশীল কার্যই সম্ভবপর ছিল না।

নীলদর্পণ প্রথম মুদ্রিত হয় ঢাকায় এবং ঢাকাতেই প্রথম অভিনীত হয়। প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নাটকটি এতই জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে তা এক বৎসরের মধ্যেই পুনর্মুদ্রিত হয়। কলকাতায় নীলদর্পণ মঞ্চস্থ হয় ১৮৬২ সালে। বাংলাদেশে পেশাদারী নাটক নীলদর্পণ দিয়েই শুরু হয়। ১৮৭২ সালে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি প্রমুখ কলকাতায় ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপন করে সর্বপ্রথম সাধারণের নিকট টিকিট বিক্রি করে যে নাটক অভিনয় করেছিলেন তা হল ‘নীলদর্পণ’। এর পূর্বে কলকাতায় যে-সব নাটকের অভিনয় হত তাতে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না, একমাত্র ধনী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাই নিমন্ত্রিত হয়ে তাতে যোগদান করতে পারতেন। নীলদর্পণ কেবলমাত্র সাধারণ মানুষকে নিয়েই প্রথম নাটক নয়, তা জনসাধারণের জন্য প্রথম নাটকও বটে। এই জন্য দীনবন্ধুকে গিরিশচন্দ্র বাংলার রঙ্গালয় স্রষ্টা বলেছেন। প্রথমে

গিরিশচন্দ্র নীলদর্পণে অংশগ্রহণ করেন নি, কিন্তু ১৮৭৩ সালে টাউন হলে তিনি তাতে অভিনয় করেছিলেন। নীলদর্পণে যাঁরা অংশ গ্রহণ করতেন তাঁদের সব সময় পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবার আশংকা নিয়ে থাকতে হত। এবং শেষ পর্যন্ত ১৯০৮ সালে নীলদর্পণ ইংরেজ-বিদ্বেষী ও রাজদ্রোহী এই অজুহাতে তার অভিনয় নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

বিদ্যাসাগর নীলদর্পণের অভিনয় দেখবার সময় এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে নিজের চটি জুতা খুলে নিয়ে Mr. Rogue-এর ভূমিকায় অর্ধেন্দু-প্রসাদ মুস্তফির মাথায় ছুঁড়ে মারেন। অর্ধেন্দু শেখর সেই জুতাটি মাথায় তুলে নিয়ে বলেছিলেন "এইটাই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।" বাস্তবিকই বিদ্যাসাগরের এই চটি জুতাটি হয়েছিল নীলকরদের বর্বরতার বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিবাদের প্রতীক।

লক্ষ্ণৌতে যখন নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় হচ্ছিল তখন একদল ইংরেজ টমি নগ্ন তলোয়ার হাতে করে মঞ্চ আক্রমণ করেছিল। এই ঘটনার একটি সুন্দর বর্ণনা অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসী লিখে গিয়েছেন: "এক রাত্রি লক্ষ্ণৌ নগরে ছত্রমণ্ডিতে আমাদের নীলদর্পণ অভিনীত হইতেছিল, সেইদিন লক্ষ্ণৌ নগরের প্রায় সকল সাহেব থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছিলেন। যে-স্থানে রোগসাহেব ক্ষেত্রমণির উপর অবৈধ অত্যাচার করিতে উদ্যত হইল, তোরাপ দরজা ভাঙ্গিয়া রোগসাহেবকে মারে, সেই সময় নবীনমাধব ক্ষেত্রমণিকে লইয়া চলিয়া যায়। একে তো নীলদর্পণ পুস্তকই অতি উৎকৃষ্ট অভিনয় হইতেছিল, তাহাতে মতিলাল সুর, তোরাপ, অবিনাশ কর মহাশয় মিস্টার রোগসাহেবের অংশ অতিশয় দক্ষতার সহিত অভিনয় করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া সাহেবেরা বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। একটা গোলযোগ হইয়া পড়িল এবং একজন সাহেব দৌড়িয়া একেবারে স্টেজের উপর উঠিয়া তোরাপকে মারিতে উদ্যত হইল।" [১৫৬]

নীলদর্পণের অন্যান্য কাহিনীর মতো ক্ষেত্রমণির কাহিনী একটি প্রকৃত ঘটনাকে অবলম্বন করে রচিত। এই ঘটনার বৃত্তান্ত 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ প্রথম বার হয়। তারপর ইণ্ডিগো-কমিশনের সভাপতির নিকট নদীয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট হার্সেলের ১৮৬০ সালের ১৩ই জুনের, চিঠি থেকেও অনেকখানি জানা যায়। [১৫৭] হার্সেল লিখেছেন যে ১২ই ফেব্রুয়ারি মাথুর বিশ্বাসের পুত্রবধু হরমণিকে আর্চিবল্ড হিলের লোকেরা হরণ করে নিয়ে যায়।

দারোগা সেইদিনই কাচিকাটা কুঠিতে যেয়ে শুনতে পেলেন যে হিল ওখানে নেই। ১৪ তারিখে পুলিশ রিপোর্ট করল যে হরমণি বাড়ি ফিরে এসেছে। ২৮শে ফেব্রুয়ারি হার্সেল নদীয়ায় ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসেন। ৯ই মার্চ তারিখে মাথুর বিশ্বাস অভিযোগ করল যে আর্চিবল্ড হিল্‌স্‌, রিসম সিং, মধু সিং, জুরন সিং, আদিত্য বিশ্বাস, সুকুর মহম্মদ, কুতুবদি তাকিদগীর ইত্যাদি ৩০ জন লোক তার পুত্রবধূ যখন একলা জল আনতে যাচ্ছিল, তখন তাকে জোর করে কাচিকাটা কুঠিতে নিয়ে যায়। হিল্‌স্‌ ঘোড়ায় চড়ে সব সময় তাদের সঙ্গে ছিল। হিল্‌স্‌ তাকে রাত্রি ১১-৩০ পর্যন্ত তার ঘরে রেখেছিল; তারপর পূর্ব-দিকের একটা গ্রামে একজন ব্রাহ্মণের বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু সেখানে তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় নি; একজন নাপিতের বাড়িতেও তাকে ঢুকতে দেওয়া হল না; তখন তাকে গোঁসাই-দুর্গাপুর কুঠির আমিন, মাথুর বিশ্বাসেরই এক আত্মীয়, স্বরূপ বিশ্বাসের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। ১০ই মার্চ হরমণিকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করা হল। দারোগা ১৩ই মার্চ রিপোর্ট করলেন যে হরমণিকে হরণ করার রিপোর্টটা সত্য: যে-সব পুলিশ তাকে মুক্ত করবার জন্য গিয়েছিল তারা হরমণিকে কুঠিতে নিয়ে যেতে দেখেছিল; কিন্তু সেখানে তারা প্রবেশ করতে সাহস পায় নি। আরও পুলিশ পাঠাবার জন্য তারা খবর পাঠায়, কিন্তু সাহায্য পৌঁছবার পূর্বেই হরমণিকে সেখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। ৫ই এপ্রিল তারিখে সব রিপোর্ট ইত্যাদি পরীক্ষা করে হার্সেল অভিযোগটা নাকচ করে দিলেন। যুক্তি স্বরূপ হার্সেল বলেন যে প্রথমত, যেহেতু মাথুর বিশ্বাস ইতিপূর্বেই রাজীনামা লিখে দিয়েছিল যে সে কোনো মামলা আনবে না, অভিযুক্তদের শাস্তি না হওয়া এইটাই যথেষ্ট কারণ, দ্বিতীয়ত, ধর্ষণের অভিযোগটা একটা গল্পে রং লাগানোর মতো সাজান বলেই মনে হয়। 'এই দুই কারণে', হার্সেল বললেন, "আমি মনে করি যে অপরাধীদের কোনো শাস্তি হবে না, সুতরাং আমি অভিযোগটা নাকচ করে দিলাম।"

আসল কথা হচ্ছে এই যে এত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও, এমনকি হার্সেলের মতো লোকও নীলকরদের বিরুদ্ধে কোনোপ্রকার গুরুতর অভিযোগ আনতে ও তাদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে সাহস করতেন না। তাছাড়া আর একটা ব্যাপার ছিল এই যে (এবং যা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে), সিপাহী-বিদ্রোহের সময় অনেক নীলকর সরকারী ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হয়েছিল;

তার উপর তারা আবার স্বগোত্রীয়। সুতরাং তাদের মধ্যে যে দহরম-মহরম থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি? তা সত্বেও হার্সেল, ইডেনের মতো দু-একজন ম্যাজিস্ট্রেট কিছুটা নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বেশির ভাগ ম্যাজিস্ট্রেটই ছিল নীলকরদের অন্তরঙ্গ বন্ধু যার পরিচয় আমরা পাই নীলদর্পণে।

এই নাটকের এক অংশে জেলখানায় গোলকচন্দ্রের মৃতদেহের সামনে দারোগা জিজ্ঞাসা করছেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আসবে কি না। জমাদার উত্তর দিচ্ছে: "আজ্ঞে না, তাঁর আর ৪ দিন দেরি হবে শনিবারে শচীগঞ্জের কুঠিতে সাহেবদের সাম্পিন পার্টি আছে, বিবিদের নাচ হবে। উড সাহেবের বিবি আমারদিগের সাহেবের সঙ্গে নইলে নাচিতে পারেন না, আমি যখন আরদালি ছিলাম দেখিয়াছি।" নীলকর ও বেশির ভাগ ম্যাজিস্ট্রেটদের নৈতিক চরিত্রই ছিল এইরকম; যে বিচারক পাদ্রী লঙের বিচার করেছিলেন তিনি এই অংশটির উপরই বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। তাঁর মতে জমাদারের এই উক্তি একটা 'জঘন্য ঘৃণিত মানহানি'; কারণ নীলকররা যে ম্যাজিস্ট্রেটদের অবৈধ উপায়ে হস্তগত করে নিজেদের কার্যসিদ্ধি করে থাকে, এইরূপ ইঙ্গিত এর মধ্যে আছে। গোলকচন্দ্রের বিচারের সময় দেখা যায় যে নীলকর ম্যাজিস্ট্রেটের পাশে বসে আছে এবং তারই পরামর্শমতো বিচার হচ্ছে। [১৫৮]

'নীলদর্পণের' দুই বৎসর পূর্বে টেকচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হয়। নীলকরদের অত্যাচার বাংলার সামাজিক জীবনে যে কি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তার একটা পরিষ্কার বাস্তব ছবি 'আলালের ঘরের দুলাল'-এও পাওয়া যায়:

"যশোহরে নীলকরের জুলুম অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রজারা নীল বুনিতে একেবারে ইচ্ছুক নহে কারণ ধান্যাদি বুনিতে অধিক লাভ, আর যিনি নীলকরের কুঠিতে যাইয়া একবার দাদন লইয়াছেন তাহার দফা একেবারে রফা হয়। প্রজারা প্রাণপণে নীল আবাদ করিয়া দাদনের টাকা পরিশোধ করে বটে কিন্তু হিসাবের লাঙ্গুল বৎসর ২ বৃদ্ধি হয় ও কুঠেলের গোমস্তা ও অন্যান্য কারপরদাজের পেট অল্পে পুরে না। এইজন্য যে প্রজা একবার নীলকরের দাদনের সুধামৃত পান করিয়াছে সে আর প্রাণান্তে কুঠির মুখো হইতে চায় না কিন্তু নীলকরের নীল না তৈয়ার হইলে ভারি বিপত্তি।...অপর যে সকল ইংরেজ কুঠির কর্মকাজ দেখে তাহারা বিলাতে অতি সামান্য লোক কিন্তু কুঠিতে

সাজাদার চেলে চলে—কুঠির কর্ম্মের ব্যাঘাত হইলে তাহাদিগের এই ভয় যে পাছে তাহাদিগের আবার ইতুর হইতে হয়। এই কারণে নীল তৈয়ার করণার্থ তাহারা সর্ব্বপ্রকারে, সর্ব্বতোভাবে, সর্ব্বসময়ে যত্নবান হয়।

"মতিলাল (জমিদার) সঙ্গীগণকে লইয়া হো-হো করিতেছেন—নায়েব নাকে চশমা দিয়া দপ্তর খুলিয়া লিখিতেছে ও চুনো বুলাইতেছে এমন সময়ে একজন প্রজা দৌড়ে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—মোশাই গো, কুঠেল বেটা আমাদের সর্বনাশ করলে! বেটা সরেজমিতে আপনি এসে মোদের বুননি জমির উপর লাঙ্গল দিতেছে ও হাল গরু সব ছিনিয়ে নিয়েছে—মোশাই গো। বেটা কি বুননি নষ্ট করলে। শালা মোদের পাকা ধানে মই দিলে। নায়েব অমনি শতাবধি পাকসিক জড় করিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখে কুঠেল এক শোলার টুপি মাথায়—মুখে চুরট—হাতে বন্দুক—খাড়া হইয়া হাঁকা-হাঁকি করিতেছে। নায়েব নিকটে যাইয়া মেঁও-মেঁও করিয়া তুই একটা কথা বলিল, কুঠেল হাঁকায় দেও ২ মার ২ হুকুম দিল। অমনি তুই পক্ষের লোক লাঠি চালাইতে লাগিল—কুঠেল আপনি তেড়ে এসে গুলি ছুঁড়িবার উপক্রম করিল—নায়েব সরে গিয়ে একটা রাংচিত্রের বেড়ার পার্শ্বে লুকাইল। ক্ষণেককাল মারামারি লাঠালাঠি হইলে পর জমিদারের লোক ভেগে গেল ও কয়েকজন ঘায়েল হইল। কুঠেল আপন বল প্রকাশ করিয়া ডেং-ডেং করিয়া কুঠিতে চলে গেল ও দাদখায়ি প্রজারা বাটিতে আসিয়া 'কি সর্ব্বনাশ,—কি সর্ব্বনাশ—' করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

"নীলকর সাহেব দাঙ্গা করিয়া কুঠিতে যাইয়া বিলাতীপানি ফটাস্ করিয়া ব্রাণ্ডি দিয়া খাইয়া শিশ দিতে দিতে 'তাজা তোজা' গান করিতে লাগিলেন—কুকুরটা সম্মুখে দৌড়ে দৌড়ে খেলা করিতেছে। তিনি মনে জানেন তাঁহাকে কাবু করা বড় কঠিন, ম্যাজিস্ট্রেট ও জজ তাঁহার ঘরে সর্ব্বদা আসিয়া খানা খান ও তাঁহারদিগের সহিত সহবাস করাতে পুলিশের ও আদালতের লোক তাঁহাকে যম দেখে আর যদিও তদারক হয় তবু খুন মোকদ্দমায় বাহির জেলায় তাঁহার বিচার হইতে পারিবেক না। কালা লোক খুন অথবা অন্য প্রকার গুরুতর দোষ করিলে মফঃস্বল আদালতে তাহাদিগের সত্ত বিচার হইয়া সাজা হয়—গোরা লোক ঐ সকল দোষ করিলে সুপ্রিম কোর্টে চালান হয় তাহাতে সাক্ষী অথবা ফৈসাদিয়া ব্যয়, ক্লেশ, ও কর্ম্মক্ষতির জন্য নাচার হইয়া অস্পষ্ট হয় সুতরাং বড় আদালতে উক্ত ব্যক্তিদের মকদ্দমা বিচার হইলেও ফেসে যায়।

"নীলকর যা মনে করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। পরদিন প্রাতে দারোগা আসিয়া জমিদারের কাছারি ঘিরিয়া ফেলিল। দুর্ব্বল হওয়া বড় আপদ—সবল ব্যক্তির নিকটে কেহই এগুতে পারে না। মতিলাল এই ব্যাপার দেখিয়া ঘরের ভিতর যাইয়া দ্বার বন্ধ করিল। নায়েব সম্মুখে আসিয়া মোটমাট চুক্তি করিয়া অনেকের বাঁধন খুলিয়া দেওয়াইল। দারোগা বড়ই সোর-সরাবত করিতেছিল—টাকা পাইবা মাত্র যেন আগুনে জল পড়িল। পরে তদারক করিয়া দারোগা মেজিস্ট্রেটের নিকট দুদিক বাঁচাইয়া রিপোর্ট করিল—এদিকে লোভ ওদিকে ভয়। নীলকর আমিন নানা প্রকার জোগাড়ে ব্যস্ত হইল ও মেজিস্ট্রেটের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইতে লাগিল যে, নীলকর ইংরেজ, খ্রীষ্টান, মন্দকর্ম্ম কখনই করিবে না—কেবল কালা লোকে যাবতীয় দুষ্কর্ম্ম করে। এই অবকাশে সেরেস্তাদার ও পেশকার নীলকরের নিকট হইতে জেয়াদা ঘুস লইয়া তাহার বিপক্ষীয় জমানবন্দী চাপিয়া সপক্ষীয় কথা সকল পড়িতে আরম্ভ করিল ও ক্রমশঃ ছুঁচ চালাইতে ২ বেটে চালাইতে লাগিল। এই অবকাশে নীলকর বক্তৃতা করিল—আমি এস্থানে আসিয়া বাঙ্গালিদিগের নানা প্রকার উপকার করিতেছি—আমি তাহাদিগের লেখা-পড়ার ও ঔষধপত্রের জন্য বিশেষ ব্যয় করিতেছি—আবার আমার উপর এই তহমত? বাঙ্গালীরা বড় বেইমান ও দাঙ্গাবাজ। মেজিস্ট্রেট এই সকল কথা শুনিয়া টিফিন করিতে গেলেন। টিফিনের পর খুব চুরচুরে মধুপান করিয়া চুরট খাইতে ২ আদালতে আইলেন—মকদ্দমা পেশ হইলে সাহেব কাগজ-পত্রকে বাঘ দেখিয়া সেরেস্তাদারকে একেবারে বলিলেন—'এ মামেলা ডিস্‌মিস্ কর'। এই হুকুমে নীলকরের মুখটা একেবারে ফুলে উঠিল, নায়েবের প্রতি তিনি কটমট করিয়া দেখিতে লাগিলেন। নায়েব অধোবদনে টিকুতে ২—ভুড়ি নাড়িতে ২ বলিতে ২ চলিলেন—বাঙ্গালীদের জমিদারি রাখা ভার হইল—নীলকর বেটাদের জুলুমে মুলুক ফাঁক হইয়া গেল।"

সিপাহী-বিদ্রোহ ও নীল-বিদ্রোহের ঢেউ বাংলায় এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল যার ফলে, জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক, জন-সাধারণের বিদ্রোহের মর্মবাণী নিয়েই রচিত হয়েছিল বাংলার প্রগতিশীল সাহিত্য। মধুসূদন, দীনবন্ধু, কালীপ্রসন্ন, বঙ্কিম—সকলকেই এইসব ব্রিটিশ বিরোধী গণবিদ্রোহ গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' জমিদারী অত্যাচারের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছে। হিন্দু-মুসলমান কৃষকদের

জীবনকাহিনী ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ফুটে উঠেছে জমিদারদের বিরুদ্ধে 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে, তেমনই ইংরেজদের বিরুদ্ধে 'নীলদর্পণে'। কালীপ্রসন্ন তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় [১৮৬২] বাঙালী শিক্ষিতেরা ১৮৫৭-এর জাতীয় মহাবিদ্রোহের প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, তার প্রতি এতবড় মারাত্মক বিদ্রূপের কষাঘাত আর কেউ করেন নি। নীল-বিদ্রোহের সময়কার আইন-আদালতকে বিদ্রূপ করে হুতোম বলছে: "পেয়াদারা পর্য্যন্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে মফস্বলে চললেন। তুমুলকাণ্ড বেধে উঠলো। বাদাবুনে বাঘ (প্ল্যাণ্টারস্‌-এসোশিয়েশন) বেগতিক দেখে নাম বদলে (ল্যাণ্ডহোল্ডারস্‌ এসোশিয়েশন) তুলসী বনে ঢুকলেন। হরিশ মলেন। লং-এর মেয়াদ হলো। ওয়েল্‌স ধমক খেলেন। গ্রাণ্ট রিজাইন দিলেন, তবু হুজুক মিটল না।"

হুতোম আর এক জায়গায় বলছে—"নীলকর সাহেবেরা দ্বিতীয় রেভোলিউসন হবে বিবেচনা করে…গভর্ণমেণ্ট তোপ ও গোরা সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। রেজিমেণ্টকে রেজিমেণ্ট গোরা, গানবোট ও এস্পেশিয়াল কমিশনর চল্লো ; —মফস্বলের জেলে আর নিরপরাধীর জায়গা হয় না, কাগজে হুলস্থুল পড়ে গেল ও অণ্টর ব্রেড অবতার হয়ে পড়লেন।"

নীলকর-শোষিত ও অত্যাচারিত পল্লী-বাঙলার চিত্র পাওয়া যায় মীর মশররফ হোসেনের 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' নামক উপন্যাসে। মীর মশররফের বাড়ি ছিল কুষ্টিয়ায় এবং সেখানকার নীলকরদের অত্যাচারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' রচিত হয়। নীল-বিদ্রোহ সম্বন্ধে মীর মশররফ হোসেনের অনেক তথ্য জানা ছিল এবং নীল-বিদ্রোহের একটি ইতিহাস লেখার ইচ্ছাও তাঁর ছিল, কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়-নি। শেষজীবনে জলধর সেনকে তিনি লিখেছিলেন: "তোমাকে নীল-বিদ্রোহ সম্পর্কে অনেক নোট দিয়া যাইব। তুমি একখানি ইতিহাস লিখিও, আমি এ বয়সে আর পারিলাম না।" (জলধর সেন: 'কাঙ্গাল হরিনাথ', ১ম খণ্ড, পৃ ৩৮)

এই আবহাওয়াতেই আরও রচিত হয়েছিল বিখ্যাত 'বিষাদ-সিন্ধু'র প্রণেতা মোসারফ হোসেনের 'জমিদার-দর্পণ', বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' (ভাদ্র, ১২৮০) 'জমিদার-দর্পণ' সম্বন্ধে লিখেছিল "জমিদারদিগের অত্যাচার উদাহরণের দ্বারা বর্ণিত করা ইহার উদ্দেশ্য। নীলকরদিগের সম্বন্ধে বিখ্যাত

নীলদর্পণের যে উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ জমিদার সম্বন্ধে ইহারও সেই উদ্দেশ্য।”

কথিত আছে যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৬১ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তারকনাথ ঘোষের ঝামাপুকুরস্থ বাড়িতে বসে এক রাত্রের মধ্যে নীলদর্পণের ইংরেজি অনুবাদের কাজ শেষ করেন। সেই অনুবাদ প্রকাশ করলেন রেভারেণ্ড জেমস লঙ্‌ [১৫৯] কিন্তু তাতে নাট্যকার ও অনুবাদকের নাম ছিল না। অনুবাদ বার হবামাত্রই লঙ্‌ বিলাতে বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোকদের পাঠিয়ে দেন। যাঁরা এই বই পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন, গ্ল্যাডস্টোন, রিচার্ড কবডেন, জন ব্রাইট ইত্যাদি। শ্বেতাঙ্গ সমাজ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল; ধৈর্যহারা হয়ে ‘নেটিভদের’ খুব গালাগালি শুরু করল ও লঙের বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা আনল। এই মামলায় লঙের বিরুদ্ধে বাদী স্বরূপ দাড়ালেন ‘ইংলিশ-ম্যানের’মালিক-সম্পাদক ওয়াল্টার ব্রেট ও ‘ব্রিটিশ ভারতের জমিদার ও ব্যবসায়ী সমিতির’ সেক্রেটারী ফারগুসন। ১৯, ২০ ও ২৪শে জুলাই, ১৮৬১ সালের এই তিন দিন ধরে কলকাতার সুপ্রিমকোর্টে মামলা চলে এবং মামলা-চলাকালীন কোর্ট সব সময় সরকারী কর্মচারী, ইংরেজ ব্যবসায়ী, নীলকর, পাদ্রী ও অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙালীতে ভর্তি থাকত। ২৪ জন বিশেষ জুরীর মধ্য থেকে ১৭ জনকে এই বিচারের জন্য ডাকা হয়েছিল। এই ১৭ জনের মধ্যে কেবলমাত্র একজন ছিলেন ভারতীয়, মানিকজি রুস্তমজি আর সকলেই ছিলেন ইংরেজ।

কোনো ব্যক্তি-বিশেষের মানহানি করেন নি বলে লঙের বিরুদ্ধে দেওয়ানী মামলা (civil action) আনা সম্ভব ছিল না, তাই এই ফৌজদারী মামলা। মামলাটা এনেছিল কলকাতার ইংরেজদের ‘জমিদার ও ব্যবসায়ী সংঘ’। তাদের পক্ষে প্রসিকিউটার ছিলেন পেটারসন ও কাউই আর লঙের পক্ষ নিয়েছিলেন এগলিংটন ও নিউমার্চ। লঙের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল যে তিনি হলেন ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে একজন ‘Propagator of a slander of a most dangerous kind’, ‘সব থেকে সাংঘাতিক রকমের অপবাদের প্রচারক’। লঙের বিরুদ্ধে আরও বলা হয় যে তিনি মহৎ ইউরোপীয়দের পিছন থেকে ছুরি মেরেছেন (a stab in the back) যে ছুরি তিনি শানিয়েছিলেন অন্ধকারে বসে। এই বই ইংরেজদের পশুদের চাইতেও নিচু স্তরে নামিয়ে দিয়েছে ও তাদের স্বদেশকে লোকের চক্ষে হেয় করেছে, ইত্যাদি। সর্বশেষে

প্রসিকিউটার পেটারসন জুরীদের নিকট আবেদন করলেন, "আমরা কি দেখি নি কিরকম একটা সূক্ষ্ম সুতোয় আমরা ঝুলছি? আমাদের ভারতে অবস্থান কতখানি বিপজ্জনক তা কি এই সেইদিনকার সিপাহী-বিদ্রোহ আমাদের শেখায় নি?" [১৬০] এই সূত্রে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য এই যে মামলার সময় ইংরেজরা এবং স্বয়ং বিচারপতি ওয়েল্‌সও নীলদর্পণের লেখক ও অনুবাদকের নাম প্রকাশ করবার জন্য লঙকে যথেষ্ট পীড়াপীড়ি করেছিল, কিন্তু লঙ তা প্রকাশ করতে কোন মতেই রাজী হন নি।

এগলিংটন লঙের পক্ষ সমর্থনে বললেন যে 'ইংলিশম্যান' ও 'হরকরা'র সম্পাদকরা "লাভের জন্য লেখে, কোনো বিশিষ্ট স্বার্থের সমর্থনে তারা ভাড়াটিয়া লেখক।" জেরার সময় 'ইংলিশম্যানের' সম্পাদক ব্রেট স্বীকার করলেন যে তিনি "প্রতি বৎসর ১০০০৲ টাকার বেশি নীলকরদের কাছ থেকে পেতেন।" [১৬১] আর ফোরবস্‌ 'হরকরার' সম্পাদক হবার দেড় বৎসর পূর্বে নিজেই নীলকর ছিলেন।

এগলিংটন দেখালেন যে, যে বিচারপদ্ধতি লঙের বিরুদ্ধে ব্যবহার হয়েছে সেটা "not very fair, open and mainly mode of procedure"; তাছাড়া এই আইন একশো বছরের পুরনো আইন ও ইংল্যাণ্ডে এ আইন অচল হয়ে গিয়েছে। উপসংহারে এগলিংটন বললেন যে যদি নীলদর্পণ মানহানির কারণ হয়ে থাকে, তাহলে জগতের শ্রেষ্ঠ পুরাতন ও নতুন সাহিত্যগুলিও মানহানিকর বলে ধরে নিতে হবে; মলিয়েরের বইগুলি ছিল ডাক্তার ও পাদ্রীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার। ডিকেন্সের 'ওলিভার টুইস্ট' ওয়ার্ক-হাউস ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং 'নিকোলাস নিকলবী' ইয়র্কসায়ারের স্কুলগুলির বিরুদ্ধে লেখা হয়েছিল; 'টম কাকার কুঠি' লেখা হয়েছিল দাসপ্রথার বিরুদ্ধে। কিন্তু এই বইগুলির কোনোটার বিরুদ্ধেই মানহানির মামলা আনা হয় নি। [১৬২]

বিচারপতি মরডাণ্ট ওয়েল্‌সের [১৬৩] জুরীর প্রতি ভাষণ খোলাখুলি ও নির্লজ্জভাবে লঙের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট ছিল। তিনি বললেন যে জুরী, সরকারী কর্মচারী, সৈনিক ও ব্যবসায়ী—সকলেরই উৎপত্তি মধ্যবিত্ত-শ্রেণী থেকে, যে-শ্রেণীর মেয়েদের এই বইতে নির্লজ্জভাবে নিন্দা করা হয়েছে ও যে-মেয়েরা এদেশে এসে তাদের স্বামীদের সঙ্গে এত পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করছে। [১৬৪] বাঙালীদেরও তিনি একচোট প্রাণভরে গালাগালি দিয়ে নিলেন।

লঙ আদালতে তার শেষ বিবৃতিতে বলেছিলেন: "মিউটিনি শেষ হয়ে গিয়েছে; কে জানে ভবিষ্যতে কি হবে? যা অনেকের কাছেই ভীতপ্রদভাবে দূর থেকে দেখা দিচ্ছে আমি তার দিকে চোখ বুঁজে থাকতে পারি না। তা নিকটেও হতে পারে, দূরেও হতে পারে; কিন্তু রুশদেশ ও তার প্রভাব ভারত সীমান্তের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। তার প্রভাব, যা কাবুলে বিশ বৎসর পূর্বে বিস্তার লাভ করেছিল তা ভরতবর্ষেও মিউটিনির সময় অনুভব করা গিয়েছিল।" [১৬৫] লঙের দূরদর্শিতা প্রশংসনীয়।

জুরীরা লঙ্‌কে দোষী সাব্যস্ত করেন ও তাঁর একহাজার টাকা জরিমানা ও এক মাসের জন্য কারাগারের আদেশ হয়। সুসাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন সিংহ বিচারের রায়ের সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন। রায় বার হওয়ামাত্র তিনি জরিমানার এক হাজার টাকা দিয়ে দেন। এবং রাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহ উকিলের ব্যয় বহন করেন। লঙের মামলার সময় দীনবন্ধুও মামলার খরচ বহন করতে প্রতিশ্রুত হন। নীলদর্পণের প্রথম সংস্করণ শেষ হলে কালী-প্রসন্ন নিজের খরচে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন ও বিনামূল্যে বিতরণ করেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে যতগুলি অন্যায় অবিচারের উদাহরণ দেখা যায় লঙের বিচার তার মধ্যে অন্যতম; সভ্য জগতের ইতিহাসে এই রকম বিচার-প্রহসনের উদাহরণ খুব কমই আছে যার সঙ্গে এর তুলনা করা চলে। মহারাজা নন্দকুমারের বিচারক, ভারতীয়-বিদ্বেষী উদ্ধত প্রকৃতির ইমপে'র সঙ্গে মর্ডাণ্ট ওয়েলসের অনেক সাদৃশ্য আছে। ইম্‌পে'র মতো একই চেয়ারে বসে, একই ঘরের মধ্যে ওয়েল্‌স লংকে শাস্তি দিয়াছিলেন।

হরিশচন্দ্র তাঁর 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ওয়েল্‌সের ব্যবহার তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে ওয়েল্‌স নিরপেক্ষ বিচারকের মতো ব্যবহার করেন নি, তিনি নীলকরদের উকিলের মতো ব্যবহার করেছিলেন। জুরীরাও ছিল নীলকরদের হাতের পুতুল। সূত্রগুলি সব ওয়েল্‌সের হাতেই ছিল, এবং ন্যায় বিচারের পরিবর্তে, তিনি খুব কৃতিত্বের সঙ্গে পুতুল নাচ দেখিয়ে-ছিলেন। অন্যান্য ভারতীয় সংবাদ-পত্রগুলিতেও এই বিচার প্রহসনের তীব্র প্রতিবাদ হয়েছিল।

ইংল্যাণ্ডেও এই বিচার-প্রহসনের প্রতিক্রিয়া কম হয় নি। 'ডেইলী-নিউজ', 'স্পেকটেটর', 'স্যাটারডে-রিভিউ', 'লণ্ডন রিভিউ', 'হোম নিউজ' ইত্যাদি সব

পত্রিকাগুলিই ওয়েল্‌সের বিচার-প্রহসনকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করে। 'লণ্ডন-রিভিউ' দাবি জানায় যে ভারতীয় কৃষকদের অবস্থা, ভারতে বিচারের ব্যবস্থা ইত্যাদি সব-বিষয়ে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। 'ফ্রেণ্ড অব-ইণ্ডিয়া'র লণ্ডন প্রতিনিধি ইংল্যাণ্ডের এই সব প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করে লিখলেন যে এমন কাউকে দেখা গেল না যে ওয়েল্‌সের বিচার সমর্থন করতে সাহস করছে। কেবলমাত্র 'টাইমস্' না এদিকে না ওদিকে, 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি' করে তার কর্তব্য শেষ করেছে। তারপর তিনি মন্তব্য করেছেন যে "এই রকম সংকটের সময় এই বিচারের মতো অবিচার ও অবিবেচনার কাজ আর হতে পারে না। ভারতের কুশাসনের ইতিহাসে এটা একটা দাগ রেখে দেবে।"

লঙের বিচারের প্রতিক্রিয়া ভারতেও অনেকদিন ধরে চলেছিল। মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌সের বাঙালীদের প্রতি অসংগত ও অন্যায় গালাগালি স্বভাবতই বাঙালী সমাজকে চঞ্চল করে তুলেছিল। ইহার প্রতিবাদে অনেক সভাসমিতির পর স্থির হয় যে ভারত সরকারের নিকট ইহার প্রতিকার দাবি করে একটি দরখাস্ত করা হবে। শিক্ষিত বাঙালীরা এবিষয়ে সে সময়ে কিরূপ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন তার কিছুটা বোঝা যায় ১৮৬২ সালের ১৪ই এপ্রিল তারিখের ''সোমপ্রকাশ' থেকে :

"লঙ সাহেবের বিচার-কালে স্যার মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌স্ যাবতীয় বাঙালীকে গালি দিয়াছিলেন বলিয়া এতদ্দেশী সমুদয় প্রধান লোক একত্র হইয়া শোভা-বাজারে রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটিতে এক সভা করিয়া স্যার মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌সের দুঃস্বভাবের বিষয় স্টেট সেক্রেটারির গোচর করিলেন। প্রায় ২০,০০০ লোক ঐ আবেদন-পত্রে স্বাক্ষর করেন। বিশেষ আনন্দের বিষয় এই আবেদন পত্র গোপনে মুদ্রিত হইয়া স্বাক্ষরার্থ প্রায় একমাস চতুর্দিকে প্রেরিত হয়, 'ইংলিশম্যান' ও 'হরকরা' সম্পাদক এক খণ্ডের জন্য ৫০০ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন। এরূপ একতা হইয়াছিল যে তথাপি কেহ এক খণ্ড দেন নাই। স্যার চার্লস উড উক্ত আবেদনের উত্তরদান কালে মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌সকে সাবধান করিয়া দিলেন।" [১৬৬]

আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে নীল-আন্দোলনের সময় ভারতে ব্রিটিশ শাসক শোষকশ্রেণীর মধ্যে একটা তীব্র মতভেদের সৃষ্টি হয়েছিল। অনেকে এই ঝগড়াটাকে এইভাবে দেখান যে ব্রিটিশদের মধ্যে একদল ছিল ভারত-দরদী আর একদল ছিল ভারত-বিদ্বেষী। কিন্তু ব্যাপারটাকে এইভাবে দেখা

খুবই ভুল। বস্তুত, ভারত-দরদী তাদের মধ্যে কেউই ছিল না, থাকা সম্ভবও ছিল না; উভয়দলই ছিল সাম্রাজ্যবাদী। তাদের মধ্যে এইটুকু মাত্র তফাত ছিল যে একদল চেয়েছিল সবরকম বিশৃংখলা দূর করে ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে আরও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা (বিশেষ করে ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের পর তাদের কাছে এই কর্তব্য বিশেষ জরুরি হয়ে পড়েছিল), আর একদল চেয়েছিল আগেকার মতো অবাধ শোষণ চালিয়ে যাওয়া। এটাই হল গ্র্যান্ট, সীটন-কার প্রভৃতির সঙ্গে নীলকরদের ঝগড়ার মূল কারণ।

নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে ছোটলাট গ্র্যান্টের মন্তব্য ও নীল-কমিশনের সভাপতিরূপে বাংলা সরকারের সেক্রেটারি সীটন-কারের কার্যকলাপে নীলকররা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। নীল-কমিশনের অধিবেশন চলা কালেই নীলকররা ১৮৬০ সালের ২৬শে জুলাই ভারত-সরকারের নিকট ছোটলাটের বিরুদ্ধে এক আবেদনপত্রে অভিযোগ আনল যে ছোটলাট যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তাতে নীলব্যবসার একেবারে সর্বনাশ হবে এবং তিনি যেভাবে মালিক ও শ্রমিকদের ঝগড়ায় ("a dispute between capital and labour") বেআইনী ও অবৈধভাবে আচরণ করছেন তা যেন সত্বর বন্ধ করা হয়। বড়লাট নীলকরদের আবেদন অগ্রাহ্য করলেন ও গ্র্যান্টকে সমর্থন জানালেন।

নীলকররা এতে খুব নিরুৎসাহ না হয়ে একেবারে 'হোমে' গিয়ে আন্দোলন শুরু করল। লণ্ডনে তাদের সব চাইতে বড় কীর্তি হল 'Brahmins and Pariahs' নাম দিয়ে একখানা পুস্তিকা বার করা। তার মূল কথা হল যে ছোটলাট গ্র্যান্ট বিচারালয়ের স্বাধীন কার্যে হস্তক্ষেপ করে ভারতে ইংরেজ বাসিন্দাদের পুঁজি ও ব্যবসা নষ্ট করছেন আর বাংলায় বর্তমানে যে মারাত্মক বিদ্রোহ ও অগ্নিকাণ্ড হচ্ছে তা তিনিই ঘটিয়েছেন। গ্র্যাণ্টকে তারা 'the present high priest of the Civil Service Juggernaut, ও তাঁর সহকর্মীদের 'Civil Lathials' বলে বর্ণনা করল। গ্র্যাণ্টের মতো একজন অজ্ঞ ও দুরভিসন্ধি-পূর্ণ স্বৈরাচারী শাসকের হাত থেকে তারা মুক্ত হতে চায়—যে শাসক 'পৃথিবীর সুন্দরতম দেশকে শাসন করছেন'। [১৬৭] শুধুমাত্র গালাগালিতে সন্তুষ্ট না হয়ে 'হরকরা' ছড়া লিখতে শুরু করল ও গ্র্যাণ্টকে একাধারে চেঙ্গিস, তৈমুরলঙ্গ, কুবলাই খান ও নাদির শাহ্‌র সংমিশ্রন বলে বর্ণনা করল। [১৬৪]

ইতিমধ্যে বাংলা সরকার একখানা পুস্তকে (Selections from the Records of the Government of Bengal—No. XXXIII) নদীয়া বিভাগের কমিশনার লাসিংটনের ১৮৩০ সালের ৬ই আগস্ট বাংলা সরকারের সেক্রেটারীকে লিখিত একখানি চিঠি প্রকাশিত হয়। এই চিঠিতে বলা হয়েছিল যে, যশোহর জেলায় অবস্থিত লক্ষ্মীপাশা নীলকুঠির অধ্যক্ষ জন ম্যাকআর্থারের প্ররোচনায় একটা দাঙ্গা হয় এবং তাতে একজনের মৃত্যু ঘটে। ঐ পুস্তক বার হবার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাকআর্থার গ্র্যাণ্টের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে মানহানির মামলা রুজু করেন। মানহানি প্রমাণিত হয় না এবং ম্যাকআর্থার হেরে যান।

প্রথমদিকে ভারত সরকার গ্র্যাণ্টের নীতিকে সমর্থন জানিয়েছিল, কিন্তু পরে এই নীলের ব্যাপার নিয়েই তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। গ্র্যাণ্ট শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। সীটন কারকেও অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল, আর এসলী-ইডেন খুব অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছিলেন।

নীল-কমিশন

বহুদিন ধরে অনেকে যা দাবি করেছিলেন, অবশেষে সরকারকে বাধ্য হয়ে সেই নীল-কমিশন বসাতে হল। নীল-বিদ্রোহ যখন চরমে উঠেছে, ঠিক সেই সময়ে পাঁচজন সদস্য নিয়ে ১৮৬০ সালের ৩১শে মার্চ, বাংলাদেশে নীল-চাষের অবস্থা ও কৃষকদের অভিযোগ তদন্ত করবার জন্য নীল-কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন ১৮ই মে থেকে ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত ১৩৬ জনের (১৫ জন সরকারী কর্মচারী, ২১ জন নীলকর, ৮ জন পাদ্রী, ১৩ জন জমিদার, ৭৭ জন রায়ত) সাক্ষ্য গ্রহণ করেন ও ২৭শে আগস্ট রিপোর্ট পেশ করেন। সরকারের পক্ষ থেকে ছিলেন সীটনকার (সভাপতি) ও আর. টেম্পল্‌, পাদ্রীদের পক্ষ থেকে রেভারেণ্ড সেইল, নীলকর সমিতির পক্ষ থেকে ফারগুসন ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশনের পক্ষ থেকে চন্দ্রমোহন চাটার্জী। চন্দ্রমোহনকে কমিশনের সদস্য করার জন্য বাঙালীরা খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, কারণ তিনি না ছিলেন রায়তদের প্রতিনিধি হবার উপযুক্ত, না ছিলেন শিক্ষিত বাঙালীর প্রতিনিধি হবার উপযুক্ত। বস্তুতপক্ষে উত্তরাধিকার সূত্রে 'কৃষ্ণাঙ্গ' হলেও, তিনি নিজেকে 'নেটিভ' মনে করতে লজ্জিত বোধ করতেন এবং ইউরোপীয় পোশাক-পরিচ্ছদ, আদবকায়দা সবই সযত্নে আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন। জাতি-বিদ্বেষ, ইংরেজ-বিদ্বেষ ইত্যাদি নীচতা থেকে তিনি ছিলেন একেবারে মুক্ত! তাই ১৮৪৯ সালে 'ব্ল্যাক বিলের' আন্দোলনের সময় একজন মাত্র ভারতীয় যিনি ইংরেজদের সমর্থন করেছিলেন তিনি হলেন এই চন্দ্রমোহন।

হরিশচন্দ্র এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন যে "নীল-কমিশনের একটা কর্তব্য হবে জমিদার ও রায়তের মধ্যে সম্বন্ধগুলি নির্ণয় করা। এই ব্যাপারে জমিদার ও নীলকরের স্বার্থ অনেকাংশে অভিন্ন বলেই নির্ধারিত করা হবে। চন্দ্র-মোহনবাবু নিজে একজন জমিদার এবং এটা অনুমান করা যায় যে, তিনি রায়তদের স্বার্থ প্রবলভাবে সমর্থন করবেন না। চন্দ্রমোহনবাবু এককালে দু বৎসর ধরে একটা নীলকুঠি পরিচালনা করেছিলেন, সেই জন্য—যাকে বলা হয় নীলকরদের অসুবিধা—সেগুলি সম্বন্ধে তিনি খুবই ওয়াকিবহাল হবেন।" [১৬৯] এই কথাগুলি থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বাঙালী

জমিদারদের সম্বন্ধে হরিশচন্দ্রের কোনো বিভ্রম ছিল না এবং তাঁদের স্বার্থ কোন্‌দিকে ছিল তাও তিনি জানতেন।

নীল-কমিশনের তদন্তের ফলে নীলকরদের বিভিন্ন ধরনের অত্যাচারের কাহিনীগুলি এত দিন পরে এবার একেবারে সরকারীভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ল। জবরদস্তির দ্বারা চাষীদের দাদন নিতে বাধ্য করা, তাদের উপর জোর করে চুক্তি চাপিয়ে দেওয়া, লাঠিয়াল দিয়ে গ্রামবাসীদের উপর মারপিট ও নানা-প্রকারের জুলুম করা, বাজার, ঘরবাড়ি লুঠ করা ও আগুন ধরিয়ে দেওয়া, নীল-কুঠির গুদামে সকলকে কয়েদ রাখা, গরুবাছুর আটক রাখা, বিনামূল্যে গাছ গাছড়া কেটে নিয়ে যাওয়া, শ্রেষ্ঠ জমিতে নীলচাষীকে নীল বুনতে বাধ্য করা, নীলগাছের জন্য চাষীকে ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত করা, লোক অপহরণ করা, স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করা, ইত্যাদি, ইত্যাদি—নীলকরদের বিরুদ্ধে এই সব অভিযোগ কমিশনের তদন্তে ভালোভাবেই প্রমাণিত হয়ে গেল।

কমিশনের তদন্তে এতদিন পরে যে সব সত্য সরকারীভাবে প্রকাশিত হল তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ; তার আলোচনা নিষ্ফল হবে না। চুক্তি সম্বন্ধে কমিশন বলেছেন যে স্বেচ্ছায় চাষীরা নীলচাষ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয় না; দাদন ও চুক্তি তার উপর জোর করে চাপান হয়। দাদন নেবার পর আবার "রায়তকে জমিচাষ করতে, নীল-বুনতে, নিড়ান দিতে, গাছ কাটতে ও গাড়ি করে গাছ কুঠিতে পৌছে দিতে বাধ্য করা হয়···যে জমিতে নীলকর নীলের জন্য দাগ দেয় তা হচ্ছে সাধারণত চাষীর সব থেকে ভালো জমি—যা চাষী খুব যত্ন করে চাষ করেছে দামী ফসল ফলাবে বলে···নীলগাছের জন্য খুব অল্পদাম দেওয়া হয় বলে, নীলকরের নিকট রায়তের ঋণ সব সময়ই থেকে যায় এবং যে রায়ত একবার নীল বুনতে শুরু করেছে, সে তার বংশধরদের তৃতীয় ও চতুর্থ বংশ পর্যন্ত নীলচাষ করার কাজ উত্তরাধিকার সূত্রে দিয়ে যায় এবং তাদের বংশধররা এই ঋণ কখনই শোধ করে দিতে সক্ষম হয় না, আর সক্ষম হলেও তাকে শোধ দিতে দেওয়া হয় না···এই যে ব্যবস্থা, বলপ্রয়োগের দ্বারা যা চালু রাখা হয়, এই ব্যবস্থা আরও বিষাক্ত হয় আমলাদের শোষণ ও অত্যাচারের ফলে। ···নীলকরের কর্মচারীরা কৃষকদের উপর অনেক রকমের অত্যাচার ও লুণ্ঠন করে, যেমন তাদের বাঁশ কেটে নেওয়া, বাগানের ফসল নিয়ে যাওয়া, লাঙ্গল কেড়ে নেওয়া, গরু আটক রাখা। নীলকরের ইচ্ছামতো কাজ করতে

যারা রাজী হয় নি তাদের শিক্ষা দেবার জন্য নির্দয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে এবং এমন অনেক উদাহরণ আছে যেখানে নীলকরের কর্মচারীরা বাড়িঘর ভেঙেচুরে দিয়েছে, জালিয়ে দিয়েছে, বাজার লুঠ করেছে, লোক হরণ করেছে এবং সম্ভ্রান্ত লোকদের পর্যন্ত সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে, মাসের পর মাস ধরে অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে গুদামে আটক করে রেখেছে এবং পুলিশের চোখ এড়াবার জন্য তাদের এক কুঠি থেকে আর এক কুঠিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে: এর চেয়েও বর্বর অত্যাচার স্ত্রীলোকদের উপর করা হয়েছে। জমিদারদের প্রতি বিরূপ মনোভাব, বলপূর্বক তাদের জমি দখল ইত্যাদি কারণে অনেক মামলা-মোকদ্দমা ও রক্তাক্ত মারামারি হয়েছে।...অনেক ক্ষেত্রে নীলকর মারপিট করে অথবা মারপিটের ভয় দেখিয়ে জমিদারের নিকট থেকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পত্তনি আদায় করে নিয়েছে; এইভাবে নীলকররা জমিদার হয়ে রায়তদের উপর প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করেছে, যা না করলে কৃষকদের উপর জোর-জবরদস্তি করে এত নীল তারা কখনই উৎপাদন করতে পারত না। এইরকম জোর জবর-দস্তি করে জমি দখল সম্ভব হত না যদি পুলিশ এত অযোগ্য না হত, আইন দুর্বল না হত এবং সরকার, বিশেষ করে ম্যাজিস্ট্রেটরা, ভারতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে সাগ্রহে নীলকরদের পক্ষ অবলম্বন না করতেন।...যেসব জায়গায় নীলচাষ হচ্ছে সেখানে কৃষকদের অবস্থার কোনোপ্রকার উন্নতিই দেখা যাচ্ছে না।... বর্তমানে কৃষকদের অসন্তোষ যে ফেটে পড়ছে, তা গত ২০।৩০ বৎসর ধরে জমাট বাধছিল এবং স্থানীয় সরকারী কর্মচারী, বুদ্ধিমান ভারতীয় ও বেসরকারী ইউরোপীয়রা সরকারী ও বেসরকারী রিপোর্টে অনেক সময়ে এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এবং সর্বোপরি নীলচাষের যেরূপ ব্যবস্থা এখানে বর্ণনা করা হল, তা হচ্ছে নীতিগতভাবে দুরাচারপূর্ণ, কার্যত ক্ষতিকারক এবং সম্পূর্ণরূপে যুক্তিবিরুদ্ধ।" [১৭০]

নীলকরদের সম্বন্ধে নীল-কমিশন একটা বড গুণের কথা উল্লেখ করতে ভুলে যান নি—সেটা হল রাজনৈতিক গুণ: "দেশের অভ্যন্তরে চতুর্দিকে ছড়িয়ে ইউরোপীয়দের উপস্থিতি ও তাদের বসবাস রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত মূল্যবান। দুঃসময়ে ও সংকটকালে সরকারকে এই নীলকরদেরই সাহায্য নিতে হবে অরাজকতা দমন করবার জন্য, শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ও অসন্তোষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য।" [১৭১]

ভারতবাসীকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলে বেঁধে রাখার জন্য এই নীলকরদের ভূমিকা সম্বন্ধে ইংরেজ শাসকশ্রেণী সম্পূর্ণরূপে সচেতন ছিল এবং এটাই ছিল তাদের পক্ষে সব চেয়ে বড় কথা।

লোকহরণ এবং তাদের গুদামে আটক রাখা সম্পর্কে কমিশন বলেছেন যে তাঁদের নিকট অনেকগুলি প্রমাণসিদ্ধ ঘটনা উপস্থিত করা হয়েছে, যা থেকে তাঁরা মনে করেন যে এই প্রথাটা একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। নীলকররা যত রকমের অত্যাচার করে তার মধ্যে হরণের ঘটনাগুলিকে আবিষ্কার ও প্রমাণ করা সব থেকে কঠিন : স্বভাবতই এ ধরনের অপরাধীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাস্তি এড়িয়ে যেত। কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করে কমিশন বলেন, অনেক ক্ষেত্রে সমস্ত তথ্য জানা থাকলেও এবং প্রতিবিধানের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও অপরাধীদের কোনো বিচার হয় নি। এর ফলে সরকার লোকচক্ষে হেয় হয়ে পড়ে এবং লোকে সরকারের বিচারে আস্থা হারিয়ে ফেলে।

চুক্তি-পত্র সই করা প্রসঙ্গে কমিশন বলেন যে রায়ত যখন প্রথম চুক্তি সই করে দাদন নেয় তা সে ইচ্ছায়ই করুক আর অনিচ্ছায়ই করুক, উভয় ক্ষেত্রেই ফলাফল এক। কমিশন এমন কোনো রায়তের সন্ধান পান নি যে দাদনের টাকা শোধ দিতে পেরেছে, কিংবা যাকে নতুন করে বছর বছর চুক্তি-পত্রে সই দিতে হয় নি। "যখন আমরা চুক্তি-পত্র ও তার আক্ষরিক অর্থের দিকে তাকাই, যখন আমরা কৃষকদের হিসাবের খাতাগুলিতে দেখি যে তাদের দেনার পরিমাণ বেড়েই যাচ্ছে, তা কোনোদিনই শোধ হবার দিকে যায় না, যখন দেখি যে কৃষকরা এত দীর্ঘ সময় ধরে নীলচাষে চুক্তিবদ্ধ রয়েছে, যখন একজন নীলকরের মুখে স্বীকারোক্তি শুনি যে রায়তকে দেনা শোধ দিতে দেওয়া হলে তার কুঠি বন্ধ করে দিতে হবে…যখন আরও দেখি যে নীলের বাণ্ডিলগুলি ওজন করার সময় কৃষকদের ঠকান হয়, নীলের বিঘা মাপার সময় আবার তাদের ঠকান হয়, আর সেই সঙ্গে যখন বিচার করি নীলকুঠির কর্মচারীদের সংখ্যা, তাদের চরিত্র, তাদের আয়ের পরিমাণ ইত্যাদি…সব যখন বিচার করি, তখন সমস্ত ব্যাপারটা এমন একটা অবস্থা প্রকাশ করে যা খুবই পীড়াদায়ক এবং দৃঢ় হস্তে যার সংস্কার সাধন প্রয়োজন।" [১৭২]

নীল-কমিশন পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটদের সম্বন্ধে তাঁদের রিপোর্টে যে রায় দিয়েছিলেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পুলিশদের সম্বন্ধে তাঁদের মত হচ্ছে, "সামগ্রিকভাবে তারা যে ঘুষখোর ও দুর্নীতি-প্রবণ, এটা অস্বীকার করা

যায় না।…নীলকররা খোলাখুলিভাবেই আমাদের বলেছে কিভাবে তারা পুলিশ অফিসারদের দিয়ে তাদের নিজেদের ইচ্ছামতো কাজ করিয়ে নিয়েছে। যখন অবস্থা এই দাঁড়ায় যে পুলিশের সাহায্য অন্যান্য যে কোনো পণ্যের মতো কেনা যায়, তখন এটা খুবই পরিষ্কার যে, যাদেরই পকেট ভর্তি তারাই এর সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।" [১৭৩]

তখনকার দিনে সকল ম্যাজিস্ট্রেটরাই ছিলেন ইংরেজ, তারা "বেশির-ভাগ ক্ষেত্রেই নীলকরদের সহায়ক ও উপদেষ্টা ছিলেন।" কমিশন এমন কিছু প্রমাণ পান নি যা থেকে বোঝা যায় যে ম্যাজিস্ট্রেটরা নীলকরদের অপছন্দ করত (নীলকরদের অভিযোগ ছিল যে ম্যাজিস্ট্রেটরা ও পাদ্রীরা তাদের ঘোরতর শত্রু ছিল)। "নীলকরদের অপছন্দ কিংবা অসমর্থন করা তো দূরের কথা, আমরা মনে করি যে ম্যাজিস্ট্রেটরা রায়তদের প্রতি তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না, এবং তাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ সাহায্য ও রক্ষণ তাদের প্রাপ্য তা তাঁরা দেন নি। প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটদের ঝোঁক ছিল তাঁদের দেশবাসীদের দিকেই—যাদের তিনি নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতেন কিংবা যাদের অতিথি তিনি হতেন।" [১৭৪]

পাদ্রীদের সম্বন্ধে কমিশনের অভিমত এই যে 'চার্চ-মিশনারি সোসাইটির' কয়েকজন পাদ্রী রাজনৈতিক আন্দোলনকারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। "কিন্তু তাঁরা কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য কিংবা কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এই কাজ করেন নি" তাছাড়া, তাঁরা কোনো "অসঙ্গত বা বেআইনী" কাজও করেন নি; "পক্ষান্তরে তাঁরা রায়তদের আইন মান্য করে চলতে ও কোনো অবৈধ কাজ না করতে বলেছেন; তাঁরা তাদের এই বৎসর নীল বুনতেও বলেছেন; আর যদি তাদের উপর অত্যাচার হয় তাহলে উপরওয়ালাদের কাছে নালিশ করতে বলেছেন।…আসল কথা হচ্ছে যে, পাদ্রীদের প্ররোচনায় রায়তরা নীলচাষ বন্ধ করে দিয়েছে—এই উক্তির কোনো যুক্তিযুক্ত ভিত্তি নেই।" [১৭৫]

নীল-কমিশন তাঁদের রিপোর্টের শেষ দিকে যে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁরা বলেছেন: "আমরা এই সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, সম্প্রতি নদীয়া ও অন্যান্য জেলায় কৃষকরা যে নীল বুনতে অস্বীকার করেছে, তা অন্য যে কোনো সময়ে যে কোনো সুযোগে ঘটতে পারত। জনমতের এই বিক্ষুব্ধ অভিব্যক্তির (outburst of popular feeling)

জন্য সমস্ত উপকরণই প্রস্তুত ছিল।…জমিদার কিংবা কলকাতার গুপ্ত প্রতিনিধিদের প্রচারের ফলে যে এই অসন্তোষ বিস্তার লাভ করেছে তার কোনো প্রমাণ আমরা খুঁজে পাই নি।…আমাদের অভিমত এই যে জমিদাররা কৃষকদের স্বাধীনভাবে কাজ করার প্রচেষ্টায় বা তাদের কোনোরকমের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সম্বন্ধে অত্যন্ত ভীত, কারণ তাঁরা জানেন যে এর ফলে তাঁদের নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগতে পারে। তাই জমিদারের পক্ষে কৃষকদের উত্তেজিত করা স্বাভাবিক নয়।" [১৭৬]

নীল-কমিশনের রিপোর্টে নীলকরদের সমস্ত রকমের অত্যাচার-উৎপীড়নের কাহিনীগুলি সরকারী ছাপ নিয়ে জনসাধারণের নিকট আত্মপ্রকাশের ফলে নীলকরদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির মূলে প্রচণ্ড আঘাত পড়ল বটে, কিন্তু কমিশন কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য নতুন কোনো আইন প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন নি। সরকার, নীল-কমিশন, ছোটলাট ও নীলকররা মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে আসলেন যে "নীলচাষে গভর্নমেণ্টের কোনোরকম হস্তক্ষেপ হলে, তা সমাস্যাটাকে আরও জটিল করে তুলবে। ভালো ম্যাজিস্ট্রেট, ভালো জজ, ভালো পুলিশ, নিয়োগ করাই হচ্ছে সরকারের কাজ—এবং তাঁরাই দেখবেন যাতে সুবিচার হয় এবং একপক্ষ যাতে অত্যাচার না করে ও অন্য পক্ষ না ঠকায়।" [১৭৭] রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর সরকার একটা ইস্তাহারে কেবলমাত্র জানিয়ে দিলেন যে (১) সরকার নীলচাষের পক্ষে বা বিপক্ষে নন; (২) অন্য যে কোনো শস্যের মতো নীলচাষ করা বা না করা সম্পূর্ণরূপে প্রজার ইচ্ছাধীন; (৩) প্রজা কিংবা নীলকর যে কেউ আইন অমান্য করবে, তারই শাস্তি হবে। নীলকরদের যাতে আয়ত্তের মধ্যে আনা যায় ও রায়তরা যাতে আইন-আদালতের কিছুটা সাহায্য পায়, এই উদ্দেশ্যে নদীয়া, যশোহর ইত্যাদি জেলাগুলিতে মহকুমার সংখ্যা বাড়ান হল, কতকগুলি বিচারাদালত স্থাপিত হল ও থানার সংখ্যা বাড়িয়ে তাতে অধিক সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হল। এর ফলে অবস্থা পূর্বেও যা ছিল, এখনও তাই রয়ে গেল। তফাত হল এইটুকু যে কৃষকরা এখন থেকে তাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হল।

নীল-কমিশনের রিপোর্টে কেউই সন্তুষ্ট হল না। নীলকরদের নগ্ন মূর্তি প্রকাশ হয়ে পড়ায় ও তাদের বীভৎস অত্যাচারের কাহিনীগুলি সরকারীভাবে সাধারণ্যে প্রকাশিত হওয়ায় তারা প্রতিশোধ নেবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠল। ছোটলাট গ্রাণ্ট, সীটন কার, রেভারেণ্ড লঙ, হরিশচন্দ্র মুখার্জী কেউই তাদের

আক্রোশ থেকে রেহাই পান নি, আর এসলী ইডেন খুব অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদেরই মুখপত্র 'ক্যালকাটা রিভিউ' কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে গিয়ে ভারত সরকারের চরিত্র সম্বন্ধে কতকগুলি খাঁটি কথা লিখে ফেলল: "একটা গভর্নমেণ্ট যখন সর্বজনীনভাবে জনসাধারণের বিরাগভাজন হয় (এবং ভারত গভর্নমেণ্ট যে ভারতবাসীদের কাছে বিরাগভাজন তা ১৮৫৭ সালে নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে; এবং বেসরকারী ইউরোপীয়ানদের নিকটও যে তাঁরা বিরাগভাজন তা কে অস্বীকার করতে পারে?) তাতেই সাধারণত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় যে তা হচ্ছে দোষপূর্ণ, অন্যায়, কিংবা জনসাধারণের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে অনুপযোগী।... আমাদের গভর্নমেণ্ট হচ্ছে বংশগত, যা বদলায় না ও যার মধ্যে নতুন রক্ত সঞ্চার হয় না। এই সরকার বাংলাদেশেও যা, সমস্ত ভারতবর্ষেও তাই এবং তাঁদের দায়িত্বজ্ঞানশূন্যতা প্রকাশ পায় তাঁদের রূঢ়তায়, ঔদ্ধত্যে এবং সমস্ত রকমের সংস্কারের প্রতি তাঁদের অবজ্ঞায়।" [১৭৮]

এমনকি ছোটলাট গ্র্যাণ্টও কটাক্ষ করে বলেছিলেন, "সত্য সত্যই এই রিপোর্টটা, যার নরম সুর খুবই প্রশংসনীয়, কৃষকদের মনোভাবের তীব্রতা সম্বন্ধে একটা ক্ষীণ আভাস মাত্রই দেয়।" [১৭৯]

বিদ্রোহের প্রথমদিকে কৃষকদের এই সংগ্রামটা শুরু হয়েছিল কেবলমাত্র নীলকরদের বিরুদ্ধে। বিদ্রোহ যখন একটা কৃষক-বিপ্লবের রূপ নিতে চলল, তখন সরকার নীলকরদের বাঁচাবার জন্য তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে রণক্ষেত্রে এসে হাজির হল। " 'শৃঙ্খলা' বজায় রাখার জন্য সরকারের সঙ্গে নীলকরদের মৈত্রী ভালোভাবেই কার্যকরী হল। আইন ও বিচারের শ্রেণীচরিত্রের এতটা প্রকাশ আর কখনো হয় নি।" [১৮০] ভারত সরকার ও বাংলা সরকার তাদের সৈন্য ও পুলিশ সমাবেশ করে কৃষকদের বিদ্রোহ দমনের জন্য উঠে পড়ে লাগলেন —যে কৃষকদের দাবি অসঙ্গত বলে তাঁরা এতটুকু অস্বীকার করতে পারেন নি।

১৮৬০ সালের নীলচুক্তি আইনের দ্বারা (১১ আইন) চাষীদের দিয়ে জোরজবরদস্তি করে নীলচাষ করবার যথেষ্ট চেষ্টা হয়েছিল। তারা হাজারে হাজারে জেলে গিয়েছে, হাজারে হাজারে আত্মগোপন করে রয়েছে, তবু তাদের দিয়ে জোর করে কেউ নীলচাষ করাতে পারে নি।

কৃষকদের এই দৃঢ় সংকল্প সরকারের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিল। তাই সরকার ১৮৬৮ সালে নীলচুক্তি আইন বাতিল করে দিতে বাধ্য হল। ইতিমধ্যে

১৮৬৬-৬৭ সালে তিরহুটে, বিশেষ করে ভাগলপুরে এবং ১৮৬৭-৬৮ সালে চামপারানে নীলচাষীদের ছোটখাট একটা বিদ্রোহ ঘটে গিয়েছিল।

কৃষকদের সেই সময়কার মনোভাব বর্ণনা করে পাদ্রী বমভাইটস্ বলেছিলেন যে "১৮৬০ সালের নীলচুক্তি আইন হবার পর থেকে রায়তরা সরকারের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। তাদের মনোভাব এখন খুবই দুঃখজনক ও অনেক ক্ষেত্রে খুবই তিক্ত।"

১৮৬০ সালের পর থেকে বাংলাদেশে নীলচাষ পূর্বের তুলনায় অনেক কমে গিয়েছিল এবং বিহার, উত্তর প্রদেশ ও মাদ্রাজে বিস্তার লাভ করেছিল। অনেক নীলকর বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে ঐ সব প্রদেশে নীলকুঠি স্থাপন করতে থাকে। ১৮৮২ সালে বাংলাদেশে যেখানে ১৮,৯৫৭ মণ নীল উৎপাদন হয়েছিল, সেখানে বিহারে হয়েছিল ৫৮,৫৬৯ মণ, উত্তর প্রদেশ ও অযোধ্যায় ১৫,৭১০ মণ, দোয়াবে ৫৭, ০৪২, আর মাদ্রাজে হয়েছিল প্রায় ৬১,০০০ মণ এবং এই নীলের মূল্য হত বছরে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা। [১৮১]

ইতিমধ্যে ১৮৮০ সালে জার্মান রাসায়নিক আডল্ফ ফন্ বেইয়ার আলকাতরা থেকে রাসায়নিক উপায়ে কৃত্রিম নীল রং প্রস্তুত করতে সক্ষম হন এবং এই জন্য ১৯০৫ সালে, যক্ষ্মা রোগের বীজাণু আবিষ্কারক জার্মান চিকিৎসাবিজ্ঞানী রবার্ট কখের সঙ্গে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৮৯২ সালে এই কৃত্রিম নীল বাজারে সস্তা দরে চালু হওয়াতে ভারতে নীলচাষ তারপর থেকে প্রায় একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়।

নীল-আন্দোলন ও মহাবিদ্রোহ

১৮৫৯ সাল থেকেই যে বাংলাদেশে নীল-আন্দোলন সংগঠিত গণ-আন্দোলনের রূপ ধারণ করতে থাকে তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই আন্দোলনের ক্রমবিকাশে তিনটি সুস্পষ্ট স্তর লক্ষণীয়: প্রথম পর্যায়—গণ-দরখাস্ত, আবেদন-নিবেদন; দ্বিতীয় পর্যায়: ধর্মঘট; এই দুইটিই অর্থনৈতিক স্তর; তৃতীয় পর্যায়: কৃষক বিদ্রোহ ও রাজনৈতিক স্তর।

প্রথম দিকে কৃষকরা দলবদ্ধভাবে পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট ও ছোটলাটের নিকট নীলকরদের অত্যাচারের প্রতিকারের দাবি জানিয়ে দরখাস্ত পাঠাতে থাকে। গণ-দরখাস্তের এই আন্দোলন গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে এবং এরই মাধ্যমে নীলচাষীরা ব্যাপকভাবে সংগঠিত হতে শুরু করে। পূর্বে যে আন্দোলন ছিল স্থানীয় ও বিচ্ছিন্ন, এখন তা জাতীয় আকার ধারণ করল। এই গণ-দরখাস্তের আন্দোলন থেকে সরকার বুঝতে পারল যে বাংলার অবস্থা খুবই সংকটজনক হয়ে পড়েছে, বাংলার কৃষকরা নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে এবং এই নবজাগরণ একটা সুসংগঠিত সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করতে চলেছে।

ছোটলাট গ্র্যান্ট ১৮৫৯ সালের আগস্ট মাসে সরকারী পরিদর্শন উপলক্ষে স্টিমারযোগে যখন কলকাতা থেকে পাবনায় যাচ্ছিলেন, তখন স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে লক্ষ-লক্ষ কৃষক নদীর দুপাশে মাইলের-পর মাইল ধরে জমায়েত হয়ে নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছিল ও সরকারের নিকট সুবিচারের দাবি জানাচ্ছিল। এই বিরাট জন-সমাবেশের ঘটনা বর্ণনা করে গ্র্যান্ট নিজেই লিখেছিলেন:

"যাবার পথে অসংখ্য রায়ত বিভিন্ন স্থানে জমায়েত হয়ে প্রধানত দাবি জানাচ্ছিল যে সরকার হুকুম জারি করে নীলচাষ বন্ধ করে দিক। কয়েকদিন পরে আবার যখন কুমার ও কালীগঙ্গা দিয়ে ফিরছিলাম তখন এই ৬০।৭০ মাইল পথে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নদীর দুইধারে অসংখ্য জনতা জমায়েত হয়ে বিচার প্রার্থনা করছিল। এমনকি গ্রামের মেয়েরাও স্বতন্ত্রভাবে জমায়েত হয়েছিল। দুই পাশের বহুদূরের গ্রামগুলি থেকেও প্রচুর লোক এসেছিল। ১৪ ঘণ্টা ধরে অবিরাম এইরূপ জন-সমুদ্রের মধ্য দিয়ে গমন করা ও তাদের সুবিচারের দাবি শোনা আর কোনো সরকারী অফিসারের ভাগ্যে ঘটেছিল

কিম্বা আমি জানি না। তারা সকলেই সম্ভ্রমশীল সংকল্পনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার পরিচয় দিচ্ছিল। যদি কেউ ভাবেন যে সহস্র-সহস্র নর-নারী ও বালক-বালিকাদের এইরূপ মনোভাব প্রদর্শনের কোনো গভীরতর তাৎপর্য নেই তাহলে তাঁরা মারাত্মক ভুল করবেন। দেশের এক বিরাট অঞ্চলব্যাপী এই অপূর্ব জনসমাবেশ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে প্রকার সংগঠনের শক্তি এবং সংঘবদ্ধভাবে কাজ করার ক্ষমতা দেখিয়েছে তা গভীরভাবে চিন্তা করার বিষয়।" [১৮২]

বাংলার কৃষকরা এই সময় যে কিরকম দৃঢ়তার সঙ্গে ও সংঘবদ্ধভাবে একটা কৃষক-বিপ্লবের দিকে এগিয়ে চলেছিল সে সম্বন্ধে এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী শিশিরকুমার ঘোষের বর্ণনা উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন :

"নীল-বিদ্রোহের সময় প্রজারা কি সাহস, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ই দেখায়। সেবার অবিচলিত চিত্তে তাহারা কি না সহ্য করে। গোড়ই নদীর এখন অত্যন্ত দুর্দ্দশা। যখন নীলের গোলমাল হয় তখন গোড়ই পদ্মার ন্যায় বেগবতী ছিল। লেঃ গভর্ণর এই গোড়ই নদীর মধ্য দিয়া ষ্টিমার যোগে গমন করিতেছিলেন, নদীর দুই ধারে সহস্র সহস্র প্রজারা হাতে দরখাস্ত লইয়া দাঁড়াইয়া কাপ্তেনকে জাহাজ লাগাইতে বলিতে লাগিল। লেঃ গভর্ণর কোন মতে জাহাজ নদী তীরে লাগাইলেন না। শত-শত প্রজা নদীতে ঝম্প প্রদান করিল। গোড়ইর মহাবেগ লক্ষ্য করিল না। তখন তাহারা নীলের অত্যাচার হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে তাহার নিমিত্ত প্রাণসঙ্কল্প। প্রজাদিগকে নদীতে ঝম্পপ্রদান করিতে দেখিয়া লেঃ গভর্ণর জাহাজ লাগাইতে বাধ্য হইলেন। প্রজারা জাহাজ ঘিরিয়া ফেলিল এবং গ্র্যাণ্টসাহেবকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল যে তিনি তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন।" [১৮৩]

কৃষকদের সংগঠিত আন্দোলনের এরূপ চেহারা দেখে গ্র্যাণ্ট ভালভালেই বুঝতে পেরেছিলেন যে কৃষকদের এতদিনকার পুঞ্জীভূত ক্রোধ আজ ফেটে পড়বার উপক্রম হয়েছে। যদি তাদের প্রতি সুবিচারের বিলম্ব হয়, তাহলে তারা নিজেদের শক্তিতে তা আদায় করে নেবে। সুতরাং এই ব্যাপক আন্দোলনের পরিণাম চিন্তা করে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন।

গণ-দরখাস্তে যখন কোনো ফল ফলল না তখন কৃষকরা গ্রামে গ্রামে নীল-ধর্মঘট শুরু করে দিল—তারা আর কখনো নীল বুনবে না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে লাগল এবং গ্রামে গ্রামে এই ধর্মঘট কিভাবে বিস্তার লাভ করল তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

কোনো কোনো ব্যক্তির মতে বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট এসলী ইডেনের পরোয়ানাই এই আন্দোলনের কারণ। প্রকৃতপক্ষে ইডেনের পরোয়ানা এই আন্দোলন ঘটায় নি; ইডেনের পরোয়ানা এই আন্দোলনেরই ফলস্বরূপ। পাদ্রী আলেক্সাণ্ডার ডাফ্ ঠিকই বলেছিলেন যে ঐ পরোয়ানা এ ধর্মঘট ঘটায় নি; কৃষকদের মনের মধ্যে যে অসন্তোষ বছরের পর বছর ধরে জমাট হয়ে উঠেছিল, অসন্তোষের সেই বারুদস্তূপে পরোয়ানাটা স্ফুলিঙ্গের কাজ করেছিল মাত্র। [১৮৪] এসম্বন্ধে 'ক্যালকাটা রিভিউ'ও লিখেছিল (জুন, ১৮৬০) যে, "যে রায়তকে আমরা এতদিন ধরে ক্রীতদাস অথবা রুশিয়ার ভূমিদাসের মতো গণ্য করে এসেছি, যাকে আমরা কেবলমাত্র জমির একটা অংশ হিসাবেই দেখেছি···সে আজ অবশেষে জাগ্রত ও সক্রিয় হয়ে উঠেছে, সে প্রতিজ্ঞা করেছে যে সে শৃঙ্খলমুক্ত হবেই।"

আবার অনেকের মতে পাদ্রীদের উস্কানির ফলেই নাকি নীল-বিদ্রোহ ঘটেছিল। কয়েকজন নীলকর নীল-কমিশনের নিকট এইরূপ অভিযোগ করেছিল। এটা সত্য যে, লঙ, বোমভাইটস্ প্রমুখ কয়েকজন পাদ্রী নীল-চাষীদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন, অনেকে নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ করার জন্য আন্দোলন করেছিলেন ও সরকারের নিকট অনেক চিঠিপত্রও লিখেছিলেন এবং কোনো কোনো পাদ্রী নীলচাষীদের দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য সাহায্যও করেছিলেন। কিন্তু কোনো পাদ্রীই কোনোদিন একটি কৃষককেও নীল না বুনতে কিংবা বিদ্রোহ করতে বলেন নি। প্রশ্নটাকে ভালোভাবে বিচার করার পর নীল-কমিশন খুব জোরের সঙ্গেই এ-কথা বলেছিলেন।

প্রকৃত পক্ষে অন্যান্য ইংরেজদের মতো পাদ্রীদেরও বাংলার জনসাধারণ বিশেষ সুনজরে দেখত না, বরং তাদের ঘৃণাই করত। [১৮৫] তখনকার পল্লীগাথার মধ্যেই এ সত্যটি পাওয়া যায়:

"জাত মাল্লে পাদ্রী ধরে
ভাত মাল্লে নীল বাঁদরে
ব্যাড়াল চোখো হাঁদা হেমদো
নীল কুঠির নীল মেমদো।"

নীলকৃষকদের ধর্মঘট মূলত নীলকরদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সংগ্রাম। কিন্তু নীলকরদের স্বার্থরক্ষা করবার জন্য ও ধর্মঘট ভাঙবার জন্য সরকার যখন দলে দলে পুলিশ ও সৈন্য পাঠাতে শুরু করল, তখন

থেকেই এই আন্দোলন খোলাখুলিভাবে রাজনৈতিক ও বৈপ্লবিক রূপ গ্রহণ করল। পার্লামেন্টে একজন সভ্য বলেছিলেন, "As the revolt became general, not only the very existence of the planters became endangered, the ryots were threatening to withhold payment both to the government and the landlord." [১৮৬]

সরকার নীলচাষীদের অভিযোগ সত্য ও ন্যায্য বলে মেনে নিয়েছিল, কিন্তু নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ করবার জন্য সরকার কোনো চেষ্টাই করেনি। তারপর কৃষকরা যখন নিতান্ত ন্যায়সঙ্গতভাবেই প্রতিকারের জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে দাঁড়াল, তখনই আন্দোলন দমন করবার জন্য ও ব্রিটিশ পুঁজিবাদকে বাঁচাবার জন্য সরকার তার পুলিশ-বাহিনী, সেনা-বাহিনী, নৌ-বাহিনী পাঠিয়ে এই কৃষক-বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত হয়ে উঠল। নীলকররা গুণ্ডাবদমাস, জেল-ফেরত আসামী ও পদচ্যুত সৈন্য ও নাবিকদের নিয়ে যে দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল-বাহিনী গড়ে তুলেছিল তার সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য কৃষকরা প্রস্তুত হয়েছিল। এরূপ অনেক লড়াইয়ের সম্মুখীন কৃষকরা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা হেরেছে, আবার অনেক ক্ষেত্রে তারা জিতেছে। এই ব্যাপক গণ-বিদ্রোহ ইংরেজ শাসকশ্রেণীর মধ্যে কতখানি আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল তা বড়লাট লর্ড ক্যানিং-এর চিঠিতেই জানা যায়: "I assure you that for about a week it caused me more anxiety than I have had since the days of Delhi···I felt that a shot fired in anger or fear by one foolish planter might put every factory in lower Bengal in flames !" [১৮৭] এইভাবেই নীলচাষী বাঙালী জাতির গৌরবময় বৈপ্লবিক ঐতিহ্য স্থাপন করেছে। কিন্তু সরকারী ফৌজের বিরুদ্ধে এককভাবে সশস্ত্র লড়াই করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তা সত্ত্বেও পশুশক্তির নিকট তারা পরাজয় স্বীকার করে নেয় নি। তারা দলে দলে জেলে গিয়েছে, নয়তো বনেজঙ্গলে আত্মগোপন করে রয়েছে, তবু তাদের দিয়ে নীলকর ও সরকার নীলচাষ করাতে পারেনি এবং শেষ পর্যন্ত নীলকরদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে।

নীল-বিদ্রোহের আলোচনা প্রসঙ্গে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের কথাও এসে পড়ে। বাংলাদেশের উপর, বিশেষ করে নীলচাষীদের উপর যে মহাবিদ্রোহের কোনো প্রভাব পড়েছিল, একথা কোনো কোনো শিক্ষিত বাঙালী স্বীকার করতেই চান না। তাঁরা এই প্রভাবের প্রমাণ চান। তাঁরা বলেন যে

সরকারী নথিপত্রে এর কোনো উল্লেখ নেই। তাঁদের মতে নীল-আন্দোলন বাঙালীর একেবারে নিজস্ব বস্তু, এর সঙ্গে আর কারও কোনোই সম্বন্ধ ছিল না। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় যে বাঙালী শিক্ষিত শ্রেণী ইংরেজকে সমর্থন করেছিলেন অথবা নিরপেক্ষ ছিলেন, নীল-বিদ্রোহের সময় তাঁরাই হঠাৎ এই বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেদের শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিলেন—এইরকম একটা ধারণা দীর্ঘ কাল ধরে চলে আসছে।

নীল-আন্দোলনের ঠিক পূর্বেই দুবছর ধরে বাংলার দ্বারদেশে এতবড় একটা প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেল, এমনকি বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও যে-বিদ্রোহ তার সুস্পষ্ট ছাপ রেখে গিয়েছে (বহরমপুর ও বারাকপুরের বিদ্রোহের কথা ছেড়ে দিলেও, চট্টগ্রামের সিপাহীরা বিদ্রোহ করে কুমিল্লা, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, কাছাড়ে অসংখ্য গ্রামের সহস্র সহস্র গ্রামবাসীদের সংস্পর্শে এসেছিল, অনেক স্থানে লড়াই করেছিল, তারপর ঢাকায় বিদ্রোহ হল, সেখানে প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর উত্তর বঙ্গের শত শত গ্রাম অতিক্রম করে বিদ্রোহীরা বিহারে চলে গেল) বাংলার কৃষকদের উপর সেই বিদ্রোহের, এইসব বৈপ্লবিক ঘটনার কোনো প্রভাবই পড়ল না একথাটা যদি মেনে নিতে হয়, তাহলে এটা স্বীকার করতে হয় যে বাংলার কৃষকরা ছিল চেতনাহীন জড়পিণ্ড বিশেষ।

কিন্তু শিক্ষাভিমানীরা যাই ভাবুন না কেন, বাংলার কৃষক ও জনসাধারণ যে মানুষই ছিল, এবং মানুষের মতোই তাদের উপর ঘটনাবলীর ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া হত, এমনকি সরকারী নথিপত্রেও তার ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব নেই। ১৮৫৭-এর ফেব্রুয়ারী মাসে, মিরাট-দিল্লী বিদ্রোহের তিন মাস পূর্বে, যখন বহরমপুরের সিপাহীরা টোটা ব্যবহার করতে অস্বীকার করে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল, তখন মুর্শিদাবাদের সহস্র সহস্র লোক বিদ্রোহের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছিল। অন্য কোনো নেতৃত্বের অভাবে জনসাধারণ নির্দেশের জন্য তাকিয়ে ছিল পুরনো স্বাধীন বাংলার নবাবের বংশধর নবাব ফেরেদুন খাঁ'র মুখের দিকে। ঐতিহাসিক কেই এ-সম্বন্ধে লিখেছেন: "There were thousands in the city who would have risen at the signal of one who, weak himself, was yet strong in the prestige of a great name." [১৮৮] কেই আবার বলছেন যে, "এই কথাটা বোঝা মোটেই কঠিন নয় যে, যদি বহরমপুরের সিপাহীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করত ও মুর্শিদাবাদের

জনসাধারণ যদি নবাবকে সামনে রেখে তাদের সঙ্গে হাত মেলাত, তাহলে সমগ্র বাংলাদেশে দেখতে দেখতে আগুন জ্বলে উঠত।"

১৮৫৭ সালে জুন মাসে বিদ্রোহের আশংকা করে কলকাতার ইংরেজ, ফিরিঙ্গী ও দেশীয় খ্রীষ্টানরা যেরকম নির্লজ্জ ও কাপুরুষোচিতভাবে চতুর্দিকে পলায়ন করতে শুরু করেছিল সে সম্বন্ধে অনেক মিউটিনি সাহিত্যেই অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। কলকাতার জনসাধারণের একটা অংশ যে সবসময়ই বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত ছিল, তার সন্ধান ইংরেজাশ্রিত শিক্ষিতেরা না রাখলেও ইংরেজ সরকার তা ভালোভাবেই জানত। গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের সভ্য পিটার গ্র্যাণ্ট (যিনি কিছুকাল পরেই বাংলার ছোটলাট হয়েছিলেন) বড়লাট ক্যানিংকে লিখেছিলেন যে, "এই মহানগরীর সর্বশ্রেণীর বদমাশরা" ভয়ানক ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ; "বিদ্রোহ দ্রুত বিস্তার লাভ করছে এবং ক্রমশই আমাদের কাছে এসে যাচ্ছে।...আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রাস্তার একটা সামান্য গণ্ডগোলের ফলেও এই রাজধানীতে একটা হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে যেতে পারে। শুধু বাংলাতেই নয়, বোম্বাই ও মাদ্রাজেও এরূপ ঘটনার সম্ভাবনা আছে।" [১৮৯]

নতুন দমনমূলক প্রেস আইনের জোরে সরকার জুলাই মাসে কলকাতার 'সমাচার দর্পণ', 'দূরবীণ', 'সুলতান-উল-আকবর' সংবাদপত্রগুলির মুদ্রাকর ও প্রকাশকদের রাজদ্রোহ প্রচারের অপরাধে সুপ্রিমকোর্টে অভিযুক্ত করল এবং 'গুলশান-ই-নও বাহার' ও আরও কয়েকখানা সংবাদপত্র বাজেয়াপ্ত করল ও তার কিছুকাল পরেই 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' বন্ধ করে দিল।

এই সময়কার বাংলাদেশের অবস্থা আলোচনা করে বাকল্যাণ্ড বলেছেন : "বাংলা সরকারের অধীনে এমন একটা জেলা ছিল না যেটা প্রত্যক্ষ বিপদের মধ্যে দিয়ে যায় নি, কিংবা ঘোরতর বিপদের আশংকা করে নি।"[১৯০] নদীয়া, যশোহর, চব্বিশ-পরগনা, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম ও অন্যান্য জেলাগুলিতে জনসাধারণ যে খুবই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল সে-সম্পর্কে ও'ম্যালীর 'বেঙ্গল ডিস্টিক্ট্ গেজেটিয়ার'-গুলিতে অনেক উল্লেখ রয়েছে। বহরমপুরের বিদ্রোহের খবর ছড়িয়ে পড়া মাত্রই একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়া কৃষ্ণনগর, যশোহর ও সমগ্র ডিভিসনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। [১৯১] বাঁকুড়া জেলার সাঁওতাল ও চুয়ারদের মধ্যে যেকোনো সময় বিদ্রোহের সম্ভাবনা ছিল বলে কর্তৃপক্ষ আশংকা করছিল। [১৯২] "১৮৫৭-এ সিপাহী বিদ্রোহের সময় বর্দ্ধমানের মহারাজা

তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে সরকারের শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন। তিনি সরকারকে প্রচুর হাতী ও গরুর গাড়ী দিয়েছিলেন এবং বর্দ্ধমান থেকে কাটোয়া এবং বর্দ্ধমান থেকে বীরভূম পর্য্যন্ত সব রাস্তাঘাটগুলি আমাদের জন্য নিরাপদ রেখেছিলেন, যার ফলে রাজধানীর সঙ্গে বহরমপুর ও বীরভূম প্রভৃতি উত্তেজিত অঞ্চলগুলির যোগাযোগ ও খবরাখবর রাখতে ব্যাঘাত ঘটেনি।" [১৯৩] ১৮৫৭ এর ২রা আগস্টের রিপোর্টে বড়লাটের কাউন্সিল বিলাতের কর্তৃপক্ষকে লিখেছিল, "The peace of the lower provinces along the valley of the Ganges from Berhampur to Benares and in the neighbourhood of the Grand Trunk Road south of Benares was seriously threatened and the chief sources of revenue in Bengal were also in jeopardy ." [১৯৪]

একথাটাও জানা প্রয়োজন যে মহাবিদ্রোহের সময় বাংলাদেশ থেকে রসদ ও যানবাহন সংগ্রহ করা সরকারের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল। বাংলার কৃষকরা এই ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে নি ; সরকারের সঙ্গে তারা একরকম অসহযোগিতাই করেছিল। জোর করে কৃষকদের কাছ থেকে যানবাহন সংগ্রহ করার জন্য সরকারকে একটা Impressment Act পাশ করতে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তখনকার বাঙালী পরিচালিত 'Indian Field' পত্রিকা যা লিখেছিল তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এই সময় নর্টন 'মাদ্রাজ এথেনিয়াম' পত্রিকায় ও তাঁর পুস্তকে 'Topics For Indian Statesman'-এ বাঙালীদের গালাগালি করে বলেছিলেন যে তাদের রাজভক্তি কেবলমাত্র মৌখিক ; প্রকৃতপক্ষে তারা ইংরেজ-বিরোধী। তার জবাবেই 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড'-এর (১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৯) এই উক্তি :

"মিঃ নর্টন বাঙালীদের নিন্দা করে খুব অন্যায় করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'এখানে সেখানে দু-একজন বাঙালী-নেটিভকে দেখা যায় যারা আমাদের প্রতি মৌখিক সহানুভূতি জানাচ্ছে, কিন্তু আমাদের এই ভয়ানক বিপদের সময় তাদের কেউ কি ব্যক্তিগতভাবে কিংবা তাদের অর্থ দিয়ে আমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছে ?.........তারা বিপদের ধারে-কাছ দিয়েও যায় নি ; তারা কোনোরকম কাজে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে নি ; তারা বিনা ইমপ্রেসমেণ্ট আইনে আমাদের কোনো গরুর গাড়ি ইত্যাদি দেয়নি। তারপর দিল্লির পতনের পর রাজভক্তি প্রকাশ করাটা মন্দ চালাকি নয় ; আর তার

ভাষাই বা কি রসাল! কিন্তু সত্য ঘটনা হচ্ছে এই যে, এই সব বিবৃতি ও মানপত্রগুলি হচ্ছে নিছক ভণ্ডামি মাত্র।.........মিঃ নর্টনের এই ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত। মিঃ নর্টন যদি ইম্‌প্রেসমেণ্ট আইনের জোরে বাংলার কোনো গ্রামে যেতেন, তাহলে নিশ্চয়ই দু-একটা ভাঙ্গা গাড়ি ও কানা বলদ যোগাড় করতে পারতেন, কিন্তু কাজে লাগতে পারে এমন একটাও গাড়ি কিংবা বলদ পেতেন না। এইরূপ অবস্থা বুঝতে পেরে সরকার আর ইম্‌প্রেসমেণ্ট আইন ব্যবহার করেন নি। সরকার জমিদারদের কাছে আবেদন করলেন এবং জমিদাররা রাজভক্ত প্রজার মতো সরকারকে সাহায্য করতে লাগলেন। তাঁরা গাড়ি ও গরুর মালিকদের টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন, তাদের পরিবারদের রক্ষা করবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, তাদের অগ্রিম টাকা দিলেন এবং আরও এমন অনেক রকমের প্রতিশ্রুতি দিলেন যা একমাত্র জমিদাররাই দিতে পারেন। এর ফল হল এই যে, অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই রানীগঞ্জে ৭,০০০ গাড়ি জমায়েত হল। কলকাতার যে ইংরেজরা এত বড় বড় কথা বলছে, তারা কি একটাও ঘোড়া কিংবা গাড়ি দিয়েছিল? দিয়েছিল বলে আমরা তো কোনোদিন শুনি নি।.........বাংলার জমিদাররা তাঁদের প্রত্যেকটি হাতি সরকারকে বিনা খরচায় ছেড়ে দিয়েছিল। আমরা এমন উদাহরণও জানি যে ইংরেজরা তাদের হাতি দিতে অস্বীকার করেছিল। প্রত্যেকেই জানেন যে, ঢাকায় যখন বিদ্রোহ হয় তখন জমিদাররা কিভাবে লোকজন নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটদের সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন।......তাঁদের ক্ষমতা অনুসারে তাঁরা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে সরকারকে সাহায্য করেছিলেন।"

উপরের উদ্ধৃতি থেকে দুটো জিনিস স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, মহাবিদ্রোহের সময় বাঙালী জমিদাররা ছিলেন বিদেশী সরকারের পক্ষে, আর অন্যদিকে কৃষকদের সহানুভূতি ছিল বিদ্রোহীদের পক্ষে।

সতীশচন্দ্র মিত্রের 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' থেকে যে উদ্ধৃতি পূর্বেই একবার দেওয়া হয়েছে, এই প্রসঙ্গে তার পুনরাবৃত্তি একেবারেই অসংগত হবে না। এতে লেখা হয়েছে যে, সিপাহী-বিদ্রোহের সময় "নানা সাহেব ও তাঁতীয়া তোপীর নাম দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; নীল-বিদ্রোহী কৃষকরাও তাহাদিগের নেতাদিগকে এই সব নামে অভিহিত করিত।" নীলচাষীদের উপর মহাবিদ্রোহের প্রভাব যে পড়েছিল, এর চাইতে তার বেশি পরিচয় আর কি হতে পারে?

নীল-বিদ্রোহ একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এ-বিদ্রোহ ১৮৫৭-র ভারতব্যাপী মহাবিদ্রোহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। নীল-বিদ্রোহের উপর মহাবিদ্রোহের প্রভাবও সুস্পষ্ট। মহাবিদ্রোহের সময় বাংলার অনেক জমিদার ও শিক্ষিত শ্রেণীর একটা অংশ নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে তথা শ্রেণীস্বার্থে (কোনো আদর্শের জন্য নয়) ইংরেজ সরকারকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু তারাই তখনকার বাংলার একমাত্র প্রতিনিধি নয় বা তারাই বাংলার একমাত্র ঐতিহ্যও নয়। বাংলার কৃষক ও জনসাধারণের মধ্যে তখন বিদেশী সরকার সম্বন্ধে অসন্তোষ ও বিরোধী মনোভাবের মোটেই অভাব ছিল না। ফরিদপুরের দাদু মিঞার মতো কৃষক ও জনসাধারণের অনেক নেতাকে বিদ্রোহের সময় জেলে আটক রাখা হয়েছিল। সরকার, মহাজন, জমিদার, নীলকরদের অত্যাচারে বাঙালী জনসাধারণের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। অন্য প্রদেশের মতো বাংলাতেও জাতীয় বিদ্রোহের অনেক উপকরণই জমা হয়েছিল এবং তাতে সিপাহী ও কৃষকের একটা সম্মিলিত বিদ্রোহ সংগঠিত করা বাংলাদেশে কঠিন কাজ হত না। ইউরোপে একটা প্রবাদবাক্য আছে যে, সৎ কাজের আরম্ভটাই খুব শক্ত। একথা বোধ হয় বলা যেতে পারে যে, ১৮৫৭ সালে বাংলায় এই আরম্ভের কাজটা সফলভাবে হয় নি বলেই এখানে ব্যাপক বিদ্রোহ ঘটে নি।

দুঃখের বিষয় সম্প্রতিকালের কয়েকজন বাঙালী লেখক মহাবিদ্রোহ ও নীল-বিদ্রোহের চরিত্র সম্বন্ধে এমন সব ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা কোনোক্রমেই সমর্থন-যোগ্য নয়। এঁদের মতে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর বাঙালীরা সিপাহী-বিদ্রোহ (তাঁরা এটাকে 'জাতীয়' বিদ্রোহ বলতেও দ্বিধা বোধ করেন) সমর্থন করেন নি, কেননা তাঁদের মতে এ বিদ্রোহ ছিল প্রগতি-বিরোধী, ধর্মান্ধ, মধ্যযুগীয়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইত্যাদি। অথচ তাঁরাই আবার নীল-বিদ্রোহ উপলক্ষে মধ্যবিত্ত বাঙালীর সমর্থনের কথা উচ্ছ্বসিত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

এঁরা বলেন যে নীল-বিদ্রোহে "হতভাগ্য প্রজাদের প্রতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা পূর্ণ সমর্থন জানাতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠাবোধ করেন নি। অথচ এ হেন রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর লোকেরা সিপাহী-বিদ্রোহ সমর্থন করল না, কারণ এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে সেদিন তারা জাতির কল্যাণ দেখতে পাননি। সিপাহী-বিদ্রোহের স্বরূপ তাদের দৃষ্টিতে

প্রগতি-বিরোধী প্রতিক্রিয়া বলে মনে হওয়াতেই তারা এর সমর্থনের পরিবর্তে বরং বিরোধিতাই করেছিল। তাদের বিরোধিতার কারণ তাদের রাজনৈতিক চেতনার বা স্বদেশ-বাৎসল্যের অভাব নয়—১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের প্রকৃতিতে প্রগতিবাদের অভাব।" [১৯৫]

১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহ প্রগতি-বিরোধী ছিল, এর মতো প্রগতি-বিরোধী কথা আর কি হতে পারে? (এ প্রসঙ্গে মার্কসের 'First War of Indian Independence' ও লেখকের 'ভারতীয় মহাবিদ্রোহ: ১৮৫৭,' দ্রষ্টব্য)

আর একজন লেখক বলেছেন: "সিপাহী-বিদ্রোহ সম্বন্ধে বিশেষ করে বাঙালীদের উৎসাহিত ও আশান্বিত হবার কোন কারণ ছিল না।...হিন্দুস্থানী ও রাজপুত সিপাহীদের ব্রাহ্মণত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্বের বর্ম ভেদ করে বাঙালীরা যদি সেদিন তাদের মর্মস্থলে স্বদেশপ্রেমের হোমাগ্নির কোন সন্ধান না পেয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য তাদের খুব দোষ দেওয়া যায় না।" এ ভাষা মোটেই স্বদেশপ্রেমের ভাষা নয়, প্রগতি-বিরোধী, অত্যুগ্র প্রাদেশিকতাবাদী উন্নাসিকের ভাষা। তাছাড়া এখানে আরও একটা প্রশ্ন ওঠে, বিদ্রোহ করার সপক্ষে ১৮৫৭-তে বাঙালীর নিজস্ব কোনো কারণ ছিল না কি?

ভারতীয় মহাবিদ্রোহ সম্বন্ধে এই লেখক যে-সব তথ্য দিয়েছেন তাও ঠিক নয়। তিনি লিখেছেন যে, "বাংলার সিপাহী-বাহিনীতে বঙ্গ-সন্তান ছিল না, কৃষক-সন্তান তো নয়ই (!)। অবাঙালী যারা ছিল, তাদের মধ্যেও উচ্চবর্ণের গোঁড়া হিন্দু ছিল বেশী।...বাংলার ওয়াহবী-বিদ্রোহ (এরা কি গোঁড়া ছিল না?) বা নীল-বিদ্রোহের সঙ্গে তার তুলনা হয় না, কারণ এগুলি হল বাংলার কৃষক-বিদ্রোহের সমসাময়িক রূপ। বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা তা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছেন, 'ইংরেজ-ভক্ত' হয়েও।" [১৯৬]

এই ধরনের বিশ্লেষণ বাস্তবানুগ তো নয়ই, উপরন্তু এর মধ্যে অত্যন্ত সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও জাতিদম্ভের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, এমনকি যথার্থ প্রগতিশীল চিন্তাবিদদের মধ্যেও মহাবিদ্রোহ সম্বন্ধে রীতিমতো বিভ্রান্তি দেখা যায়। [১৯৭]

আসলে ১৮৫৭-এ শিক্ষিত বাঙালীর দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল এবং তারই বিবেক-দংশনের জ্বালায় এই শ্রেণীর লেখকরা নানা প্রকারের উদ্ভট যুক্তি

দিয়ে এই দুর্বলতাটাকে ঢাকবার চেষ্টা করছেন। নীল-বিদ্রোহকে বড় করে দেখাবার জন্যে মহাবিদ্রোহকে ছোট করার এই প্রচেষ্টা শুধু বালখিল্যসুলভই নয়, ইতিহাস-বিরুদ্ধও বটে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন। পরবর্তীকালে স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাঙালী শিক্ষিতদের অবদান অনস্বীকার্য, কিন্তু আমরা যে কাল সম্বন্ধে আলোচনা করছি সেইকালে অন্যান্য সকল ভারতীয় শিক্ষিতদের মতো বাঙালী শিক্ষিতরাও ইংরেজ-শাসকশ্রেণীর প্রগতিশীলতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। ইংরেজ শাসনাধীনে, বিশেষ করে নতুন শিক্ষা-নীতি এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় (অবাধ বাণিজ্য, নীলচাষ ইত্যাদি) দেশের উন্নতি হবে এই ধারণা বহুদিন শিক্ষিত বাঙালীর মনে বদ্ধমূল হয়ে ছিল। 'ব্লাক অ্যাক্ট' আন্দোলন এই ধারণার উপর প্রথম বড় আঘাত। তারপর থেকে বাঙালী শিক্ষিতদের ধীরে ধীরে মোহভঙ্গের পালা শুরু হয়। ইংরেজের অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে তাঁদের মুখ ফুটল, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে তাঁরা পা বাড়ালেন; কিন্তু তার পরেও জনসাধারণের ভূমিকাকে দীর্ঘকাল ধরে উপেক্ষা করে চলেছিলেন।

এই সমস্ত সংকীর্ণ ও একপেশে দৃষ্টিভঙ্গির উত্তরে অধ্যাপক সুশোভন সরকারের জবাবটি প্রণিধানযোগ্য : "ইংরেজ মধ্যশ্রেণীর অভিজ্ঞতাটুকু আয়ত্ত করে দেশের জন্য তাঁরা অগ্রগতির একটা নিয়মতান্ত্রিক, উদারনৈতিক, অনুগ্র, ভদ্র পথের ছক কেটে ছিলেন। কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করা যায় না যে উনিশ শতকে বিদেশী শাসন তাঁদের কাছে অসহ্য মনে হতেছিল, অথবা ব্রিটিশ শোষণের পূর্ণ ভয়াবহ রূপটি তাঁদের মনে উদ্ভাসিত হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের আসল মূল্য দিতে হত দেশের সাধারণ লোককে। আধা-ফিউডালি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে আমাদের বুর্জোয়ারা কিছু অপছন্দ করেন নি। দেশের নবজীবন থেকে শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেন, একথাও বলা চলে। মহা বিদ্রোহের করাল রূপে তাঁদের আতঙ্ক পাবারই কথা, সেজন্য দোষ দেওয়া অন্যায়। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা আজও আশ্রয় করে থাকব এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।" [১৯৮]

সাধারণভাবে একথা বলা যেতে পারে যে, শিক্ষিত বাঙালীরা, অন্য সকল বাঙালীর মতো মোটামুটিভাবে নীলচাষীদের সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছিল। কিন্তু তাই বলে শিক্ষিতরা হঠাৎ তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা

ভীষণ কিছু করে ফেলল—এইসব অত্যুক্তির কোনো প্রয়োজন নেই। একথাও স্মরণ রাখা ভালো যে শিক্ষিতদের সহানুভূতিটা ছিল বিশেষভাবে মৌখিক। কার্যক্ষেত্রে তা বিশেষ কোনো রূপ নেয় নি।

হরিশচন্দ্র, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, শিশিরকুমার প্রমুখের ও তৎকালীন বাঙালী-পরিচালিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'ভাস্কর', 'প্রভাকর', 'সোমপ্রকাশ', 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' ইত্যাদি সংবাদপত্রগুলির নীলকৃষকদের সমর্থনে ও নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গৌরবময় সংগ্রাম সব বাঙালীই গর্বের সঙ্গে স্মরণ করবে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও প্রশ্ন থেকে যায়, কলকাতা ও মফস্বল শহরগুলির শিক্ষিতেরা এই সংগ্রামে সংঘবদ্ধভাবে কতটুকু অংশগ্রহণ করেছিলেন? যখন নীলকর ও সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকরা ধর্মঘট করে হাজারে হাজারে জেলে যাচ্ছিল, তখন তাদের সাহায্যার্থে মাত্র দু-একজন মোক্তার কলকাতা থেকে গিয়েছিলেন। এই কারণে কৃষ্ণনগরে একজন মোক্তারের ৬ মাস কারাদণ্ড হবার পর আর কোনো উকিল-মোক্তার কৃষকদের সমর্থনে অগ্রসর হন নি। শহরবাসী শিক্ষিতরা কোথাও সভাসমিতি করে বা অন্য উপায়ে কৃষকদের সমর্থন করেছেন কিংবা অর্থ সংগ্রহ করে তাদের সাহায্য করেছেন বলে জানা যায় না। তখনকার বাঙালী শিক্ষিতদের একমাত্র সংগঠন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনও এতে বিশেষ কোনো সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নি। হরিশচন্দ্র 'হিন্দু পেট্রিয়টের' জন্য নিয়মিত সংবাদদাতারূপে মফস্বলের বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে পান নি, তাই তাঁকে বালক শিশিরকুমার ও মনোমোহনকে ঐ কাজে নিযুক্ত করতে হয়েছিল। পাষণ্ড নীলকর আর্চিবল্ড হীলস্ যখন হরিশ-চন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর অসহায় ও নিঃসম্বল বিধবার বিরুদ্ধে মামলা এনেছিল, তখন তাঁকে রক্ষা করার জন্য শিক্ষিত বাঙালীরা তাঁর পাশে এসে দাঁড়ায় নি। শিক্ষিতদের সহানুভূতি মৌখিকই থেকে গিয়েছিল, কোনো বাস্তব আকার ধারণ করে নি। তাই, যাঁরা বজরায় চড়ে নীলচাষীদের লড়াই দেখতে যেতেন, কলকাতার সেই 'বাবুভেয়েদের' উপলক্ষ করে বাংলায় কৃষকরা বিদ্রূপ করে গান করত।

মহাবিদ্রোহ ও নীল-বিদ্রোহ—এই দুই বিষয়ের আলোচনা কালে একটি মৌলিক কথা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রচেষ্টা বা নীল-বিদ্রোহের সঙ্গে সিপাহীযুদ্ধের পার্থক্য মূলগত। প্রথম দুটি আন্দোলন চলেছিল গভর্নমেণ্টের নিকট ন্যায় বিচার পাওয়া যাবে এই আশায়ই

এদের পরিচালকগণ সকল কাজ নিয়ন্ত্রিত করেছেন। কিন্তু সিপাহীযুদ্ধের প্রকৃতি হল ভিন্ন রূপ। এ বিদ্রোহ একেবারে ইংরেজের কর্তৃত্ব অস্বীকার, আর ইংরাজ শাসনের ভিত্তিমূলে প্রবলভাবে ধাক্কা দিল।" [১৯৯] আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে নীল-আন্দোলন শুরু হয় নীলকরদেয় শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটা অর্থনৈতিক আন্দোলন হিসাবে, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে নয়। আমরা এও দেখেছি যে নীল-আন্দোলন তার গণচরিত্র ও সংগ্রামশীলতার জন্য অচিরেই সরকার-বিরোধী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে একটা বৈপ্লবিক আকার ধারণ করেছিল।

১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের সময় সমস্ত বিদ্রোহী অঞ্চলে ব্যাপক নীল-বিদ্রোহও ঘটেছিল। সর্বত্রই ইংরেজদের নীলকুঠিগুলি বিদ্রোহীদের আক্রমণের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। এসম্বন্ধে অধ্যাপক শশিভূষণ চৌধুরী তাঁর "Civil Rebellion in the Indian Mutinies 1857-59" গ্রন্থে অনেক সরকারী রিপোর্ট থেকে প্রচুর তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। আলিগড় জেলায় ৩টি নীলকুঠি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল ও সমস্ত নথিপত্র ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল। [২০০] রোহিলখণ্ডে বাদায়ুন জেলায় "ঐশ্বর্যশালী নীলকুঠিগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের বড় বড় লোহার কড়াইগুলি গলিয়ে বন্দুক কামানের জন্য গোলাগুলী তৈরী করা হয়েছিল।" [২০১] আজমগড় জেলাতেও কোনো নীলকুঠি অক্ষত ছিল না। [২০২] ১৮৫৭-এর জুন মাসে মির্জাপুর জেলার জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট মুর বিদ্রোহী নেতা উদ্ধাস্ত সিংকে ফাঁসি দিয়েছিল। ঝরিয়া সিং নামক আর একজন নেতা কয়েকজন বিদ্রোহী নিয়ে মুরকে আক্রমণ করলে সে পলায়ন করে নীলকুঠিতে আশ্রয় নিয়েছিল। বিদ্রোহীরা ঐ নীলকুঠি ধ্বংস করে দেয় ও মুরের মাথাটা কেটে নিয়ে উদ্ধাস্ত সিং -এর স্ত্রীকে উপহার দেয়। [২০৩] সাহাবাদ-বিদ্রোহের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ইউরোপীয়দের সমস্ত কুঠি ও সম্পত্তি ধ্বংস করা—কুনওয়ার সিং তাই হুকুম দিয়েছিলেন। নীলকররা ৭ লক্ষ টাকা খরচ করে যে ফসল তৈরি করেছিল তা কাটবার সময় এসে গিয়েছিল, কিন্তু এ সব ছেড়ে প্রাণ নিয়ে তাদের পালাতে হয়েছিল। তাদের কুঠিগুলিতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সবসুদ্ধ নীলকরদের ক্ষতি হয়েছিল ১৩ লক্ষ টাকা। [২০৪] সোন নদীর ধারে যতগুলি নীলকুঠি ও ইংরেজ ব্যবসাদারদের প্রতিষ্ঠান ছিল তা সবই ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়েছিল। [২০৫] এই সব অঞ্চলে বিদ্রোহের পর যাতে নীল-

গাছের বীজগুলি পুনরুদ্ধার করা যায় তার জন্য সরকারকে বিশেষভাবে ঘোষণাপত্র প্রচার করতে হয়েছিল। [২০৬] কৃষকদের ক্রোধ কেবলমাত্র নীলকরদের উপরই ছিল না, নীলচাষ যাতে আর একেবারেই না হতে পারে তার জন্য তারা বীজগুলি পর্যন্ত ধ্বংস করে দিয়েছিল। পালামৌতেও যে কফি ও নীলের কুঠিগুলিকে তারা বিদেশীদের শোষণযন্ত্র হিসাবে দেখত, সেগুলি সমূলে ধ্বংস করেছিল। [২০৭]

বাংলাদেশে ১৮৫৭-তে বিদ্রোহ ঘটলে কি হত সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে যে, নীলচাষীদের মধ্যে অসন্তোষ ও অত্যাচার তো সব সময়ই ছিল, তাহলে অন্য সময় না হয়ে ১৮৫৯-৬০ সালে তাদের বিদ্রোহ ঘটল কেন? এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে সাঁওতাল-বিদ্রোহ ও বিশেষ করে মহাবিদ্রোহের ফলে জনসাধারণের মধ্যে একটা অপূর্ব নবচেতনার সৃষ্টি হয়েছিল। ইংরেজ রাজশক্তি যত প্রবলই হোক না কেন, তার বিরুদ্ধেও যে বিদ্রোহ করা যায়, অস্ত্র ধারণ করে তাকে চালেঞ্জ করা যায় এবং ইংরেজ সেনাবাহিনী যে অপরাজেয় নয়—বাঙালীর, ভারতবাসীর এই বৈপ্লবিক চেতনা প্রধানত মহাবিদ্রোহেরই ফল। শিবনাথ শাস্ত্রীর কথায় বলতে হয়, "সিপাহী-বিদ্রোহের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গদেশের ও সমাজের এক মহোপকার সাধিত হইল; এক নবশক্তির সূচনা হইল, এক নব আকাঙ্ক্ষা জাতীয় জীবনে জাগিল।...বলিতে কি ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ পর্য্যন্ত এই কাল বঙ্গসমাজের পক্ষে মহেন্দ্রক্ষণ বলিলে হয়।" [২০৮] এই নবচেতনা বাংলার রাজনীতিতে, সাহিত্যে, রঙ্গমঞ্চে, ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারে—সব ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়েছিল।

এই নবচেতনার ফলে গ্রামের লাঞ্ছিত অত্যাচারিত সকল শ্রেণীর মধ্যে এক সংগ্রামী ঐক্য গড়ে উঠেছিল, তাই কৃষকরা বিদেশী অত্যাচারী নীলকর ও সরকারের বিরুদ্ধে এককভাবে লড়াইতে অবতীর্ণ হতে সাহস করেছিল। এই বিদ্রোহে বাঙালী কৃষকরা যে বৈপ্লবিক উদ্যোগ, দুর্জয় সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিল, সে সম্বন্ধে অধ্যাপক হীরেন মুখার্জী বহুদিন পূর্বে সর্বপ্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি নীল-বিদ্রোহের প্রধান তাৎপর্যের বিষয়ে বলেছিলেন যে, "Bengal's working peasants showed determination, class solidarity and powers of organisation in a measure which can not fail to infuse hope and confidence in those who are, even

in these eventful days, still sceptical of the revolutionary potentialities of our masses।" (২০৯)

জনসাধারণের অন্তর্নিহিত অসাধারণ ও অপরাজেয় বৈপ্লবিক শক্তি—এটাই হল নীল-বিদ্রোহের অমর বাণী। এই কারণেই বাংলার নীল-বিদ্রোহ, ভারতীয় মহাবিদ্রোহের মতো, সংগ্রামশীল জনতাকে চিরকালের জন্য প্রেরণা যোগাবে।

নির্দেশিকা

(১) 'Ain-i-Akbari' : Jarret, Vol. II. P. 181, 241.

(২) Bernier's Travels (Bangabasi), P. 275.

(৩) 'Biographical Sketches of the First Indigo Planters in India'—by H. J. Rainey in 'Asian,' 188 March, 1979.

(৪) 'Reports and Documents connected with the Proceedings of the East India Company in regard to the Culture and Manufacture of Cotton, Raw Silk and Indigo in India,' London, 1836, pp 4-6.

(৫) "We fell with reluctance, that an article which, considered in a political point of view, has every claim to our attention, as having a tendency to render the Company's possessions in Bengal more valuable by creating from the soil and labour of the natives an export commerce, capable of being carried to a very great extent, in supplying an article so necessary to its manufactures and for which large sums are annually paid to foreigners, should be wholly abandoned, after the very heavy expenses that have been incurred, in bringing it to the degree of perfection at which it is now arrived.........We conceive that it (indigo) will afford the Company's servants a legal, ample and we hope, advantageous mode of remitting their fortunes to Europe." ঐ, পৃ: ৯-১০

(৬) ঐ, পৃ: ২৭, ৪২, ৫০।

(৭) In a letter dated 28th Aug. 1800, the Court of Directors worte to the Governor-General : "In whatever degree, also, the indigo trade of Oude is carried on by the capital of Bengal,........so far the Government of Bengal acquires an additional right of interference in this trade. If these observations are just with respect to Oude, they will apply with still greater force to countries beyond it, not at all connected with us ; whence, however, we are told, not only that much of

the indigo exported by Oude comes, but that the profits on indigo raised in those countries have furnished the funds for paying formidable military levies made in them." (ঐ, পৃ: ৫৬)

(৮) ঐ, পৃ: ৬০।

(৯) ঐ, পৃ: ৬৪।

(১০) ঐ, পৃ: ৭৬-৭৭।

(১১) ঐ, পৃ: ৬৯। তখনকার একটি বাংলা সংবাদপত্রে দেখা যায়—"২৩শে মে, ১৮১৮—অনুমান হয় হিন্দুস্থানের প্রতি বর্ষ ৯০ হাজার মণ নীল উৎপন্ন হয়। যদি ফি মণ দেড় শত টাকা হয় তবে বছরে এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয়। সকল নীল ইংলণ্ডে যাইয়া সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়।" লেখক আরও বলেন যে, যে সব দ্রব্য ভারত থেকে রপ্তানি হয় তার মধ্যে নীলই প্রধান। ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ১ম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, পৃ: ১৫৩)।

(১২) Haran Chandra Chakladar: 'Fifty Years Ago: The woes of a class of Bengal Peasantry under European Indigo-Planters', *Dawn Magazine*, July 1905.

(১৩) 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস'—সতীশচন্দ্র মিত্র, ১৩২৯, পৃ: ৭৬১।

(১৪) "Many a factory could tell a tale of disasters encountered and as speedily revenged :....of long and obstinate struggles in which the Native yielded only to the concentrated and persevering energy of the European with ample resources. Many a planter had his days of darkness and gloom followed by unexpected gleams of sunshine His Hyder or Tipu to combat for a series of years : his desultary warfare against middle men as troublesome as Scindia overthrown by an effort not much inferior to Lasswari."

"We beg to assure our readers that out of some fifty and more concerns, in several districts of lower Bengal, we have been unable, after considerable research, to find a single one about which, *at some time in the last 30 or 40 years*, affrays have not taken place, attended either with homcide or with severe wounding. Old men still live who can recall the time when the struggle commenced :....when the annals of the Fouzdari Courts were literally written in blood, and the establishment of a new Factory was another

word for a case of affray :....in case of every single factory the Lathial system was brought into play. It is not however to be imagined that the planter himself ever headed his forces in a fair stand-up fight.....The preparations and the engagement itself, were generally left to the head native agent of the concern." ('Planters Some 30 Years Ago' in *Calcutta Review*, 1848.)

(১৫) 'সমাচার দর্পণ', ১৮ই মে, ১৮২২ (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৮)

(১৬) Buckland : Bengal under the Lieutenant Governors 1902. Vol. II. P. 238.

(১৭) Buckland ; II. pp. 238-39. কোম্পানি সরকারের নীল-চাষীদের জন্য এত মাথা-ব্যথার কারণ তাদের চাষীদের প্রতি দরদের জন্য নয়। তার প্রধান কারণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিপজ্জনক অবস্থা। টিপুসুলতান, মারাঠা শক্তি ও ফরাসীরা তখনও ভারতে ব্রিটিশের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। তার পরেই এল নেপোলিয়নের যুগ, সে-যুগে শুধু ইংল্যাণ্ডেরই নয়, সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবস্থা হয়ে উঠেছিল টলটলায়মান। তাই ইংরেজ শাসকরা ভারতে একটু সংযত হয়ে চলবার চেষ্টা করেছিলেন। নেপোলিয়নের পতনের পর নীলকরদের অত্যাচার আবার পুরো মাত্রায় চলতে শুরু করে।

(১৮) ঐ, পৃঃ ২৪২।

(১৯) ঐ, পৃঃ ২৪২।

(২০) এই পত্রিকাখানি দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু এই চিঠির ইংরেজী অনুবাদ ১৮৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডন এশিয়াটিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় তাঁর 'জাতি-বৈর' (পৃঃ ৯৩) পুস্তকে তুলে দিয়েছেন। যোগেশবাবুরই বই থেকে সেই চিঠিখানা এখানে দেওয়া হল।

"Some months ago a new law was promulgated respecting the cultivation of indigo, in which various enactments were made regarding the cultivators of the soil. The injustice which was resulted therefrom has not indeed been made public by them, for although the agriculturists suffer a variety of oppressions

from the planters, they have entered into no disputes on the subject. To dispute with the planters involves, first, the risk of life, and secondly, a most heavy expense; and they are so poor as to be unable to provide even for their own exigencies! Hence they are necessarily indisposed to contention. ....When the cultivator has once received an advance, neither he nor any of his posterity can obtain delivorence from the engagement, for the accounts are so dexterously obscure, that he always appears in arrears; that is not to say, he can never expect to be emancipated from his bondage....under a thousand similar acts of oppression the community groans;....every man trembles at the clubs of the planters and is, therefore, detered from complaining The planters have now firmly rooted in the mofussil, because many of the smaller proprietors of land are drawn by avarice to seek their service. Knowing this their wishes are first consulted in the bestowment of places; and finally the rope is artificially fixed to their hooks and they are induced to give lease of their lands, upon the strength of which oppressions are multiplied...."

(21) Indigo-Commission's Report: Appendix no. 16.

(22) As magistrate of Nadia, Turnbull says:

"The contract formed with the ryot is sometimes not in writing is frequently insufficiently defined and is generally extremely unfavourable to the ryot rendering him in fact a slave to the establishment with which he has once engaged, and thereby preventing an open and fair competition to all. Too much also, it is said, was entrusted to dewans, naibs, gomashtas and numerous others employed by the planters who I fear looks but little beyond the quantity of the land procured for him does not pay sufficient attention to the means by which it has been obtained....

"I had some opportunity of witnessing the scenes of contentious strife ensuing from the various and conflicting interests to which that competition gave rise. The disorders which then prevailed in the neighbouring indigo districts have, I believe, nothing abated to the present day and they are

certainly such as to call for the serious interposition of govt. from the moment of ploughing the land and sowing the seed, to the season of reaping the crop, the whole district is thrown into a state of ferment. The most daring breaches of the peace are committed in the face of our police officers, and even of the magistrate himself. In utter defiance of all law and authority, large bodies of armed men are avowedly entertained for the express purpose of taking or retaining forcible possession of lands or crops. Violent affrays or regular pitched battles ensue, attended with bloodshed and homicide. Our police-establishments are corrupted and darogahs are said notoriously to be in the pay of the planters, European or Native. to secure their good offices. Private assassination occasionaly occur and forgery and perjury have their full sway; in short, every species of crime is committed, and in the list I should not omit false charges of murder, arson, etc, which are very common, and are the most harassing of all to the accused as well as to the Magistrate."

টার্নবুল ছাড়া আরও কয়েকজন জজের অভিমত ডাইরেকটররা উদ্ধৃত করেছেন, যেমন সিলির কথা :

"The number of affrays that now annually take place for indigo lands, which are invaribly attended with loss of life, in consequence of the planters entertaining bodies of fighting men for the express purpose of fighting their battles on those occasions." (*Indigo Commission's Report*, Appendix No 16.)

(২৩) "Mr. Walters says that false complaints are made, and witnesses are summoned, but that the planter's name does not appear though the case is brought forward by his servants and at his expense..... Many a planter (says Mr. Walters) has confessed to me that he has been an accessory to acts of which he would have felt himself ashamed in his own country.'....They may direct Brigands to be entertained; they may plan and order attacks to be made, but if not personally present as principals, it is difficult to bring them to justice. 'Instances have occurred' says Mr. Walters, 'in which the mere warning a European planter against being accessory to the breach of the peace on the

information of a Police-officer, that armed men on his part were collected, has called forth a threat of prosecution in the Supreme Court, so that Magistrates are really afraid to act against British subjects, except on the strongest ground." (*Indigo Commission's Report*, Appendix No. 16.)

(২৪) Indigo Commission's Report, Appendix No. 13.

(২৫) Minute by Lord Macauley, 17th Oct. 1835—"That great evils exist, that great injustice is frequently committed, that many ryots have been brought, partly by the operation of the law and partly by acts committed in defence of the law, into a state not very far removed from that of predial slavery is, I fear, too certain. But I see no reason to believe that any of the measures respecting which the Government has consulted us would, in any material degree, alleviate these evils.

"The regulations which gave to the indigo planter who had made advances to a ryot a lien on the indigo crop seems to be highly objectionable in principle. But I do not conceive that by rescinding it the Governor-General-in-Council would give any sensible relief to that class of the population whose interests appear to be peculiarly the object of his solicitation. The question appears to be a question between the planter and the zamindar....I have no reason to believe that the zaminders exercise their power with more justice or humanity than the planters.....

"But it is said, these contracts are not freely made. Force and deception are employed. The peasant assents to disadvantageous terms from fear of bludgeon-men, or is tricked into signing some paper which he does not understand. I answer that in all such cases there ought to be a remedy. The law, I apprehend, would even now reach these oppressive and fradulent practices. If not, the law ought to be altered. In any case of coercion or deception, the contract should be set aside, and the tyrannical or dishonest capitalist should be punished with exemplary severity." (*Indigo Commission's Report*, Appendix, No. 14.

(২৬) 'সংবাদ কৌমুদিতে' (২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৮২৮) দ্বারকানাথ ঠাকুরের চিঠি:

"It is however well known to every one, who has an estate in the country, and personally conducts the affairs of his zamindary, to what degree waste land have been cultivated in consequence of indigo plantation and how comfortably the lower classes are spending their days from the dispersion of money throughout the country by the indigo planters. Those peasants who were in former times forced by their zamindars to labour for them without any remuneration or for the gift of a small quantity of rice, are now enjoying some freedom and comfort under the protection of indigo planters, each receiving for his labour, a salary of about Rs. 4 per month from these planters of indigo, and many persons of middle rank, who know not how to maintain themselves and their families, being employed as Sirkars etc. under these indigo-planters at a higher salary, remain no longer victims to the whims of zamindars and great banyahs.

"From these circumstances, it can be justly inferred, that should the unrestricted residence of European gentlemen be permitted, and there by a great number of Europeans become permanent settlers in different parts of the country to carry on plantation, commerce, etc. the condition of the lower and middle elasses would certainly be more improved and soil better laid out. a circumtance the apprehension of which is mortifying to the self-interested landholders, who are eagerly desirous to trample down the lower and middle classes within their respective circles.

"From a reference to the reports made from time to time to Govt. by its inquisitive judges, the cruel behaviour of the zaminder towards their ryots, will be satisfactorily proved. Besides several landholders, who did not or very seldom visit their respective zaminderis, placing confidence in their managers and stewrds, allow them entire power over the cultivation; but the managers generaly abuse the trust placed in them and grievously oppress the ryots for their own

advantage. They ultimately compel many of the cultivators through extortion to fly to other villages, leaving their huts unoccupied and soils totally waste. The false excuse which they offer to their masters is that owing to the tyranny exercised by indigo-planters, the revenue is reduced and cultivation diminished, and thereby they keep their masters in darkness.

"Under these circumstances. I hope I shall be justified when I say, that whoever is inclined to oppose the diffusion of knowledge among the natives by the Br. Govt. of India, and by many private individuals, among Europeans, or whosoever disposed to oppose the unrestricted residence of Europeans in this country provided certain changes shall at the same time be introduced into the system of administrative justice is an enemy of the natives and to their rising and future generation.

(২৭) 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ' পৃঃ ৩৮৪-৫।

(২৮) ১৮২৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর, তারিখে টাউনহলের সভায় ইউরোপীয়দের 'কালোনিজেশন' ও 'ফ্রি-ট্রেড' সমর্থন করে রামমোহন ও দ্বারকানাথ যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার সারাংশ Royal Asiatic Journal Voll II. New Series, May-August, 1830-তে বেরিয়েছিল। তাই এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হল।

রামমোহনের বক্তৃতা :

"From personal experience I am impressed with the conviction that the greater our intercourse with European gentlemen, the greater will be our improvement in literary, social and political affairs, a fact which can be easily proved by comparing the conditions of those of my countrymen who have enjoyed this advantage with that of those who unfortunately have not had that opportunity; and a fact which I could, to the best of my belief, declare on solemn oath before any assembly. As to the indigo planters, I beg to observe that I have travelled through several districts in Bengal and Bihar, and I found the natives residing in the neighbourhood of indigo plantations evidently better-clothed and better-conditioned than

those who lived at a distance from such stations. There may be some partial injury done by the indigo-planters; but on the whole, they have performed more good to the generality of the natives of this country than any other class of Europeans whether in or out of the service."

দ্বারকানাথের বক্তৃতা :

"With reference to the subject more immediately before the meeting, I beg to state that I have several zamindaries in various districts and that I have found the cultivation of indigo, and residence of Europeans have considerbly benefitted the country and the community at large; the zamindars becoming wealthy and prosperous, the ryots materially improved in their condition, and possessing many more comforts than the generality of my countrymen where indigo cultivation and manufacture is not carried on the value of land in the vicinity to be considerbly enhanced and cultivation rapidly progressing. I do not make these statements merely from hearsay, but from personal observation and experience, as I have visited the places referred to repeatedly and in consequence, am well acquainted with the character and manner of indigo-planters. There may be a few exceptions as regard the general conduct of indigo-planters; but they were extremely limited, and are, comparatively speaking, of the most trifling importance."

(২৯) ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষের নিকট বাঙলার জমিদারদের আবেদন পত্র :

"In the districts where the indigo-planters and others have in a manner settled themselves, the people are more injured and distressed than in other parts of the country, in consequence of such indigo-planters taking possession of land by force, sowing indigo by destroying rice plant (which is the cause of diminution in the produec of rice and dearth of the articles of consumption), detaining cattle of and extorting money from poor individuals, whose frequent complaints inducee the Indian Govt. to pass Regulation 6, 1823; nevertheless, if they be permitted to hold any zamindary or landed property here, the native zamindars and their ryots must be unavoidably

ruined....natives of superior caste and higher rank—having no opportunity to secure public office—have no other means to subsist on than their landed propetry....Under these circumstances their real estates....be allowed to be purchased by foreigners they should inevitably labour under great distress and difficulty for the necessaries of life and for the preservation of their rank and character."

(৩০) Works of Raja Rammohan Roy—পাণিনি অফিস সংস্করণ, পৃঃ ৩১৬-১৭

(৩১) প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'Reformer' ১৮৩২ সালের জানুয়ারী মাসে লিখেছিল: "India wants nothing but the application of European skill and enterprise to render her powerful, prosperous and happy....The idea of the Natives of India suffering oppression from an additional number of European settelers, is equally absurd. They would be subject to the same laws and would enjoy no peculiar priviliegee whatever above the Natives....Our brethren should bear in mind another thing, the invidious, unworthy and humiliating distinction between European and Native are daily diminishing and will be still more so as the Natives of India are admitted to higher offices in the State than they have hitherto been permitted to hold and as knowledge and information becomes more diffused....and nothing is more likely to effect it than colonisation."

(৩২) Indigo Commission's Report, Evidence, p. 71

(৩৩) ঐ পৃঃ ৯০

(৩৪) বাংলার ইতিহাস, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ৭, ৮, ৯

(৩৫) এই সব ইংরেজ বণিক 'বন্ধু' ভারতবাসীদের প্রতি কত রকমের দরদ দেখাতেন তার সুন্দর নমুনা পাওয়া যায় কোপ নামক জনৈক ইংরেজ শিল্পপতির পার্লামেণ্টের কমিটির নিকট ১৮৪০ সালের সাক্ষ্যে: "I certainly pity the East Indian labourer but at the same time I have a greater feeling for my own family than for the East Indian labourer's family; I think it is wrong to sacrifice the comforts of my family for the sake of the East Indian labourer because his condition happens to be worse than mine." (R. P. Dutt: *'India To-day,'* 1947, p. 164).

(৩৬) রামমোহন স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন বলেই গ্রীসে, স্পেনে, ইতালিতে, ফরাসীদেশে, দক্ষিণ আমেরিকায়, যেখানেই বিপ্লব হত, তাকে অভিনন্দিত করতেন। ১৮২২ সালে নেপল্স্-এর বিপ্লব বিফল হলে 'ক্যালকাটা জর্নালের' সম্পাদক বাকিংহামকে তিনি লিখেছিলেন, "এই মর্মান্তিক সংবাদ থেকে আমি বুঝতে পারছি যে ইউরোপের ও এশিয়ার দেশগুলিতে, বিশেষ করে ইউরোপের ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে, স্বাধীনতার সর্বজনীন পুনঃপ্রতিষ্ঠা আমি আর মরবার পূর্বে দেখে যেতে পারব না।" (Rammohon's Works, p. 923) ১৮৩০ সালে ফ্রান্সে বিপ্লবের খবর পেয়ে কলকাতায় টাউনহলে এক সাধারণ ভোজের ব্যবস্থা করে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডে থাকা-কালীন রামমোহন Reform Bill আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বিল পাশ হয়ে যাবার পর তিনি উইলিয়ম রাথবোনকে লিখেছিলেন যে ইংল্যাণ্ড "will never be a prey of the few who used to fill their purses at the expense, nay, to the ruin of the people....As I publicly avowed that in the event of the Reform Bill being defeated I would renounce my connection with this country, I refrained from writing to you until I knew the result. Thank heavens I can now feel proud of being one of your fellow subjects and heartily rejoice that I have had the infinite happiness of witnessing the salvation of the nation, nay of the whole world." (Mary Carpenter : '*Ram Mohan Roy*,' p. 77-78).

(৩৭) Quoted by R. P. Dutta in 'Indi To-day,' 1947, p. 165. একজন ব্রিটিশ অধ্যাপকও এই কথাই বলেছিলেন, "The importance of India to England in the first half of the century lay in the fact that India supplied some of the essential raw materials —hides, oil, dyes, jute and cotton—required for the Industrial Revolution in England and at the same time afforded a growing market for English manufactures of iron and cotton." (L. C. A. Knowles : '*Economic Development of the Overseas Empire*', p. 305).

(৩৮) সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩৪০ ।

(৩৯) ইউরোপীয়দের দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ বিচার

কেবলমাত্র কলকাতার সুপ্রিমকোর্টেই হতে পারত ; মফস্বলের আদালতগুলির তাদের উপর কোনো অধিকার ছিল না। ১৮৩৬ সালের এক আইনের দ্বারা ইউরোপীয়দের কেবলমাত্র দেওয়ানী বিচারের অধিকার মফস্বলের আদালতগুলিকে দেওয়া হল। এই সামান্য ব্যাপারেও ইংরেজরা তীব্র প্রতিবাদ শুরু করে দিল। এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে দ্বারকানাথ এক অভিনব যুক্তি দেখিয়ে ইংরেজদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন :

"The natives have hitherto been slaves ; are the Europeans therefore, to be made slaves also? This is the kind of equality the Government are seeking to establish. They have taken all which the natives possessed, their lives, liberty, property and all were held at the mercy of Government, and they wish to bring the English inhabitants of the country to the same state. They will not raise the Natives to the condition of the Europeans, but they degrade the Europeans by lowering them to the state of the Natives."

(৪০) "Experienced planters were brought from the West Indies.....The area (Bengal) attracted a rather rough set of planters, some of whom had been slave drivers in America and carried unfortunate ideas and practices with them." (Buchanan : *'Devllopment of Capitalist Enterprise of India, p. 36-37.*)

(৪১) 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় কার্তিক (১৩৬৫), বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক (১৩৬৬) সংখ্যায় শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধ।

(৪২) ঐ, কার্তিক, ১৩৬৫।

(৪৩) প্রথম চৌধুরীর 'রায়তের কথা'য় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা।

(৪৪) 'Selection from Papers on Indigo Cultivation in Bengal', by a Ryot, p. 37। ১৮৫৮ সালে ২১শে আগস্ট 'Indian Field' লিখেছিল : "The factory servants, who receive little or no pay, are generally the most wealthy men in the district." ১৮২৮ সালের ৬ই ডিসেম্বরের এক খবরে দেখা যায় যে জনৈক কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৭।১৮ বৎসর হাজরাপুরের (যশোহর) নীলকুঠিতে দেওয়ান ছিলেন। তিনি এক ইস্তাহারে সকলকে জানাচ্ছেন যে তাঁর কলকাতার

পুরনো বাড়ি নিয়ে হাইকোর্টে মামলা চলছে, তাই তিনি পুণ্য করবার জন্য গঙ্গাতীরে নতুন বাড়িতে বাস করছেন। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ১ম খণ্ড ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ১৫৩)।

(৪৫) "Indigo Commission's Report, Evidence, p. 39.

(৪৬) বিলাতে কোর্ট অব ডাইরেক্টরসের নিকট লর্ড বেন্টিঙ্ক-এর রিপোর্ট: "If all the ancient articles of the manufacturing produce of India are swept away, and no new ones created to supply this vacuum on the exports, how will it be possible for commerce to be carried on and how can any remittance on private or public account be made to Europe ? If bullion alone is to supply the balance, soon will the time arrive when....it will no longer be possible to realise the revenue at its present nominal amount. It is therefore the bounden duty of Government to neglect no means which may call forth the vast productive powers of the country, now lying inert from the want of adequate encouragement."

(৪৭) Evidence of David Hill before the Parliamentary Committee on 30 March, 1832 : "The advantages to arise from the settlement of Europeans in India have been wonderfully exaggerated ; I estimate them very low indeed....I have no conception that any British capital would ever find its way to India ; it never did when the temptation was much greater ...and the distance of our empire, the uncertain tenure by which we hold it, the alarms continually springing up as to events endangering its stability, effectually prevent British capitalists from transferring their funds to India. In that case, there remains only the skill and enterprise of Englishmen. According to my conception, they will be far behind the natives in most departments to which skill can be applied. There are physical difficulties in the way of their undertaking manual labour....I imagine that the ryots of India are much better husbandsmen than European settlers would be. So it would be as to mechanics also. There remains only the object of stimulating and directing the exertions of the natives themselves....if none but good characters went, they would

be doing harm to themselves, but would not do any harm to India. A man of good conduct and capacity could not injure India; but my impression is, that as it would be a bad speculation to the settlers, many would forfeit the good character they took out with them and many others would find their way to India who were bad subjects, difficult to govern, and not capable of conferring any benefits on the country they visited." (*Report of the Select Committee on the Affairs of the E. I. Co. 1832*)

(৪৮) Rickards' evidence before the Parliamentary Select Committee in 1830: "Any improvement which may have arisen in consequence of the introduction of British capital and enterprise into India is nothing in comparison with what would be the case if the natives were sufficiently encouraged and proper attention paid to their cultivation and improvements. India requires capital to bring forth her resources; but the best and fittest capital for this purpose would be one of native growth and such a capital would be created if our institutions did not obstruct it.

"The natives are much given to commercial and industrial pursuits and exceedingly well qualified to succeed in them. They are sufficiently commercial to answer the highest expectations that can be formed or desired, in respect to trade between the two countries, but our local intsitutions must be greatly altered before they can become wealthy or prosperous; if the condition of the natives, their habits, wants, rights and interests were properly attended to, all the rest would follow." (*Report of the Select Committee on the Affairs of the E. I. Co. 1832, Vol. I, p. 308*)

(৪৯) ঐ, ৩০৮

(৫০) Delta; "Indigo and Its Enemies, 1861," p. 8.

(৫১) Minutes of Sir Charles T. Metcalfe (19 Feb 1829): "I am further convinced that our possession of India must always be precarious unless we take root by having an influential portion of the population attached to our government by common interests and sympathies.

"Every measure therefore which is calculated to facilitate the settlement of our countrymen in India and to remove the obstructions by which it is impeded must, I conceive, conduce to the stability of our rule...."

(৫২) Report of Lord Bentinc (30 May, 1829), "Is there anywhere the prospect of our obtaining in a season of exegency, that co-operation which a community, not avowedly hostile, ought to afford to its rulers ? Is it not rather true that we are the objects of dislike to the bulk of those classes who possess the influence, courage, and vigour of charactor which would enable them to aid us ? Do our institutions contain the seeds of self-improvement ? Has it not rather been found that our difficulties increase with length of possession.... the required improvement can only be sought through the more extensive settlement of European British subjects, and their free admission to the possession of landed property."

(৫৩) Evidence of Holt Mackenzie on 23 Feb, 1832 before the Parliamentary Committee. "The European settlers in India would be very useful agents of police. They would be centres of infomation we now want, and would have great influence over those connected with them. . They would be bound to us by a common feeling."

(৫৪) অনেক ছবি সংবলিত এই বই লণ্ডনে ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয়। ফরলং ও লার মুরের অতিথি হয়ে গ্রাণ্ট মোল্লাহাটিতে কিছুকাল বাস করেছিলেন এবং আরও অনেক কুঠিতে ছিলেন। মোল্লাহাটির কুঠি (ইংরাজেরা বলত মুলনাথ) বনগ্রাম থেকে ৫ মাইল দূরে ইছামতী নদীর তীরে অবস্থিত। বাংলার সব থেকে বড় নীল কোম্পানির (Bengal Indigo Company) সব থেকে বড় কুঠি ছিল মোল্লাহাটির কুঠি। যশোহর, নদীয়া ও ২৪ পরগনায় এই কোম্পানির ১৭টি কুঠি ছিল ও এই কুঠিগুলির অধীনে ২ লক্ষের উপর লোকের বাস ছিল। এই কোম্পানির মালিক ফরলং ও ম্যানেজার লারমুর দুজনেই সমান কুখ্যাত। "এই কুঠির অত্যাচার কাহিনীর উপর লক্ষ্য রাখিয়া দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' প্রণীত হয়।" (সতীশচন্দ্র মিত্র : 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস', পৃঃ ৭৬৩)

(৫৫) 'Indigo Commission's Report p. 21-22 and 197.

(৫৬) Delta : 'Indigo and its Enemies.'

(৫৭) Watts : Dictionary of Economic Products of India 1890, p. 428

(৫৮) ঐ, পৃ: ৪২৯-৩০

(৫৯) 'Indian Field', 24 July, 1858.

(৬০) 'Indigo Commission's Report, Evidence', p. 2.

রেভারেণ্ড্ ডাফ বলেছিলেন, "কে কোথায় কবে শুনেছে যে নিজের গুরুতর লোকসান জেনেও বছরের পর বছর কেউ স্বেচ্ছায় চুক্তি সই করে দেয়, তাও আবার কতকগুলি ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধর্মের লোকদের ধনী করবার জন্য ? ব্যাপারটা একেবারে আজগুবি।"

(৬১) Indigo Commission's Report, p. 21.

(৬২) Indigo Commission's Report, Evidence Appendix No. 22.

(৬৩) Indigo Commission's Report, Evidence p. 6

(৬৪) F. E. C. Linde : 'A Short Sketch of the Cultivation, Manufacture and Trade of Indigo' 1882, p. 6

(৬৫) Indigo Commission's Report, Appendix No 8

(৬৬) 'Fifty Years Ago' (in the Dawn Magazin. July 1905).

(৬৭) Calcutta Review, June 1860.

(৬৮) Indigo Commission's Report, Evidence p. 239.

(৬৯) Watts : Dictionary of Economic Products of India p. 420.

(৭০) Indigo Commission's Report Appendix II, No. 4.

এত লাভ সত্ত্বেও বিহারের ৩০,০০০ চাষী আফিং চাষ করতে রাজী হয় নি। এর উপর নীল কমিশন মন্তব্য করেছেন যে "এর অর্থ খুবই সোজা। আফিং চাষ করা না করা বিহারী কৃষকদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, কিন্তু নীলচাষ করা না করা বাংলার চাষীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না।" (Indigo Commission's Report p. 35.)

(৭১) Buckland : Bengal Under The Lt. Governors, Vol I, p. 245.

(৭২) Linde : 'A Short Sketch of the Cultivation, Manufacture and Trade of Indigo, 1882 p. 6.

(৭৩) Indigo Commission's Report, p. 35.

(৭৪) ঐ, সাক্ষ্য : পৃ: ২৩২

(৭৫) ঐ, সাক্ষ্য : পৃঃ ২৩৩

(৭৬) ঐ, পৃঃ ৯

(৭৭) ঐ, পৃঃ ৯১০

(৭৮) ঐ, পৃঃ ১১

(৭৯) ঐ, পৃঃ ১৭১

(৮০) ঐ, পৃঃ ৬৩-৬৪

(৮১) যোগেশচন্দ্র বাগলের 'জাতি-বৈর'-এ উদ্ধৃত, পৃঃ ৯৫-৯৬

(৮২) Indigo Commission's Report, Evidence p. 3-4.

(৮৩) 'Selections from Bengal Government Records' No. xxxiii, 'Indigo Cultivation' I p. 230.

(৮৪) 'Indigo Commission's Report' p. 18

(৮৫) ঐ, সাক্ষ্য পৃঃ ২৩৩

(৮৬) ঐ, প্রশ্ন নং ১৯১৮

(৮৭) Hansard, Vol. 162 Cols 802.

(৮৮) "Calcutta Review", June 1860.

(৮৯) 'বাঙলার ইতিহাস' ২য় ভাগ পৃঃ ৬১-৬২

(৯০) "Selections from the Records of the Government of Bengal : Papers relating to Indigo Cultivation in Bengal" Calcutta 1860, p. 2-3.

(৯১) ঐ, পৃঃ ৫-৯

(৯২) ঐ, পৃঃ ১৮

(৯৩) "Indigo Commission's Report", p. 12-13

(৯৪) ঐ, সাক্ষ্য : পৃঃ ১৯১

(৯৫) Buckland : "Bengal Under The Lt-Governors," I, p. 248.

(৯৬) ঐ, পৃঃ ২৪৮

(৯৭) ঐ, পৃঃ ২৪৮-৪৯

(৯৮) সতীশচন্দ্র মিত্র : "যশোহর খুলনার ইতিহাস," ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭২০

(৯৯) "Indigo Commission's Report", Evidence p. 13.

(১০০) ঐ, পৃঃ ২৪

(১০১) "Indigo Commission's Report" Appendix 16,' Part I.

(১০২) "Hindu Patriot," 12 May, 1860.

(১০৩) "Indigo Commission's Report". Evidence, p. 61

(১০৪) ঐ, পৃঃ ১৬

(১০৫) ঐ, পৃঃ ৯১

(১০৬) কাহিনীটি ১৮৬০ সালে ৭ই জুনের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' থেকে সংগৃহীত।

(১০৭) "Indigo Commission's Report" Evidence p. 53-54.

(১০৮) Q. "On the whole do you consider that the principal Zamindars of the district have favoured the movement, or remained neutral ?"

Herschel's answer : "On the whole their weight has been thrown into the scale against the planters, but to nothing like the extent to which it might have been, had they been so disposed". "Indigo Commission's Report, Evidence," p. 6.

(১০৯) ঐ, পৃঃ ৬

(১১০) 'Calcutta Review', June 1860.

(১১১) Buckland, "Bengal Under The Lt. Governers," p. 184.

(১১২) "Calcutta Reviw," June 1860 p. 355

(১১৩) Parliamentary Papers, (1861), vol. xiiv, p.171-2

(১১৪) "Hindu Patriot", 17th March, 1860

(১১৫) "Hindu Patriot"-এ উদ্ধৃত, 31st March, 1860

(১১৬) ঐ, খণ্ড ৪৪, পৃঃ ৩০৯

(১১৭) ঐ, খণ্ড ৪৪, পৃঃ ১৯৫

(১১৮) ঐ, (১৮৬১), খণ্ড ৪৫, পৃঃ ৫-৬

(১১৯) 'Hindu Patriot,' 11 February, 1860

(১২০) অনাথনাথ বসু : 'মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ' পৃঃ ৩৬

(১২১) 'যশোহর খুলনার ইতিহাস,' ১৩২৯, পৃঃ ৭৮১

(১২২) এই প্রবন্ধটি শিশিরকুমার ঘোষের 'Pictures of Indian Life"-এ, ১৯১৭, পুনর্মুদ্রিত হয়।

(১২৩) শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'বঙ্কিম জীবনী', পৃঃ ৮৭-৮৮

(১২৪) Sisir Kumar Ghose : 'A Story of Patriotism' in 'Pictures of Indian Life', p. 72-80

(১২৫) 'যশোহর খুলনার ইতিহাস', পৃঃ ৭৭৯

(১২৬) 'Indigo Commission's Report', Evidence, p. 6

(১২৭) লেখক এই তথ্যগুলির জন্য কৃষ্ণনগরের শ্রীঅমৃতেন্দু মুখার্জীর নিকট ঋণী।

(১২৮) আই, টি, প্রিচার্ড নামক একজন ইংরেজ ব্যারিস্টার ও সাংবাদিক এই আন্দোলন দেখে লিখেছিলেন "......(it) may have been very easily got up by working some of those secret springs that are never wanting in the politics of Bengal when a little intrigue may serve the purpose of a party'. ('Administration of India': 1859-68, I, p. 447)

(১২৯) 'মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ,' পৃঃ ৩৬-৩৭

(১৩০) 'Indigo Commission's Report, Evidence,' p. 88

(১৩১) ঐ, পৃঃ ৫

(১৩২) 'Indigo Commission. Report', p. 31-32

(১৩৩) 'Hindu Patriot', 19 May, 1860

(১৩৪) 'Amrita Bazar Patrika', 22nd May, 1874

(১৩৫) 'ভারতের মুক্তি-সন্ধানী', প্রথম সংস্করণ, ১৩৫৫, পৃঃ ৭৯

(১৩৬) ঐ, পৃঃ ৮১

(১৩৭) "Well Nigger ?—I see thou art getting bolder day by day, thus to seriously slander gentlemen. Forgettest thou your position as a 'slave of the conqueror ?' Knowest not that from the day of Plassey thou art doomed to suffer ? Being proud of the large circulation of thy mean journal, and of the totally undeserved praise thou elicitest from all your brother liars thou hast taken into your head to villify the character of our noble-body............Never think that thine flattery will do thee any good. Vile sycophant. Knowest not thou the authority of our august body ? Nigger, take care how thou actest ? If thou will not stop your pen, thou shalt suffer. Thy character of late has become most detestable. Nigger, reflect on your position. Don't desire what you deserve.

"P. S. If I happen to meet thee any day either in town or in the Moffusil, I am resolved to make you suffer a few good cuts of my horse whip." ('Hindu Patriot' 25 Feb. 1860)

(১৩৮) এই মন্তব্যগুলি যোগেশচন্দ্র বাগলের 'ভারতের মুক্তি-সন্ধানী' (পৃঃ ৮২-৮৪) হতে উদ্ধৃত।

(১৩৯) "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ", পৃঃ ২২৩-২৪

(১৪০) অনাথনাথ বসু : "মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ," পৃঃ ১১-১২

(১৪১) এই চিঠিগুলি যোগেশচন্দ্র বাগলের সম্পাদনায় 'Peasant Revolution in Bengal" নাম দিয়ে ১৯৫৩ সালে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

(১৪২) যদুনাথ এই ভূমিকাতে লিখেছেন যে শিশিরকুমার "triumphed at the end of the long struggle, because the justice of his cause was recongised by our wise rulers....... Relief came to the Bengali ryots so soon and so easily because the British Civil Service (with a few exceptions) was on their side, and did evenhanded justice in disregard of unpopularity they incurred in European society as 'pro-native.''

(১৪৩) Here are we the weak, the oppressed of years, the producers of the country's wealth the support of its prosperity, who ought to be cherished and protected by the Govt. we are visited with a law of special severity and troops are sent to make us submit to fraud and oppression. There are the planters powerful, influential, wealthy, oppressive, committing violent crimes, the patrons of ruffianry of the country, who instead of being punished and put down, are encouraged, furnished with means to extend their oppression. (Hindu Patriot, Ap. 14, 1860)

(১৪৪) The root trouble was economic. In consequence of the fall in the price of this dye in the European market it was now impossible for the Indigo-planters to make any profit after paying fair wages to the cultivators ; hence they resorted to extortion and coercion. (Sir Jadunath Sarkar's Introduction to the 'Peasant Revolution in Bengal,' Edt by Joges Chandra Bagal, 1953)

(১৪৫) George Smith : 'Life of Alexander Duff' vol. II. p. 375.

(১৪৬) শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : "বঙ্কিম জীবনী," পৃঃ ৮১

(১৪৭) ঐ, পৃঃ ৯১-৯২

(১৪৮) "বাংলার নব-জাগরণ", ১৩৬৩, পৃঃ ৭৬

(১৪৯) "বঙ্কিম রচনাবলী", সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮২৭

(১৫০) ঐ, পৃঃ ৮২৬। লণ্ডনের বিখ্যাত প্রকাশক সিম্পকিন মার্শাল কোম্পানি মধুসূদন-কৃত নীলদর্পণের অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন, এবং চার্লস্ ডিকেন্স তা পড়ে তাঁর সম্পাদিত 'All the year Round' পত্রে নীলদর্পণের বিস্তর প্রশংসা করেন। (নগেন্দ্রনাথ সোম: 'মধুস্মৃতি', পৃঃ ২০৫)।

(১৫১) 'নীলদর্পণ', শশাঙ্কশেখর বাগচীর ভূমিকা, পৃঃ ১৭

(১৫২) Lt. Governor Sir J. P. Grant's minute : "The Commissioners lay most stress on the proved and undeniable prevalance of seizing cattle and more specially of kidnapping. The last crime they reprobate in strong, but not too strong language. A country where both these offences are committed habitually and for the most part with impunity is a country in which the law affords the weak no protection. The fact is a disgrace to the Administration. It is not simple confinement in one godown that is practised. Respectable men are seized, and sent about from one factory to another, to escape discovery ; and as in Seetal Tarafdar's case, they are not always ever heard of again." (Buckland, vol. 1, p. 253)

(১৫৩) কাজী আবদুল ওদুদ: "বাংলার নব জাগরণ", পৃঃ ৭৬

(১৫৪) "The free resort of Europeans to this country would be highly advantageous and without the least injury to any class of persons, whether high or low, rich or poor, zaminder or cultivator ; particularly to Motsudees or Superintendents, Head Sircars, Gomashtas etc, who will derive their support from them ; this may be observed in Calcutta." (Dwarkanath Tagore in a letter to "Sangbad Kaumadi," 1st June 1830.)

(১৫৫) সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর: "ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন" ("চতুরঙ্গ", কার্তিক-পৌষ, ১৩৬৬)। এই সব তথাকথিত "মধ্যবিত্তদের" চরিত্র সম্বন্ধে দেশের লোক ভালোভাবেই জানত। সমাজের এই নিকৃষ্টতম পরজীবীগুলি সম্বন্ধে একজন লেখক লিখেছেন যে, "সাধারণতঃ

ধর্মজ্ঞানহীন লোকরাই নীলকর সাহেবদিগের অধীনে কার্য্য করিত। প্রভুর সন্তোষ বিধান ও স্বীয় স্বার্থ সাধনের জন্য তাহারা কোন গর্হিত কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইত না।" (অনাথনাথ বসু: "মহাত্মা শিশির-কুমার ঘোষ," ১৩২৭, পৃঃ ৩৩)

(১৫৬) "আমার কথা," ১৩১৯, পৃঃ ২৯

(১৫৭) Indigo Commisson's Report, Appendix No. 12.

(১৫৮) হরিশচন্দ্র ম্যাজিস্ট্রেটদের সম্বন্ধে 'Hindu Patriot'-এ লিখেছিলেন "Are these magistrates men to govern millions, when they cannot resist the temptation of dining with the planters and talking with their wives and dancing with them".

(১৫৯) রেভারেণ্ড লঙের জন্ম হয় রুশ দেশে; সেখানেই তাঁর শৈশব ও বাল্যকাল কাটে। ১৮৪০ সালে তিনি ভারতে পাদ্রী হয়ে আগমন করেন। তিনি একজন পণ্ডিত ও মানববাদী লোক ছিলেন। গরিবদের প্রতি তাঁর দরদ ও মানবপ্রীতি তাঁর বইগুলির মধ্যেই দেখা যায়। রুশ দেশে থাকার সময়ই তিনি সেদেশের লোককথা খুব আগ্রহের সঙ্গে সংগ্রহ করেন। নীলদর্পণের অনুবাদ প্রকাশ করার পূর্বে চাষীদের ও বিশেষ করে নীলচাষীদের সম্বন্ধে তিনি অনেক লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি যে সব পুস্তক রচনা করেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে (১) Analysis of Bengali Poem Raj Mala or Chronicles of Tripura. (2) Eastern Proverbs and Emblems (1881). (3) Oriental Proverbs in their Relation to Folklore, History, Sociology. First published in 1875. Reprint by *Jatiya Sahitya Parishad*, 1956, edited by Dr. Mahadev Prasad Saha (4) A Return of the Names and Writings of 515 Persons Connected with Bengali Literature during the Last 50 Years and a Catalogue of Bengali Newspapers and Periodicals from 1818 to 1855 (1855). (5) Selections from Unpublished Records of Government from 1747—1767 relating mainly to the Social conditions of Bengal (1869). (6) Village Communities in India and Russia (1870). (7) Handbook of Bengal Missions, (8) প্রবাহ মালা। (9) Russian Proverbs.

(১৬০) "Had we not seen by what tender thread we hang? Have not the late mutinies taught us how unsafe

is our position ? Can we permit persons, impelled by over-zeal to endanger our safety and induce the belief among the people in England, already too prone to believe evil of their countrymen, at a distance, that Englishmen in India are guilty of the wrong and disgraceful conduct imputed to them ?" Paterson's appeal to the Jury in Long's Trial. ("Indigo Mirror," edited by Sudhi Pradhan, p. 124).

(১৬১) ঐ, পৃঃ ১৩০

(১৬২) "If this was a libel, the finest literature of ancient and modern times must be shut out. Look at Moliere's works : they are but a series of venomous caricatures of the clergy and medical profession....*Oliver Twist*, for example, which was written with the sole intent and purpose of doing away with the workhouse-system as formerly carried out ; it had been successful. Another work by the same author *Nicholas Nickleby* was intended to expose and crush the abuses in Yorksire schools. Were any legal proceedings instituted against Mr, Dickens ? (ঐ, পৃঃ ১৪৪) "নীলদর্পণ" সম্বন্ধে তৎকালীন "Calcutta Review" (June 1861, p, 366) লিখেছিল : "This literary weapon being of a terrible nature was seized and welded against British settlers." বিখ্যাত ফরাসী নাট্যকার মলিয়ের-এর "লা" মুরমেড্ সাঁ"র সঙ্গে নীলদর্পণ"এর তুলনা করে লেখক আবার বলছেন : "It may be said that such books as the Nil Darpan act as an antidote to vice by exhibiting it in its most repulsive form, and thus give to the morals of society a healthy tone."

(১৬৩) মরডান্ট ওয়েলস্ সম্বন্ধে একজন ইংরেজ লেখক বলেছিলেন যে তিনি ছিলেন "the least judicial of all the judges of the Supreme Court." (George Smith, Life of Alexander Duff, II, P. 377).

(১৬৪) "The Jury, the civilians, the soldiers and merchants in this country alike had their common origin from that middle class whose daughters are here so shamefully maligned. These ladies came to this country to share a life of toil and hardship with their husbands." (ঐ, পৃঃ ১৫৫)

(১৬৫) ঐ, পৃঃ ১৭৫। এগলিংটন বেশ জোর দিয়েই বলেছিলেন যে মানহানির জন্য এ মামলা হয় নি, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্যরূপ; নীলকররা "looked very cheerful and not at all like men suffering from the sting of injurious calumnies. He did not think that there was a single planter who cared one farthing about the publication of Nil Durpan. He believed that there was another motive for the prosecution, and not the one alleged..... if the planters had really felt themselves hurt, they would long ago have taken proccedings against the publishers of the Native copies printed. If any copies did harm, surely they were the native ones." (Ibid, p. 142)

(১৬৬) যোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক "জাতি-বৈর"তে ১১৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

(১৬৭) "We ask to be relieved from the oppression of an ignorant and mischievous despot, who is ruling the finest country of the earth....and who, if he remains your Minister, will soon bring matters to such a pass that you will have to make your choice between abandoning the country and holding it at the point of the bayonet." ("Brahmins and Pariahs")

(১৬৮) "Governor Grant is a terrible man,
As he reigns in Alipore Hall ;
A compound of Chenges and Kublai Khan
Tamerlain, Nadir and all."

(১৬৯) "Hindu Patriot", 12 May, 1860,

(১৭০) "Indigo Commission's Report" p. 45.

(১৭১) Ibid, p. 21. এই রিপোর্টে আর একস্থানে বলা হয়েছে: "গভর্ণমেণ্টের মনে করা উচিত যে দেশের অভ্যন্তরে নীলকরদের উপস্থিতি বিদ্রোহের বিপক্ষে একটা guarantee ও সরকারের শক্তি ও ঐশ্বর্যের একটা উৎস।" (পৃঃ ৬)

(১৭২) ঐ, পৃঃ ২৯

(১৭৩) রেভারেণ্ড স্থড় পুলিশদের প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনো দিন কিছু করেছিল বলে তাঁর জানা নেই। "আমি জানি যে ভারতীয় পুলিশ কর্মচারীরা নীলকরদের কাছে ঘুস নিতে সর্বদাই প্রস্তুত, আর ইংরেজ পুলিশ কর্মচারীরা নীলকরদের

অনেক স্বাধীনতা দিয়ে থাকে, যা নীলকররা ভালোভাবেই ব্যবহার করে থাকে। সাধারণভাবে বলা যায় যে দারোগারা ও অন্যান্য ভারতীয় পুলিশরা নীলকরদের ভয় করে চলে, কারণ নীলকরের অভিযোগের ফলে অনেকক্ষেত্রে ভারতীয় পুলিশ অফিসারকে সরানো হয়েছিল। পুলিশরা অত্যন্ত বেশী রকম ভাবে রায়তদের অবহেলা করেছে।" হুড় আরও বলেন যে বিদ্রোহ শুরু হবার পর থেকে পুলিশরা অনেক ক্ষেত্রে রায়তদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছে। ("Indigo Commission's Report, Evidence," p. 72)

(১৭৪) ঐ, পৃঃ ৩০

(১৭৫) ঐ, পৃঃ ৩১

(১৭৬) ঐ, পৃঃ ৩১

(১৭৭) Buckland : "Bengal Under the Lt. Governors," I, p. 256.

(১৭৮) "Calcutta Review," June, 1861

(১৭৯) Buckland : "Bengal Under The Lt. Governors." I, p. 257

(১৮০) Hiren Mukerjee : "Under Marx's Banner" p. 99

(১৮১) Watts, p. 464

(১৮২) Buckland, I, p. 192. নীলকমিশনের রিপোর্টের মন্তব্যে কিছুকাল পরে গ্র্যাণ্ট আবার বলেছিলেন : "If one thinks that such a strong feeling by hundreds and thousands of people as we have just witnessed in Bengal, has no meaning of greater importance than an ordinary commercial question concerning a particular blue dye, such a person, in my opinion, is fatally mistaken in the signs of the time.···No human power exerted in defiance of the law, in support of the system (of indigo plantation), could have upheld it much longer, and that if the Government had disregarded justice and policy so far as to make the attempt, it would have been speedily punished by a great agrarian rising, the destructive effects upon European and other capital, no man can calculate." (Ibid, p. 251)

(১৮৩) 'অমৃত বাজার পত্রিকা' ২৬শে অক্টোবর, ১৮৭৬।

(১৮৪) "Issued among a people, in whose secret souls the elements of discontent had, by yearly increments, accumulated to repletion, it (Eden's perwana) fell like a spark on a long prepared train, and proved the occasion of a sudden and widespread ignition." (Rev. Duff's letter to Seton-Karr, "Indigo Commission's Report," Appnendix. No. III)

(১৮৫) Indians "hate civilian, missionary and planter in equal degree.···The mutiny gives conclusive evidence of the hatred borne by natives to all Europeans or indeed Christians." ("Brahmins and Pariahs", p.70) নীল-কমিশনের সাক্ষ্যে লঙ বলে-ছিলেন : "Missionary preachers, even in Calcutta, are sometimes met with a remark : 'Why do you not tell your countrymen, the Indigo planters, to be less oppressive ; go, preach to them first. And I have frequently heard even boys in Missionary schools say : 'Why are your Christian countrymen as bad as we are, and yet you say, your religion is better than ours'."

(১৮৬) Quoted by Hiren Mukerji, "India' Struggles for Freedom," p. 58

(১৮৭) Quoted by Hiren Mukerji "Indigo Riots of 1859-60" ("New Age," Madras, 1939)

(১৮৮) Kaye, "History of the Sepoy War." I. p. 498

(১৮৯) Kaye, Ibid, II, p. 11.

(১৯০) Buckland, I, p. 68.

(১৯১) O'Malley, "District Gazetteer," Nadia, p. 32.

(১৯২) Ibid, Bankura, p. 41.

(১৯৩) Ibid, Burdwan, p. 38.

(১৯৪) Forrest : "Selections from State Papers," II, 168-9.

(১৯৫) হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও কালিদাস মুখোপাধ্যায়-এর পুস্তিকা : "১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহ", পৃঃ ২৯।

(১৯৬) বিনয় ঘোষ : "বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী ও সিপাহী বিদ্রোহ"—"নতুন সাহিত্য," বৈশাখ ১৩৬৪।

(১৯৭) "ব্যক্তি বা শ্রেণীগত লাভ-লোকসানের হিসাব করে তাঁরা (বাঙালী শিক্ষিতেরা) সিপাহী-বিদ্রোহের প্রতি বিরূপ হন নি, আসলে সিপাহী

বিদ্রোহই তাঁদের হৃদয়-মন, বুদ্ধি ও চেতনা স্পর্শ করতে পারেনি।...১৮৫৭-৫৮-কে সামন্ত প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখে তাঁরা সিপাহী বিদ্রোহের প্রতি উদাসীন ছিলেন—অথচ স্বাধীনতা-হীনতায় বাঁচতে চান মোটেই এমন নয়। বরং বুঝতে পেরেছেন কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিদ্রোহের পথে স্বাধীনতা অসম্ভব। তাই সিপাহী বিদ্রোহের নিষ্ফলতায়ও তাঁরা ব্যাহত বোধ না করে নীল আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।" ("আজি হতে শতবর্ষ পূর্বে"—'পরিচয়', চৈত্র, ১৩৬৩।)

(১৯৮) সুশোভন সরকার : "সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস"—"পরিচয়," শ্রাবণ, ১৩৬৪।

(১৯৯) যোগেশচন্দ্র বাগল : "মুক্তির সন্ধানে ভারত", পৃঃ ৭৫।

(২০০) S. B. Choudhury : "Civil Rebellion in the Indian Mutinies 1857-59," p. 80

(২০১) Ibid, p. 115.

(২০২) Ibid, p. 154

(২০৩) Ibid, p. 158.

(২০৪) Ibid, p. 174

(২০৫) Ibid, p. 252.

(২০৬) Ibid, p. 279

(২০৭) "European factories (coffee, indigo etc.) had been destroyed without any exception and examples had been made of all such properties as fell into the hands of the rebels and full retaliation exacted for all the acquisitive tendencies of the factory-owners....The popular character of the movement at Palamau brooks no doubt. The mutinies resulted in a civil rebellion of a country-wide character in which all classes of people from the landed gentry to the village-chief joined with the sole aim of stopping European exploitation and wiping out all traces of British rule. It was not, therefore, a military insurrection, as it has been represented in earlier works, nor a rising confined to a small and discontented section of the primitive tribes as dismissed in 'Eighteen Fifty-seven' (S. N. Sen, p. 409), but a peoples' war fought with the passions roused up by the deeply stirred political sentiments." (S. B. Chaudhury, p. 190-91)

(২০৮) "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ", পৃঃ ২১৮ ও ২২৪।

(২০৯) Hiren Mukerji : "Indigo Riots of 1859-60"—"New Age" Madras, 1939 ; reprinted in "Under Marx's Banner," Calcutta, 1944.

১৮৫৫ থেকে ১৮৬০এর মধ্যে নীলচাষের জেলাগুলিতে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য ও মজুরি বৃদ্ধি ঃ

(Indigo Commission's Report : Appendix No. III)

	নদীয়া		যশোহর		বর্ধমান		মুর্শিদাবাদ		বাঁকুড়া		মৈমনসিং	
	১৮৫৫	১৮৬০	১৮৫৫	১৮৬০	১৮৫৫	১৮৬০	১৮৫৫	১৮৬০	১৮৫৫	১৮৬০	১৮৫৫	১৮৬০
	টা.আ.পা.	টা.আ.পা.	টা.আ.পা.	টা.আ.পা.	টা.আ.পা.	টা.আ.পা.	টা.আ.পা.	টা.আ.পা.	টা.আ.পা.	টা.আ.পা.	টা.আ.পা.	টা.আ.পা.
দৈনিক মজুরির হার …	০. ১.৬	০. ২.৬	০. ২.০	০. ৩.৬	০. ১.৬	০. ২.৬	০. ২.০	০. ২.০	০. ১.৩	০. ২.০	০. ২.০	০. ৪.০
দৈনিক গরুর গাড়ি ভাড়া	০. ৪.০	০. ৬.০	০. ৪.০	০. ৮.০	০.১০.০	০.১২.০	০. ৬.০	০. ৮.০	০. ৪.০	০. ৬.০	০. ৫.৩	০.১২.০
দৈনিক নৌকা ভাড়া	৪. ০.০	৬. ০.০	২০. ০.০	৩০. ০.০	৪০—১২৫	৫০—১৫০	১৫. ০.০	১৯. ০.০	…	…	৯. ০.০	২০. ০.০
প্রতি মণ চাউলের দাম	১. ৬.০	২. ০.০	১. ০.০	১.১৪.০	০.১৫.০	২. ০.০	১.১২.০	২. ২.০	১. ০.০	২. ০.০	০.১৩.০	১.১২.০
প্রতি মণ ধানের দাম	০.১০.০	১. ৪.০	০.১০.০	১. ৪.০	০.১০.০	১. ৭.০	০.১৩.০	১. ২.০	০. ৮.০	১. ০.০	০. ৭.০	১. ০.০
প্রতি মণ ঘির দাম …	১৪. ০.০	২৫. ০.০	২০. ০.০	৩৫. ০.০	১৭. ০.০	৩২. ০.০	১৬. ০.০	৩২. ০.০	১৫. ০.০	২০. ০.০	২০. ০.০	৪০. ০.০
প্রতি মণ সরিষার দাম	৭.১২.০	৯.১৩.০	৯. ৪.০	১২. ০.০	৬. ৮.০	১০. ৪.০	২. ৪.০	৩. ০.০	৭.১০.০	৯. ৩.০	৮. ০.০	১০. ০.০
প্রতি মণ তিলের দাম	…	…	১৩. ০.০	১৫. ০.০	৬. ০.০	১০. ০.০	২. ৪.০	৩. ০.০	…	…	৮. ০.০	১০. ০.০
প্রতি সের তামাক …	০. ১.০	০. ১.৩	০. ২.০	০. ৩.০	০. ২.০	০. ২.০	০. ২.৬	০. ৪.০	০. ১.০	০. ২.০	০. ১.৩	০. ২.০
ডাল … …	২. ২.০	২.১৪.০	১. ০.০	৩. ০.০	০. ০.৭	০. ১.৩	১. ০.০	২. ০.০	১.১২.০	২. ৪.০	২. ৮.০	৪. ০.০
এক জোড়া ধুতি চাদর	১. ০.০	১. ৪.০	১. ৪.০	১. ৮.০	২. ০.০	২. ৮.০	১. ২.০	১.১২.০	১. ৪.০	১.১০.০	১. ০.০	১. ৮.০
প্রতি সের মাছি	০. ২.০	০. ২.৬	০. ১.০	০. ২.০	০. ৩.০	০. ৪.০	০. ১.৩	০. ২.০	০. ১.৩	০. ২.০	০. ২.০	০. ৮.০
একটি গরুর গাড়ি	৬.১০.০	৮. ৪.০	৩. ০.০	৭. ৮.০	১৫—৩০	২০—৩০	৮. ০.০	১০. ০.০	৬. ০.০	৮. ০.০	৮. ০.০	১৬. ০.০
একটা হাল (মেরামতি সমেত)	১. ৪.০	১. ১২.০	১. ০.০	১. ৮.০	১.১০.০	১.১২.০	২. ০.০	২. ৮.০	০.১২.০	১. ৪.০	০.১০.০	১. ৮.০
নিড়ানি … …	১.১২.০	২. ৪.০	১. ০.০	১. ৮.০	১. ৪.০	১. ৮.০	১. ৮.০	২. ০.০	০. ৩.০	০. ৪.০	০. ৮.০	১. ০.০
কোদাল … …	১. ০.০	১. ৪.০	০.১০.০	০.১৪.০	০.১২.০	১. ৪.০	…	…	০.১৪.০	১. ৪.০	০. ৮.০	১. ০.০
প্রতি সের পিতলের বাসন	০.১১.০	১. ১.০	০.১২.০	১. ৪.০	০.১৩.০	১. ০.০	০.১৪.০	১. ২.০	০.১১.০	০.১৪.০	০. ৮.০	১. ৮.০
দুটি বলদের মাসিক খরচ	৫. ০.০	৭. ৮.০	২. ৮.০	৫. ০.০	১০. ০.০	১৫. ০.০	২. ০.০	৩. ০.০	৫.১০.০	১০. ৪.০	৩. ০.০	৭. ০.০
এক জোড়া বলদের দাম	২৮. ০.০	৩৫. ০.০	২০. ০.০	৩২. ০.০	১০—৪০	১৫—৬০	৮—১০	১০—২০	২৫. ০.০	৪০—৫০	১০—৪০	৪০—৮০
এক জোড়া গাভীর দাম	৪. ০.০	৫. ৮.০	২০. ০.০	৩৯. ০.০	৮—২০	১৬—৪০	৪—১২	৫—১৫	৭. ০.০	১২—১৫	৮. ০.০	১০—২০